হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

৮

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত

সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা সাত

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ৩০, ১৩৯২
জুলাই ১৫, ১৯৮৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ
কার্তিক ২৮, ১৩৯২
নভেম্বর ১৪, ১৯৮৫

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

অলঙ্করণ
জ্যোতিপ্রসাদ রায়
হাওড়া ৯

বাঁধাই
বিদ্যুৎ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম
৩০·০০ টাকা

ভূমিকা

কৈশোরে যখন ধীরে ধীরে মানবমনের হাজারদুয়ারি মণিকোঠার দরজাগুলো একে একে খুলে যায় তখনি দরকার সেই মানবমনের খোরাক যোগাবার ব্যাপার। সুপ্ত মনটি হঠাৎ জেগে ওঠে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। তখন সে সদ্য-বয়োপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে। যারা এই সময় উপদেষ্টা বা বন্ধু পেয়ে যায় তারাই ধন্য হয়ে যায় সার্থক বিকাশের নেশায়। এই সময় বন্ধুর মত তাকে সাহায্য করে, তার মনের খোরাক জোগায় বই বা সাহিত্য। সাহিত্য কি বিপুলভাবে তার মনের ওপর চেপে বসে তাকে প্রসারিত করে তাকে নব নব দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়! তাঁরাই শ্রেষ্ঠ কিশোর-সাহিত্যিক যাঁরা কৈশোর-কল্পনার ঘোড়াকে ঠিকমত বশ করে আনন্দময় অভীপ্সার মায়ারাজ্যের বর্ণালীর দিকে নিয়ে যান। এইরূপ সাহিত্যিক ছিলেন জোনাথান স্যুইফট্, ড্যানিয়েল ডিফো, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, চার্লস কিংসলে, জন রাসকিন প্রমুখ সাহিত্যিকরা। বাংলা সাহিত্যে এরকম ক্ষণজন্মা সাহিত্যিকও কম নেই। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মোহনলাল গাঙ্গুলি, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়।

শেষে নাম করছি বলে তাঁর অবদানকে একটুও তুচ্ছ করছি না। তিনি যখন তাঁর 'যকের ধন' শুরু করেন তখন থেকেই তাঁর অদ্ভুত মায়াজাল দিয়ে তিনি কৈশোরকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় অক্লান্ত কর্ম দিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেন এবং এক নতুন দিগন্তের দিকে তাঁর কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে কীর্তির স্বর্ণধুলা উড়িয়ে কৈশোর-মনের ঘুম ভাঙান।

হেমেন্দ্রকুমারের 'যকের ধন' যখন মৌচাকে মাস মাস বেরুচ্ছে তখন আমি স্কুলের ছাত্র। আমি তখন একটি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক। যে-সব কিশোর এই গ্রন্থাগার থেকে বই নিত তারা একযোগে 'মৌচাক' পড়তে চাওয়ার ফলে 'মৌচাক' ইস্যু করা হ'ত না। তারা সকলে গোল হয়ে বসে 'মৌচাক' একসঙ্গে পড়তো। আমাকে নিয়মিতভাবে তখনকার হ্যারিসন রোডে এম. সি. সরকারের দোকান থেকে খোদ সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে 'মৌচাক' নিয়ে আসতে হ'ত। সভ্যদের একযোগে 'মৌচাক' পড়ার আগ্রহ দেখে তখন বুঝতাম তাদের এ নেশা কত অকৃত্রিম। পরে নিজেই যখন কিশোর-সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলাম তখন বুঝতে পারলাম কাজটি কত কঠিন। শিবরামবাবুর সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। তাঁর মুখ থেকে শুনেছি হেমেন্দ্রকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে এবং বহু ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত বিদগ্ধ ব্যক্তি। তিনি কবি ছিলেন, ঔপন্যাসিক ছিলেন, ছিলেন একজন শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক। তিনি বহুকাল 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। সবচেয়ে ভাল লাগত তাঁর মাত্রাজ্ঞান দেখে। কথাবার্তায় তিনি কোনদিন নিজেকে জাহির করতেন না। অপরকে ছাপিয়ে কথা বলতে আমি কোনদিন দেখিনি। তবে তাঁর কথাবার্তা শুরু হলে আমি তো অত্যন্ত মন দিয়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ডুবে যেতাম। যা তিনি বলতেন তা এমন সুন্দর, সহজ ভাষায় বলতেন যে তা মনে দাগ রেখে যেত। তাঁর কাছে যে জ্ঞান লাভ করতাম, তা আলোর স্পর্শের মত মনকে উজ্জ্বল করে তুলত।

বহু গ্রন্থ লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'যকের ধন'। তিনি বাংলা কিশোর সাহিত্যে প্রথম রোমাঞ্চ-কাহিনীকার। বিশ্ব-সাহিত্যে এই গ্রন্থের একটি বিশেষ স্থান আছে। পরবর্তীকালে বাংলা শিশু-সাহিত্যে এইরূপ রোমাঞ্চ-কাহিনী বহু লেখা হয়েছে, কিন্তু উক্ত বইটির জুড়ি মেলা ভার। লেখকের প্রতিভা এই জাতীয় রচনায় এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ভূত, প্রেত, অসম্ভব, উদ্ভট সব বিষয়ে এমন এক অপূর্ব মানসিকতার প্রকাশ হয়েছে যে কিশোর-মনে সহজ বুদ্ধি ও পুষ্টিতে তা সাহায্য করেছে। কোন দিন তা কোন অনিষ্ট সাধন করে নি বা শিশু-মনকে কোন দুর্বলতার চাপে দুর্বল না করে আরো দীপ্ত ও সাহসিক করে তুলেছে।

হেমেন্দ্রকুমার আমার অগ্রজের মত প্রণম্য। তাঁর গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখতে বসে মনে হচ্ছে যেন আমি লিলিপুট হয়ে গালিভারের কথা বলছি। সত্যিই তিনি আধুনিক শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে গালিভারের মত নিজ মহিমায় দণ্ডায়মান আছেন ও থাকবেন।

শিশু-সাহিত্য কিভাবে শিশু-মানস গঠন করে তা আমার দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে উপলব্ধি করেছি। তাই আমি সারাজীবন শিশু-সাহিত্য রচনায় কাটালাম। আজ মুক্তকণ্ঠে অভিভাবকদের জানাচ্ছি যে শিশু ও কিশোরদের মানস গঠনে সৎ-সাহিত্য কিভাবে সাহায্য করে তা বলে বোঝান যায় না। শুধু বলি যে শিশু ও কিশোরদের সাহিত্য পড়তে দিন। এতেই তাদের মন বিকশিত হবে, আলো-কিত হবে, তাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠবেন।

১৪ই জুলাই ১৯৮৫
৭/৪ বীডন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রীবিমল দত্ত

সূচীপত্র

বর্তমান খণ্ডের 'দেড়-শো খোকার কাণ্ড' ও 'আলো দিয়ে গেল যাঁরা' বই দু-খানি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন দেব সাহিত্য কুটির-এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার ও 'নীল সায়রের অচিনপুরে' প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন স্বনামধন্য প্রকাশন সংস্থা এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রীসুপ্রিয় সরকার। এঁদের উভয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

আট

দেড়-শো খোকার কাণ্ড

কলকাতা যাত্রার আয়োজন

মা কমলা ডাকলেন, "খোকন—"

বাধা দিয়ে ভারিক্কে চালে গোবিন্দ বললে, "আমাকে আর তুমি খোকন ব'লে ডেকো না মা। মনে রেখ, পরশুদিন আমি দশ বছরে পড়েছি!"

কমলা হেসে বললেন, "ওরে বাছা, আমার কাছে তুই খোকন থাকবি চিরদিনই।...এখন যা বলি শোন্। শীগ্‌গির সাবান মেখে চান্ ক'রে আয়।"

সাবানকে গোবিন্দ বরাবরই ভয় করত—পৃথিবীর অন্যান্য খোকাদের মত। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, "চান্ যেন করছি। কিন্তু সাবান কি না মাখলেই নয়?"

কমলা বললেন, "সাবান না মাখলে তোর মাসী তোকে নোংরা ছেলে ব'লে ঘেন্না করবেন।"

অগত্যা মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে গোবিন্দের প্রস্থান।

কমলা আবার সেলাইয়ের কল চালাতে লাগলেন।

একটু পরেই ঘরে ঢুকে পাশে এসে বসলেন, পাড়ার নিস্তারিণী ঠাকরুণ। জিজ্ঞাসা করলেন, "গোবিন্দ তাহ'লে আজকেই কলকাতায় যাচ্ছে?"

কমলা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ দিদি। আমাকে ছেড়ে খোকনের যেতে ইচ্ছে ছিল না, ওকে একরকম জোর ক'রেই পাঠাতে হচ্ছে। পুজোর ছুটিতে এখানে থেকে করবে কি? আমার ছোট বোন বিমলা আমাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আমি কি ক'রে

যাই বল? পুজোর সময়ে যা কাজের ভিড়! দিন রাত খাটি, তবু কাজ ফুরোয় না!"

নিস্তারিণী বললেন, "কিন্তু গোবিন্দ কি একলা কলকাতায় যেতে পারবে?"

কমলা বললেন, "তা পারবে না কেন? গোবিন্দ আমার যা চালাক ছেলে! আমি নিজে গিয়ে ওকে ইস্টিশানে তুলে দিয়ে আসব। হাওড়ায় ওর মাসীর বাড়ি থেকে লোক এসে ওকে নিয়ে যাবে।"

নিস্তারিণী বললেন, "গোবিন্দ কখনো তো কলকাতায় যায়নি, কলকাতা ওর খুবই ভালো লাগবে! কলকাতা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরই দেখবার শহর! রাত হ'লেও সেখানে অন্ধকার হয় না! আর মোটর গাড়িগুলো দিন-রাত কী চ্যাঁচায়—মা, মা, মা! কান বলে কালা হয়ে যাই!"

এমন সময় গোবিন্দ কোনরকমে স্নানের কঠিন কর্তব্য সেরে এসে বললে, "কলকাতায় কতগুলো মোটর আছে?"

—"তা কি ক'রে জানবো বাছা? তবে দেখলে তো মনে হয় যত মানুষ তত মোটর! বাব্বাঃ! সিধে যমের বাড়ি যাবার গাড়ি!"

কমলা বললেন, "খোকন, এইবার শোবার ঘরে যাও! সেখানে তোমার সব পোশাক বার ক'রে রেখে এসেছি। ভালো ক'রে মোজা পোরো, জুতার ফিতে বাঁধতে ভুলো না।"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অত আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, আমি কচি খোকা নই"—এই ব'লেই গোবিন্দ এক ছুটে অদৃশ্য হ'ল।

নিস্তারিণী বিদায় নিলেন। কমলাও সেলাই ছেড়ে উঠে ভাত বাড়তে গেলেন।

খানিক পরে পোশাক প'রে এসে গোবিন্দ বললে, "আচ্ছা মা, বলতে পারো আমার এই নীল রঙের প্যাণ্ট-কোট্ তৈরি করেছে কোন দর্জী?"

—"কেন বল্ দেখি?"

—"তাহ'লে আমার এয়ার গান্ ছুঁড়ে তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলি।"

—"উঃ, খোকন আমার মস্ত বীর!"

—"ভদ্রলোকেরা কখনো নীল রঙের পোশাক পরে? আমি কি খালাসী?"

—"নীল রঙের পোশাক পরবার জন্যে কত ছেলে কেঁদে সারা হয়, তোর কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাছা? নে, এখন খেতে বোস্।"

আজ রান্নার কিছু ঘটা ছিল। মাছের 'ফ্রাই', মুড়ো দিয়ে ডাল, গল্‌দা চিংড়ি দিয়ে ফুলকপির তরকারি, আমের চাট্‌নি, পায়স, সন্দেশ, রসগোল্লা। গোবিন্দবাবুর দেহটি ছোট্ট হ'লেও পেটটি বড় সামান্য নয়, দেখতে দেখতে সমস্ত খাবার স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে গেল, অথচ তখনো তার খিদে কমেনি। অন্ততঃ আরো তিন-চারটে রসগোল্লা চাওয়া উচিত কিনা, সে যখন মনে মনে এই কথা চিন্তা করছে, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়ল, নীল প্যাণ্টের ওপরে পায়সের সাদা দাগ! পাছে মা দেখে ফেলেন, সেই ভয়ে চট্‌পট্ উঠে পড়ল।

মা তখন অন্য কথা ভাবছেন। বললেন, "খোকন, কলকাতায় পৌঁছেই আমাকে চিঠি লিখতে ভুলো না।"

হাত দিয়ে টুক্ ক'রে পায়সের দাগটা মুছে ফেলে গোবিন্দ বললে, "হ্যাঁ, চিঠি লিখব বৈকি মা।"

—"খুব সাবধানে থেকো বাছা! কলকাতা আমাদের কালিপুরের মতন ঠাঁই নয়। তারপর সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো, আমাকে যেমন জ্বালাও তেমন যেন জ্বালিও না।"

গম্ভীর স্বরে গোবিন্দ বললে, "স্বীকার করছি, আমি খুব ভালো ছেলের মতন থাকব।"

ছেলেকে নিয়ে কমলা আবার শোবার ঘরে ফিরে এলেন। বাক্স খুলে ক'খানা নোট বার ক'রে গুনে বললেন, "খোকন, এই একখানা একশো টাকার আর দু'খানা দশ টাকার নোট তোমার দিদিমাকে দিও। মাকে বোলো, এ-বছর পুজোর সময়ে এর বেশি আর কিছু দিতে পারলুম না। আর এই পাঁচ টাকার নোটখানা হচ্ছে তোমার জন্যে। কিছু নিজে খরচ

কোরো, বাকি আসবার সময়ে রেলভাড়া দিও। এই দেখ, নোটগুলো আমি খামের ভেতরে পুরে দিলুম। নাও, সাবধানে রাখো।"

গোবিন্দ অল্পক্ষণ ভাবলে। তারপর খামখানা নিয়ে কোটের ভিতরকার পকেটে রেখে বললে, "ব্যাস্। নোটের পা নেই, পকেট থেকে আর বেরিয়ে পড়তে পারবে না।"

কমলা বললেন, "দেখো, রেলগাড়িতে কারুর কাছে বোলো না যেন, তোমার পকেটে এত টাকা আছে।"

গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, "তুমি কি ভাবো মা, আমি এতই বোকা? জানো, আমি দশ বছরে পড়েছি?"

কমলা বললেন, "তবু সাবধানের মার নেই।"

তোমাদের মধ্যে যারা বড়লোকের ছেলে, তারা হয়তো ভাবতে পারো, মোটে একশো পঁচিশ টাকার জন্যে কমলা এতবেশি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? যাদের পাঁচ-সাত লাখ টাকা আছে তাদের কাছে হয়তো একশো-দেড়শো টাকা এমন কিছুই নয়, কিন্তু গোবিন্দের মা যে বড় গরিব।

গোবিন্দের বয়স যখন তিন বছর, তখনি তার বাবা মারা যান। সেইদিন থেকেই ছেলে মানুষ করবার ভার পড়ে এই অসহায়া বিধবার উপরে। কালিপুর গ্রামে নিজের বসতবাড়ির একতলায় কমলা একটি ছোট ইস্কুল খুলেছেন, পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করতে আসে। তাদের কাছ থেকে সামান্য যে মাহিনা পান, তাতে তাঁর সংসার চলে না। কাজেই পাড়ার লোকের জামা প্রভৃতি তৈরি ক'রে দিয়ে তাঁকে আরো-কিছু রোজগার করতে হয়। এই আয় থেকেই তিনি কোনরকমে সংসারের খাই-খরচ চালান, গোবিন্দের ইস্কুলের মাহিনা ও পুঁথিপত্র কেনবার খরচ দেন, নিজের বুড়ী মাকেও বছরে বছরে কিছু সাহায্য করেন।

গোবিন্দও বড় ভালো ছেলে। মাকে সে যেমন ভক্তি করে, তেমনি ভালবাসে। মায়ের খাটুনি কমাবার জন্যে সে খেলাধুলো ফেলে সংসারের

নানান্ কাজ করে নিজের হাতে। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, গোবিন্দ তরি-তরকারি কোটা থেকে রান্নাবান্না পর্যন্ত অনেক কাজই শিখে ফেলেছে।...

কমলা বললেন, "এই ব্যাগটার ভেতরে তোমার জামা-কাপড় রইল। ব্যাগটা যদি বেশি ভারী মনে হয়, তাহ'লে মুটে ডেকো ”

ব্যাগটা হাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, "না, আমি মুটে ডাকব না! তোমার গোবিন্দ আর খোকা নয়!"

কমলা বললেন, "তোমার মাসী ভারি ফুল ভালবাসেন। বাগান থেকে তাই আমি গোলাপ আর রজনীগন্ধা কাগজে মুড়ে রেখেছি। এগুলো মাসীকে দিও।"

ফুলগুলি আর একহাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, "ঘড়িতে ক'টা বাজ্‌ল দেখ।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই কমলা ব্যস্ত স্বরে ব'লে উঠলেন, "ওমা, ন'টা বাজে যে! গাড়ি ছাড়বে সাড়ে ন'টায়! চল্ চল্, আমরা বেরিয়ে পড়ি!"

—"মা, এই আমি 'কুইক্ মার্চ' আরম্ভ করলুম!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রা

মায়ের সঙ্গে পাল্কীতে চ'ড়ে গোবিন্দ স্টেশনে গিয়ে নামল।

দেখা গেল, স্টেশনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নটবর ওঝা। এয়া ভুঁড়ি, এয়া গোঁফ-দাড়ি, হাতে এয়া মস্ত লাঠি! সে হচ্ছে গাঁয়ের একজন চৌকিদার।

নটবর বললে, "কি গো মা-ঠাক্‌রোণ, ছেলেকে সাহেব সাজিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছ? বিলেতে নাকি?"

কমলা বললেন, "না গো নটবর, খোকন যাচ্ছে কলকাতায় বেড়াতে।"

কিন্তু গোবিন্দ তখন নটবরকে দেখছিল না, দেখছিল রাশি রাশি সর্ষে-ফুল। এই কাল বৈকালেই সে যখন হেবো, ভূতো, মোনার সঙ্গে মুখুয্যেদের বাগানে পেয়ারাগাছে উঠে পাকা পেয়ারা লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল, তখন নটবর হঠাৎ এসে পড়েছিল সেখানে। অবশ্য তারা সবাই এক এক লাফে বানরের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে, হরিণের মত বেগে ছুটে লম্বা দিতে দেরি করেনি বটে, কিন্তু তবু তার বিশ্বাস, নটবর তাকে ঠিক চিনে ফেলেছিল! এখন কি হবে? নটবর যদি তাকে ধ'রে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়?

ভাগ্যে নটবর তখন আর কিছু না ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল।

গোবিন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললে, "নটবর এখন কিছু করলে না বটে, কিন্তু আমি ফিরে এলেই নিশ্চয় আমাকে গ্রেপ্তার করবে।"

স্টেশনে ঢুকে কমলা বললেন, "খোকন, তুমি তৎক্ষণ গাড়িতে গিয়ে

উঠে বোসো, আমি টিকিট কিনে আনি। ব্যাগটা যদি গাড়িতে নিজে না তুলতে পারো, আর কারুকে তুলে দিতে বোলো।"

—"ভারি তো ব্যাগ! আমি খোকা নই। তুমি টিকিট কিনে আনো, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

টিকিট কিনে এনে কমলা বললেন, "দেখো খোকন, হাওড়ার ইস্টিশানে যেন হারিয়ে যেও না!"

এইবারে গোবিন্দের রাগ হ'ল। বললে, "মা, তুমি বড্ড বেশি গিন্নিপনা করছ। একশো বার বলছি, আমি খোকাও নই বোকাও নই! হারাব কি বল? আমি কি সিকি পয়সার মত ছোট?"

"আর টাকা সাবধান?"

গোবিন্দ পকেটের উপরে হাত রেখে অনুভবে বুঝলে, টাকা আছে যথাস্থানেই। বললে, "মা, তোমার টাকা সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। এখন গাড়ির দিকে চল।"

দুজনে পায়ে পায়ে এগুলো। গোবিন্দ বললে, "মা, পুজোর সময়ে সারা দিন তুমি অত খেটো না। আমি চললুম, বাড়িতে তোমাকে দেখবার লোক কেউ রইল না। দেখো, অসুখ করে না যেন। ভয় নেই, দরকার হ'লে আমি 'এরোপ্লেনে' চ'ড়ে হুস্ ক'রে তোমার কাছে এসে পড়ব।" সে আদর ক'রে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল।

কমলা বললেন, "তোর মাসতুতো বোন নমিতা বোধহয় তার সাইকেলে চ'ড়ে তোকে ইস্টিশান থেকে নিয়ে যেতে আসবে।"

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, "মেয়ে আবার সাইকেলে চড়ে নাকি?"

কমলা বললেন, "তোর মেশো-মশাইয়ের ছেলে হয়নি কিনা, তাই মেয়ের কোনো আবদারেই 'না' বলতে পারেন না। নমুর আবার ভারি গোঁ, যা ধরে ছাড়ে না। তোর মেশো তাকে ঠিক বেটাছেলেরমতনই মানুষ করেছেন।"

—"নমিতার বয়স কত?"

—"তোর চেয়ে এক বছরের ছোট। খুব ছেলেবেলায় তোরা একসঙ্গে খেলা করেছিস্‌। এখন বোধহয় তোরা কেউ কারুকে দেখলে চিনতে পারবি না।"

ট্রেন প্লাট্‌ফর্মে এসে দাঁড়াল।

—"খোকন, দেখো বাছা যেন ভুল ক'রে কোন আগের ইস্টিশানে নেমে পোড়ো না।"

—"আচ্ছা।"

—"হাওড়ায় তোমাকে নিতে লোক আসবে।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা।"

—"কারুর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।"

—"না।"

—".রাজ সাবান মেখে চান কোরো।"

—"হুঁ।"

—"হারিয়ে যেও না।"

—"না।"

—"চিঠি লিখো।"

—"তুমিও লিখো।"

এইভাবে কথাবার্তা চলত বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু স্টেশনের ঘণ্টা আর সময় দিলে না। ঢং ঢং ঢং ক'রে সে বেজে উঠল, গোবিন্দও গাড়িতে উঠে পড়ল।

—"দুর্গা, দুর্গা।......খোকনমণি।"

—"মা।"

গোবিন্দ জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মায়ের গালে চুমু খেলে।

মা চুপিচুপি বললেন, "টাকা সাবধান!"

—"ভয় নেই মা, টাকা ঘুমুচ্ছে।"

গার্ড নিশান নাড়তে লাগল। ইঞ্জিন বাঁশী বাজালে। গাড়ি চলতে শুরু করলে।

গাড়ির জান্‌লায় গোবিন্দের এবং প্লাট্‌ফর্মে কমলার চোখ করছে ছল্‌ ছল্‌। দেখতে দেখতে গোবিন্দকে নিয়ে ট্রেনখানা যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল! কমলার চোখ উপছে দুই গাল বয়ে তখন জল পড়ছে। গোবিন্দ ছাড়া তাঁর যে নিজের বলতে আর কেউ নেই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামরার ভিতরে

জান্‌লার দিকে পিছন ফিরে গোবিন্দ সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলে।

কাম্‌রার এক ভদ্রলোক আর সবাইকে বললেন, বাঃ, ছেলেটি তো খাসা দেখছি! আজকালকার ছেলেরা এমন নম্র হয় না। আমার নিজের ছেলেগুলো তো পাজীর পা ঝাড়া।"

কালিপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন, তিনি নামবেন পরের স্টেশনে। চক্রবর্তী বললেন, "গোবিন্দ হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের সেরা ছেলে।"

গোবিন্দ বুকের কাছে জামার উপরে হাত দিলে। পকেটের ভিতরে নোটগুলো খড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠল। তখন সে খুশি হয়ে আসনের উপরে ভালো ক'রে জাঁকিয়ে বসল।

একবার প্রত্যেক আরোহীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। কারুকেই দেখে চোর, গাঁট-কাটা বা হত্যাকারী ব'লে মনে হ'ল না। এক কোনে একটি মহিলা ব'সে কোলের ছেলের কান্না থামাবার চেষ্টা করছেন। একজন ছোট্টোখাট্টো রোগা ভদ্রলোক মস্তবড় ও মোটা বর্মা চুরট টানছেন। আর একটি লোক অন্য কোনে ব'সে নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছে। তার মাথায় গান্ধী টুপি।

হঠাৎ সে খবরের কাগজখানা নামিয়ে পাশে রাখলে। পকেট থেকে

গুটি-চারেক চকোলেট বার ক'রে গোবিন্দের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, "এই নাও খোকাবাবু, চকোলেট খাও।"

গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে বললে, "থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আমার নাম খোকাবাবু নয়—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।"

কাম্‌রার সবাই হেসে উঠল। লোকটাও হেসে বললে, "নমস্কার গোবিন্দবাবু। পরিচয় পেয়ে খুশি হলুম। আমার নাম জটাধর।—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

—"দেখলেন তো, কালিপুর থেকে।"

—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

—"কলকাতায়।" ব'লেই গোবিন্দ আর একবার টাকার পকেটে হাত দিলে। নোট বললে, 'খড়্‌মড়্ খড়্‌মড়্।' গোবিন্দ মনে মনে বললে —'বহুৎ আচ্ছা।'

—"এর আগে কলকাতায় গিয়েছ?"

—"না।"

জটাধর আরো এগিয়ে তার পাশে ব'সে বললে, "তাহ'লে কলকাতা দেখে তোমার পেটের পিলে চম্‌কে যাবে। কলকাতার এক-একখানা বাড়ি একশো তলা উঁচু। পাছে তারা ঝড়ে হেলে প'ড়ে যায়, সেই ভয়ে তাদের আকাশের সঙ্গে শিক্‌লি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।······ওখানে কারুর যদি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি যাবার দরকার থাকে, তাহ'লে তাকে প্যাক ক'রে ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়া হয় ······ওখানে কারুর যদি এক হাজার টাকা ধার করবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সে ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজের মস্তিষ্ক ব্যাঙ্কের জিম্মায় বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে আসে······ওখানে—"

যিনি বর্মা চুরট টানছিলেন তিনি হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, "মশাইয়ের মস্তিষ্ক বোধ হয় এখন ব্যাঙ্কের জিম্মায় বাঁধা আছে? আজ্‌গুবি যা তা ব'লে ছেলেমানুষকে এমন ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

তখন বর্মা চুরটের সঙ্গে গান্ধী টুপির এমন জোর তর্ক লেগে গেল

যে, ও-কোন থেকে কাঁদুনে খোকাটাও ভয়ে কান্না থামিয়ে ফেললে।

গোবিন্দ কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করলে না। এই খানিকক্ষণ সে একপেট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু আবার তার ক্ষিধে পেল। মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটা বার ক'রে সে খেতে বসল লুচি ও আলুর দম।

ইতিমধ্যে ট্রেনখানা একটা বড় স্টেশনে এসে থামলো। গোবিন্দ কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখল না; কারণ সে তখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে, লুচির থাকের তলায় রয়েছে দুটো বড় বড় সিদ্ধ হাঁসের ডিম!

দশখানা লুচি, আটটা আলুর দম এবং দুটো ডিম সাবাড় করবার পর গোবিন্দ আবার মুখ তুলে চারিদিকে তাকাবার সময় পেলে। একি, কাম্‌রার ভিতরে গান্ধী টুপি ছাড়া আর কারুকেই দেখা যাচ্ছে না যে! ঐ বড় স্টেশনে সবাই নেমে গিয়েছে নাকি?

ট্রেন ফের চলতে শুরু করলে। কাম্‌রায় আছে খালি সে আর জটাধর। গোবিন্দের এটা ভালো লাগল না। সে অজানা লোক অচেনা ছেলেকে চকোলেট খেতে দেয় আর অদ্ভুত গল্প বলে, আর যার নাম জটাধর, তাকে তার পছন্দ হয় না।

গোবিন্দ ভাবলে, আর একবার পকেটে হাত নিয়ে দেখব নাকি? ......না বাবা, খালি-খালি পকেটে হাত দিচ্ছি দেখে জটাধর যদি কোন সন্দেহ করে? তার চেয়ে মুখ ধোবার ঘরে যাই।

তাই গেল। পকেট থেকে খামখানা বার করলে এবং খাম থেকে বার করলে নোটগুলো। গুণে দেখলে, ঠিক আছে। ভাবলে, নোটগুলো কি আরো ভালো ক'রে রাখা যায় না?

হঠাৎ গোবিন্দের মনে পড়ল, স্টেশনের প্লাটফর্মে সে একটা সব চেয়ে বড় আল্‌পিন কুড়িয়ে পেয়েছে। সেই আল্‌পিনে নোটের সঙ্গে খামখানা গেঁথে সে জামার সঙ্গে আটকে রাখলে। 'হুঁ, এখন আর কিছু ভয় নেই!' গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কাম্‌রায় ফিরে গেল।

জটাধর তখন মুখের উপরে খবরের কাগজখানা চাপা দিয়ে হেলে

পড়েছে এবং তার নাক ডাকছে ঘড়্-ঘড়্ ঘড়্-ঘড়্ ক'রে। 'আঃ বাঁচা গেল বাবা, লোকটার সঙ্গে আর আজে-বাজে ব'কে মরতে হ'ল না—এই ভেবে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে।

বাহবা, কি মজা! মস্ত মস্ত গাছ, বড় বড় ঝোপ, পানা-ভরা পুকুর, হেলে-পড়া কুঁড়ে ঘর, লাঙ্গল-ঠেলা চাষা,—সব আসছে আর যাচ্ছে যেন বেগে ঘুরন্ত গ্রামোফোনের রেকর্ডের উপর চ'ড়ে! মাটি ছুটছে, গ্রাম ছুটছে, অরণ্য ছুটছে—ছুটছে না খালি আকাশ, আর তাদের গাড়িখানা।

কিন্তু এ-সব ছুটোছুটি আর কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়? গোবিন্দ চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ওরে বাবারে বাবা, জটাধরের ঐ মোটা নাকের ভিতরে কি ঝোড়ো-হাওয়া বাসা বেঁধেছে, না ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে বাজের বাচ্ছা! অত বেশি নাক ডাকাই বা কতক্ষণ ধ'রে শোনা যায়?

গোবিন্দের ইচ্ছে হ'ল, কাম্‌রার মধ্যেই খানিক চ'লে-ফিরে বেড়াতে। তারপরেই সে ভাবলো, তার পায়ের শব্দে যদি জটাধরের ঘুম ভেঙে যায়! বেড়ানো হ'ল না। সে ব'সে ব'সে জটাধরের মুখখানা ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

লম্বাটে ঘোড়ার মতন মুখ,—বিচ্ছিরি! কান ছুটো যেন তেড়ে-মেড়ে মুখ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে! আ মরি মরি, ঐ মুখে আবার সখ ক'রে রাখা হয়েছে প্রজাপতি-গোঁফ! ঠোঁট-ছুখানা কি পুরু-রে বাবা! ও মুখে গান্ধী টুপি মানায় না। জটাধর গান্ধী টুপি পরেছে কেন?

ইস্! গোবিন্দ ভারি চম্‌কে উঠল! সে যে আর একটু হ'লেই ঘুমিয়ে পড়েছিল!...না, কিছুতেই ঘুমনো-টুমনো চলবে না। আহা, গাড়িতে এখন যদি আর কোন যাত্রী আসে তা'হলে বড় ভালো হয়। ট্রেন আরো কয়েকটা স্টেশনে থামল, কিন্তু গোবিন্দের দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোন নতুন যাত্রী সেই কাম্‌রায় উঠল না।

আরে মোলো, আবার যে ঘুম পায়! গোবিন্দ নিজের পায়ে চিম্‌টি কাটতে লাগল। তাদের কেলাসে যখন আঁকের মাস্টার কৈলাসবাবু

সবিস্তারে অঙ্কশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে বসতেন, তখন এই উপায়েই গোবিন্দ ঘুমের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত।

উপায়টা এখানেও কিছুক্ষণ কাজে লাগল। যেমন ঢুলুনি আসে, অমনি পায়ে চিম্‌টি কাটা! ঘুম তো ঘুম, চিম্‌টির কাছে ঘুমের বাবাও এগুতে রাজী নন! গোবিন্দ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, ঘুমেরও কি বাবা আছে? তার নাম কি?···

···আচ্ছা, তার মাস্‌তুতো বোন নমিতাকে দেখতে কেমন? মোটা, না ছিপছিপে? বেঁটে, না ঢ্যাঙা? মা বললেন, তার সঙ্গে আমি নাকি ছেলেবেলায় খেলা করেছি! কিন্তু তার মুখ আমার মনে হচ্ছে না তো। তবে একটা কথা আমি ভুলিনি। নমিতা আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল! এক ফোঁট্টা একটা মেয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে কুস্তি লড়তে চায়! একটা ল্যাং মারলে কোথায় ঠিক্‌রে পড়ত তার ঠিক নেই। ধেৎ? আমি লড়তে রাজী হইনি।

ইস্! এবারে যে ঢুলে বেঞ্চি থেকে নিচে প'ড়ে যাচ্ছিলুম! চিম্‌টি কেটে কেটে পায়ে কালশিরে প'ড়ে গেল, তবু ঘুম ছাড়ে না যে!······ না, আর এক কাজ করি। জামার বোতামগুলো গুণে দেখা যাক্!—কি আশ্চর্য! ওপর থেকে নিচের দিকে গুণে দেখছি, চারটে বোতাম। কিন্তু নিচে থেকে ওপর দিকে গুণলে হচ্ছে পাঁচটা। এর মানে কি?

মানে বোঝা হ'ল না। এবারে গোবিন্দের দুই চোখের উপরে ভেঙে পড়ল যেন ঘুমের পাহাড়! গোবিন্দ একেবারে কাৎ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দের স্বপ্নদর্শন

আচম্বিতে গোবিন্দ দেখলে, ছেলেবেলাকার খেলাঘরের রেলগাড়ির মতন এ ট্রেনখানাও চাকার মতন গোল হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছুটে চলেছে।

সে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সবাই যেন গিয়েছে উল্টেপাল্টে। মণ্ডলটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, ইঞ্জিনটা ওদিক দিয়ে ফিরে ক্রমেই গার্ড-সায়েবের শেষ-গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। কুকুর যেমন গোল হয়ে নিজের ল্যাজ কামড়াবার চেষ্টা করে, এ ট্রেনখানাও যেন তাই করতে চায়। আর এই মণ্ডলের মধ্যে রয়েছে নানান্ জাতের গাছ আর মস্ত একটা কাঁচের ঘর আর হাজার হাজার জান্‌লা-ওয়ালা একখানা দুশো-তলা বাড়ি।

গোবিন্দের জান্‌তে সাধ হ'ল, এখন ঘড়িতে ক'টা বেজেছে। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলে প্রকাণ্ড এক ঘড়ি, যেটা টাঙানো থাকে তাদের বৈঠকখানার দেওয়ালে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লেখা রয়েছে, 'গাড়ি দৌড়াচ্ছে ঘণ্টায় দু'শো পাঁচ মাইল। কাম্‌রার মেঝেয় থুতু ফেললে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।'

সে আবার বাইরের দিকে তাকালে। ইঞ্জিন ট্রেনের শেষ-গাড়িখানা ধ'রে ফেললে ব'লে। গোবিন্দের বেজায় ভয় হ'ল। ইঞ্জিনে আর শেষ-গাড়িতে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তাহ'লে মস্ত একটা রেল-দুর্ঘটনা হবে। হ্যাঁ, এ-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। তার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে নিজের কাম্‌রার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারপর ট্রেনের পা-দানীতে নেমে সন্তর্পণে এগুতে লাগল। হয়তো

গাড়ির ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে! এগুতে এগুতে প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে দেখলে, সারা গাড়ির ভিতরে সেই গান্ধী-টুপি-পরা জটাধর ছাড়া আর একজনও আরোহী নেই।

জটাধরের টুপিটাও ভারী মজার তো! ওটা যে দস্তুরমত চকোলেট দিয়ে গড়া!

জটাধর টুপির খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর একগাল হেসে বললেন, "গোবিন্দবাবু, আপনিও একটু খাবেন নাকি?"

গোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, টুপি-চকোলেট আমি খাই না! ......ওদিকে চেয়ে দেখুন ইঞ্জিনের কাণ্ড-কারখানা।"

জটাধর হো হো ক'রে হেসে উঠে টুপির আরো খানিকটা ভেঙে খেয়ে ফেললে। তারপর নিজের ভুঁড়ির উপরে চাপড় মেরে বললে, "গোবিন্দবাবু, খাসা খেতে!"

গোবিন্দের গা বমি বমি করতে লাগল। সে পা-দানী ধ'রে বরাবর এগিয়ে ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে দেখলে, না ড্রাইভার ঘুমোয়নি—ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানের সিটে পা ঝুলিয়ে ব'সে ব'সে টপ্পা গান গাইছে।

গোবিন্দকে দেখেই সে চাবুক তুলে এমনভাবে লাগাম টেনে ধরলে, যেন এই রেলগাড়িখানা টানছে ঘোড়ারাই!

হ্যাঁ, তাই তো! রেলগাড়িখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা-দুটো নয়, এগারোটা ঘোড়া। তাদের পায়ে পায়ে বাঁধা রয়েছে রূপোর 'স্কেট্', আর ছুটতে ছুটতে তারা গানের সুরে বলছে—"যাব নাকি আমরা— যাব নাকি আমরা, এই সোনার দেশ ছেড়ে ওগো, সোনার দেশ ছেড়ে?"

গোবিন্দ কোচম্যানের গা ধ'রে জোরে নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "শীগ্‌গির তোমার ঘোড়াগুলোকে থামাও, নইলে এখুনি রেল-দুর্ঘটনা হবে!" তারপরেই সে চিনতে পারলে, ও বাবা, এ কোচম্যান তো যে-সে লোক নয়, এ যে চৌকিদার নটবর ওঝা!

নটবর কট্‌মট্ ক'রে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, "মুখুয্যেদের পেয়ারা চুরি করেছিল কে?"

গোবিন্দ বললে, "আমি।"

—"সঙ্গে আর কে কে ছিল ?"

—"বলব না।"

—"বলবে না! বটে ? তাহ'লে আমরা এমনি চাকার মতন গোল হয়ে ঘুরবই!" ব'লেই চৌকিদার নটবর ওঝা চাবুক তুলে ছপাৎ-ছপাৎ ক'রে ঘোড়াগুলোকে মারতে শুরু ক'রে দিলে এবং তারাও চম্‌কে উঠে পাঁই পাঁই ক'রে এমন দৌড় মারলে যে, ইঞ্জিনখানা আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গার্ডের গাড়িকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।......আরে আরে, শেষ-গাড়ির ছাদে ব'সে আছে ও কে ? ও-যে আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুণ! ঘোড়াগুলো তাঁকে দেখে বড় বড় দাঁত কিড়-মিড় করছে, আর ঘোড়ার কামড় খাবার ভয়ে কেঁপে কেঁপেই নিস্তারিণী ঠাকরুণের প্রাণটা যায় বুঝি!

গোবিন্দ বললে, "নটবর, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে দশ টাকা বখ্‌শিস্ দেব!"

পাগলের মত ঘোড়াদের চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে নটবর হুম্‌কি দিয়ে বললে, "চুপ কর ছোক্‌রা, অত আর বাজে বকতে হবে না!"

গোবিন্দ আর সইতে পারলে না, ট্রেন থেকে মারলে এক লাফ! গোণা কুড়িটা ডিগবাজি খেয়ে সে লাইনের ঢালু জমি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে গেল। তারপর উঠে ফিরে দেখে, রেলগাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগারোটা ঘোড়া মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকেই।

আবার চলল চৌকিদার নটবরের চাবুক এবং সঙ্গে সঙ্গে হেঁড়ে গলার হাঁক—"ধর্, ধর্, ছোঁড়াকে ধর্!"

ঘোড়াগুলো অম্‌নি রেলগাড়ি নিয়ে লাইন ছেড়ে নিচে লাফিয়ে প'ড়ে গোবিন্দকে ধরতে এল। রেলগাড়িখানাও ক্রমাগত লাফ মারতে লাগল রবারের বলের মত।

এর পর কি করা উচিত তা নিয়ে গোবিন্দ মাথা ঘামালে না

মোটেই। দৌড়তে লাগল সে যত-জোরে পারে,—পেরিয়ে গেল একটা ময়দান, পেরিয়ে গেল একটা জঙ্গল, পেরিয়ে গেল একটা নদী। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায় আর দেখে, ঘোড়ায়-টানা ট্রেনও তেড়ে আসছে হুড়্মুড়্ ক'রে! সামনে তার যত গাছ-টাছ পড়ছে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—মাঠের উপরে দাঁড়িয়ে রইল খালি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, আর তার একটা ডালে ঝুলতে ঝুলতে আর কাঁদতে কাঁদতে ক্রমাগত তুই পা ছুঁড়ছেন আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুণ।

সামনেই সেই তুশো-তলা বাড়ি। জানলা যার হাজার হাজার। গোবিন্দ সুমুখের একটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল আর পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ট্রেনও তাই করলে! তখন গোবিন্দের কি ঘুমই যে পেয়েছে! কিন্তু এখন হাত-পা আরামে ছড়িয়ে একটু চোখ বোঁজ্বার যো কি আছে, ট্রেন যে নাছোড়বান্দা! বাড়ির ভিতর দিয়ে এগারোটা ঘোড়া আর রেলগাড়িগুলো ছুটে আসছে টগ্ বগ্ টগ্ বগ্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্!

মস্ত বাড়ির গা বয়ে একখানা লোহার মই উঠে গেছে একেবারে সোজা ছাদ পর্যন্ত। গোবিন্দ তড়্ তড়্ ক'রে মই বয়ে উপরে উঠতে লাগল। ভাগ্যে সে জিম্নাষ্টিকে পাকা। নইলে এই বেয়াড়া মই বয়ে কি ওঠা যায়! এক, তুই, তিন, চার ক'রে গুণতে গুণতে সে উপরে উঠছে! পঞ্চাশ তলা পর্যন্ত উঠে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, মাঠ-নদী প'ড়ে রয়েছে কত নিচে—গাছপালাগুলো দেখাচ্ছে কত ছোট ছোট! ও বাবা, দফা সারলে বুঝি! ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়িখানাও যে মই বয়ে উপরে উঠছে! খটাখট্ খটাখট্ বেজে বেজে উঠছে মইয়ের ধাপগুলো! ট্রেনের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না, মইখানা যেন তারই নিজস্ব রেল-লাইন!

গোবিন্দও উপরে উঠেছে—আরো, আরো উপরে! এই তো একশো তলা···এই তো একশো কুড়ি তলা!···একশো চল্লিশ তলা······একশো ষাট···একশো আশি···একশো নব্বই···তুশো তলা! যাঃ, মই ফুরুলো।

ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ ভাবছে, এখন উপায়? ঘোড়াদের খুরের, রেলগাড়ির চাকার শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে যে!

গোবিন্দ ছাদের ধারে গেল। পকেট থেকে রুমালখানা বার ক'রে মাথার উপরে দুই হাত বিছিয়ে ধরলে। তারপর সেই রুমাল-প্যারাচুট্ ধ'রে দিল এক লম্ফ। ট্রেন ছাদে উঠেও তাকে ধরতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল থম্‌কে। আর বিষম হুড়মুড়ুনি শুনতে শুনতে গোবিন্দ নামছে পৃথিবীর মাটির দিকে—তারপর আর কিছু শোনা কি দেখা যায় না।

তারপর—দড়াম্! গোবিন্দ মাঠের উপরে এসে পড়ল। খানিকক্ষণ ধ'রে হাঁফ ছাড়লে দুই চোখ বুজে। তার মনে হ'ল, সে যেন ভারি একটা মিষ্টি স্বপন দেখছে।

তারপর চোখ খুললে। এবং সেইখানেই চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে পেলে দুশো-তলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত।

দেখলে, ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এগারোটা ঘোড়া নিজেদের মাথার উপরে খুলে ধরলে এক-একটা ছাতা। চৌকিদার নটবরও ছাতার বাঁট নেড়ে ঘোড়াদের গোঁজা দিতে লাগল। ঘোড়ারা আর ইতস্ততঃ না ক'রে ছাতা ধ'রে ট্রেন টেনে লাফিয়ে পড়ল নিচের দিকে। ট্রেন যত নিচে নামছে দেখতে হয়ে উঠছে তত বড়।

গোবিন্দ হাঁক্-পাঁক করে উঠে পড়ল। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়। এবারে সে ছুটছে সেই কাচের ঘরখানার দিকে। কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের মধ্যে ব'সে সেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে তার মা গল্প করছেন নিস্তারিণী ঠাকরুণের সঙ্গে। আঃ, বাঁচা গেল! মা রয়েছেন আর ভয় কি?

এক ছুটে ভিতরে গিয়ে বললে, "মা, মা, এখন আমি কি করব?"

কমলা বললেন, "কেন, কি হয়েছে?"

—"দেওয়ালের ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখ!"

কমলা দেখলেন, একখানা ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়ি বোঁ বোঁ ক'রে তেড়ে আসছে কাচের ঘরের দিকে।

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, "ওমা, কি হবে! নটবর চৌকিদার চালাচ্ছে রেলের গাড়ি!"

গোবিন্দ বলল, "নটবর অনেকক্ষণ ধ'রে আমাকে তাড়া করছে!"

—"কেন?"

—"মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছে উঠে আমি পেয়ারা পেড়েছিলুম ব'লে।"

—"বেশ করেছিলে। পেয়ারা গাছে না উঠলে কেউ কখনো পেয়ারা পাড়তে পারে?"

—"কেবল তাই নয় মা। নটবর জানতে চায়, আমার সঙ্গে আরো কে কে ছিল? তা আমি বলব কেন? সেটা নিচতা হবে যে!"

নিস্তারিণী বললেন, "নটবর হচ্ছে বদমাইসের ধাড়ী। কমলা, সেলাইয়ের কলটা ভালো ক'রে টিপে দাও তো, দেখি নোটো-মুখপোড়া কেমন ক'রে আমাদের ধরে।"

কমলা ভাল ক'রে কল টিপলেন। অমনি সেই কাচের ঘরখানা বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে শুরু করলে। তার দেওয়ালে দেওয়ালে সূর্যের কিরণ ঠিকরে প'ড়ে সৃষ্টি করলে যেন লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের ফুলঝুরি! এখন তার দিকে তাকালেও চোখ ঝল্সে অন্ধ হয়ে যায়!

এগারোটা ঘোড়া চম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ডাক ছাড়লে—চিঁহিঁ চিঁহিঁ, চিঁহিঁ চিঁহিঁ, চিঁহিঁ চিঁহিঁ, চিঁহিঁ! ভয়ে তাদের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তারা আর এক পা এগুতে নারাজ।

নটবর রেগে চাবুক চালাতে চালাতে চ্যাচালে, 'ড্যাম্, রাস্কেল, গাধা, ঘোড়া! ছোট্ বলছি!"

এবারো ঘোড়া ছুটল না।

নিস্তারিণী একগাল হেসে মিশি-মাখা কালো দাঁত বার ক'রে বললেন, "এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন জব্দ!"

গোবিন্দ ফুর্তি-ভরে হাততালি দিয়ে বললে, "কী মজা রে, কী মজা! মা, তুমি এখানে আছ জানলে আমি কি আর ঐ কিম্ভূতকিমাকার ঢ্যাঙা বাড়িখানার ছাদে গিয়ে উঠতুম?"

ঘোড়ারা এবারে আর রাশ মানলে না, ফিরে নটবরকে নিয়ে আবার রেল-লাইনের দিকে দিলে চম্পট। নিষ্ফল আক্রোশে নটবর-চৌকিদারের চাবুক আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে বললে, "ও নটবর! তোমার বড্ড খাটুনি হ'ল। ক্ষিধে পেয়ে থাকে তো একটা পেয়ারা খেয়ে যাও।"

কমলা বললেন, "খোকন, তোমার জামা-টামা ছিঁড়ে যায়নি তো?"

"না, মা।"

—"আর সেই নোটগুলো? সেগুলো সাবধানে রেখেছ তো?"

গোবিন্দের বুকের কাছটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মাথা ঘুরে সে প'ড়ে গেল এবং—

এবং তারপর জেগে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দের লিলুয়ায় অবতরণ

গোবিন্দ জেগে উঠে দেখলে, ট্রেন একটা নতুন স্টেশন ছেড়ে আবার চলতে শুরু করলে।

সে বেঞ্চির উপর থেকে নিচে প'ড়ে গিয়েছে। আর তার বুকটা করছে ভয়ে ধুকপুক ধুকপুক। তার এতটা ভয় হবার কারণ সে আন্দাজ করতে পারলে না। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল?

তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল। সে যাচ্ছে কলকাতায়। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। আর তার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই গান্ধী-টুপি-পরা ঘোড়ামুখ।

মনে পড়তেই টপ্ ক'রে সে উঠে বসল। কাম্‌রায় কেউ নেই। ঘোড়ামুখ অদৃশ্য।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, তার পা কাঁপছে। আগে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে ফেললে। তারপর মনে মনে প্রশ্ন করলে, নোটগুলো যথাস্থানে আছে তো?

আবার শুনতে পেলে নিজের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যেন থ!

জটাধর ছিল তো ঐ কোণে—চকোলেট খাচ্ছিল, ঘুমোচ্ছিল, নাক ডাকাচ্ছিল! কখন্ জাগল? কখন্ গেল?…তা সকলেই তো তার মত কলকাতার যাত্রী নয়! জটাধর নিজের স্টেশনে নেমে গেছে।

নোট তার পকেটেই আছে নিশ্চয়—ভালো ক'রে আল্‌পিনে গাঁথা। তবু একবার হাত দিয়ে দেখা যাক্!

ওরে বাপ রে, এ কি! পকেট যে একেবারে খালি! নোট নেই, খাম নেই, কিছুই নেই!

গোবিন্দ পাগলের মত সব পকেট হাত্‌ড়ে দেখলে। নোট নেই। …এটা কি? ও, সেই বড় আল্‌পিনটা! ওমাঃ! আল্‌পিনটা যে আঙুলে ফুটে গেল! রক্ত পড়ে যে!

আঙুলে রুমাল জড়িয়ে গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। আলপিন ফুটেছে ব'লে সে কাঁদছে না, তার কান্না এসেছে টাকার শোকে। তার কান্না এসেছে মায়ের মুখ মনে ক'রে। কত খেটে, কত কষ্টে, মা এই টাকাগুলি জমিয়েছেন। আর সে কিনা রেলগাড়িতে চ'ড়েই মজা ক'রে একটা লম্বা ঘুম দিলে, একটা পাগলা স্বপ্ন দেখলে, আর একটা বিচ্ছিরি ঘোড়ামুখো চোরের হাতে তুলে দিলে অতগুলো টাকা!

এখন কি করবে সে? কোন্ মুখে হাওড়ায় নেমে মাসীর বাড়ি গিয়ে দিদিমাকে বলবে, "আমি এসেছি বটে, কিন্তু তোমার টাকা আনিনি। হ্যাঁ, আরো শুনে রাখো দিদিমা, বাড়ি ফেরবার সময়ে আমার রেলভাড়া দিতে হবে তোমাকেই!

অসম্ভব, অসম্ভব! মার টাকা জমানোই মিছে হ'ল। দিদিমা কাণাকড়ি পাবেন না! তার কলকাতা দেখাও হবে না, সে বাড়িতে ফিরে

যেতেও পারবে না। ওরে ঘোড়ামুখ, সর্বনাশ করবি ব'লেই তুই কি আমাকে চকোলেট খেতে দিয়েছিলি, আর মিথ্যে নাক ডাকিয়ে পড়েছিলি মটকা মেরে? হায়রে হায়, পৃথিবীটা কি খারাপ জায়গা! গোবিন্দের চোখ ছাপিয়ে ঝরতে লাগল ঝর্ ঝর্ ক'রে জল।

খ্যানিকটা লোনা চোখের জল তার মুখের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সে ভাবলে, কাম্রার 'কমিউনিকেশন কর্ড' ধ'রে টান মেরে গাড়িখানা থামিয়ে ফেলি।

তারপর? গার্ড-সায়েব আসবে। জিজ্ঞাসা করবে, "কি হয়েছে? গাড়ি থামালে কেন?"

সে বলবে, "আমার টাকা চুরি গিয়েছে।"

গার্ড হয়তো বলবে, "হুঁশিয়ার না হ'লে তো টাকা চুরি যাবেই! তোমার নাম কি ছোক্‌রা? তোমার ঠিকানা কি? মিছামিছি গাড়ি থামিয়েছ, তোমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে।"

এখন ক'টা বেজেছে? কলকাতা আর কত দূরে? ঘোড়ামুখো জটাধর এখন কোথায়? সে অন্য কোন কাম্রায় ঘুপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো? আশ্চর্য নয়। হয়তো পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই সে গাড়ি থেকে নেমে লম্বা দেবে!

গোবিন্দ কামরার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পিছিয়ে যাচ্ছে সবুজ গাছের ছায়া-মাখা গ্রাম, বড় বড় জম্‌কালো অট্টালিকা, লাল-সাদা-হল্‌দে রঙের বাগান-বাড়ি! কালিপুরে তো এমনধারা একখানা বাড়িও নেই! বোধ হয় গাড়ি কলকাতা শহরের কাছেই এসে পড়েছে!

পরের স্টেশনেই গার্ড-সায়েবকে ডেকে সব কথা খুলে বলতে হবে। গার্ড নিশ্চয়ই তখনি পুলিশে খবর দেবে।

কিন্তু তাহ'লে হবে আবার বিপদের উপর বিপদ! আবার আসবে নটবর-চৌকিদার। এবারে সে আর চুপ করে থাকবে না। পুলিশের বড়-সায়েবকে ডেকে হয়তো বলবে, "হুজুর, কেন জানি না, ও ছোক্‌রাকে

আমি মোটেই পছন্দ করি না। মুখুয্যেদের গাছ থেকে গোবিন্দ পেয়ারা চুরি ক'রে খায়। ও বলছে, ওর একশো পঁচিশ টাকা চুরি গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওর টাকা চুরি যায়নি টাকাগুলো ও নিজেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। যে পেয়ারা চুরি করে, সে কি না করতে পারে? মিথ্যা চোরের খোঁজ ক'রে লাভ নেই। চোর হচ্ছে গোবিন্দ নিজেই। টাকাগুলো নিয়ে ও বাড়ি থেকে পালাবার মৎলব করেছে। হুজুর, গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিন!"

কি ভয়ানক, পুলিশে খবর দেওয়াও তো চলবে না দেখছি।

গাড়ির গতি ক'মে আসছে ধীরে ধীরে। বোধ হয় পরের স্টেশন এল।

গোবিন্দ নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হ'তে লাগল। পরে যা হবার তা হবে, কিন্তু এ গাড়িতে সে আর একদণ্ড থাকতে পারবে না। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই তো স্টেশন। লোকজনে গম্ গম্ করছে। গোবিন্দ স্টেশনের নামটা পড়ে দেখল—লিলুয়া। এটাও তাহ'লে কলকাতা নয়?

গাড়ির নানা কাম্‌রা থেকে যাত্রীরা নামছে। অনেকে আবার উঠছেও। চারিদিকে তাড়াহুড়ো আর চ্যাঁচামেচি।

জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোবিন্দ গার্ডকে খুঁজছে, হঠাৎ ভিড়ের ভিতরে দেখা গেল এক গান্ধী-টুপি। কে ও! সেই ঘোড়ামুখো জটাধর নয় তো? গাড়ি থেকে নেমে স'রে পড়বার চেষ্টা করছে?

একটি লম্বা লম্ফ, পর-মুহূর্তে গোবিন্দ একেবারে প্লাটফর্মের উপরে। তার ডান-হাতে ব্যাগ, বাঁ-হাতে কাগজে মোড়া ফুল। তারপর দৌড়।

কোথায় লুকালো সেই গান্ধী-টুপি? গোবিন্দ কখনো হোঁচট খায়, কখনো অন্য লোকের পায়ের উপরে গিয়ে পড়ে। ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে—প্রতি পদেই বাধা।

ঐ যে সেই গান্ধী-টুপি! আরে, ওখানে যে আরো একটা গান্ধী-টুপি রয়েছে! ওর মধ্যে কে চোর আর কে সাধু?

তিন চারজন লোককে ধাক্কা মেরে গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

প্রথম গান্ধী-টুপিটার তলায় সে দৃষ্টিপাত করলে। ওখানে ঘোড়া-মুখ নেই।

দ্বিতীয় টুপিটা কার ? উঁহু, ও-লোকটা বেজায় বেঁটে।

তবে সে কোথায় ? সে কোথায় ? ব্যূহের মধ্যে বন্দী অভিমন্যুর মত গোবিন্দ জনতার ভিতর থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগল।

ওহো, ঐ যে—ঐ যে! ওরে জটাধর, এইবার পেয়েছি তোকে। আর তোর নিস্তার নেই।

জটাধর গেটের কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। গোবিন্দও তাই করলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হ্যারিসন রোডের ট্রামগাড়ি

গোবিন্দ প্রথমে ভাবলে, একদৌড়ে চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলি, "কি হে জটাধর, আমাকে চিনতে পারছ ? টাকাগুলো কোথায় রেখেছ, বার কর দেখি ?"

কিন্তু লোকটার ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় না যে বলবে, "তোমাকে চিনেছি বৈকি! এই নাও ভাই তোমার টাকা। আর কখনো আমি চুরি করবো না।"

উঁহু, ব্যাপারটা এত সোজা নয়। পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আপাতত ওকে চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া হবে না।

জটাধর চারিধারে তাকাতে তাকাতে চলেছে। একটা খুব মোটাসোটা মেমের দেহের আড়ালে আড়ালে থেকে গোবিন্দও অগ্রসর হচ্ছে।

আচ্ছা, মেমটাকে সব কথা খুলে বলব নাকি ? বলব জটাধরকে ধরিয়ে দিতে ?

কিন্তু জটাধর যদি বলে—"সে কি মেম-সাহেব, আমি কি এতই পাষণ্ড যে, অতটুকু ছেলের টাকা চুরি করব ?"

আর মেম যদি তার কথায় বিশ্বাস ক'রে বলে—"হ্যাঁ, তোমাকে পাষণ্ড ব'লে মনে হচ্ছে না তো! কালে কালে হ'ল কি ? একরত্তি ছেলেরাও মিছে কথা বলতে শিখেছে!"

হঠাৎ মেম-সাহেব পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকল। পাছে ধরা প'ড়ে যায় সেই ভয়ে গোবিন্দ আরো পিছিয়ে পড়ল।

জটাধর চলেছে তো চলেছেই। সে কোথায় যাচ্ছে!

গোবিন্দের হাতের ব্যাগটা যে দু-মণ ভারি হয়ে উঠেছে! তার পা দুটোও আর চলতে চাইছে না। প্রতি পদেই তার মন বলছে, ওহে গোবিন্দ, ব্যাগটা মাটিতে রেখে ব'সে ব'সে একটু জিরিয়ে নাও। কিন্তু হায়রে, জিরিয়ে নেবার কি সময় আছে ? জটাধর যতক্ষণ হাঁটবে, ততক্ষণ তাকেও হাঁটতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে গোবিন্দের গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গেলেও উপায় নেই!

রাস্তা ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে! ভিড় বাড়ছে, গাড়ি-ঘোড়া বাড়ছে, বড় বড় বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে! তবে কি তারা কলকাতার কাছে এসে পড়েছে ?

বাবা, পৃথিবীতে বড় বড় শহরের এক-একটা পথে এত রকম গাড়ি একসঙ্গে চলে নাকি ?

না, আর যে পোষায় না! হেঁটে হেঁটে আমার পা বোধহয় ক্ষ'য়ে ছোট হয়ে গেছে।

কি আশ্চর্য, ওটা আবার কি-রকম বাড়ি ? এত মস্ত! ওর ভিতরে কত লোক ব্যস্ত হয়ে ঢুকছে—কত লোক আবার ওখান থেকে বেরিয়েও আসছে! হ্যাঁ মশাই, ওটা কার বাড়ি বলতে পারেন ? কি বললেন ? হাওড়া স্টেশন ?

হুঁ, তাহ'লে হাওড়ায় এসেছি! তার মানেই কলকাতায়! ঐ হচ্ছে গঙ্গা, আর ঐ হচ্ছে হাওড়ার পোল ? জটাধর যে পোলের উপর দিয়েই

চলল। বোধহয় ও কিছু সন্দেহ করেছে। খালি খালি চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমাকে একবার দেখতে পেলেই ভোঁ-দৌড় মারবে!

এই তো পোল শেষ হয়ে গেল। এইবার বোধহয় কলকাতায় পা দিলুম? আর কত চলব, ব্যাগের ভারে হাত যে ছিঁড়ে যাচ্ছে!

কী ভিড় বাবা, কী ভিড়! কত গাড়ি! মনে হচ্ছে সব গাড়ি যেন আমাকে চাপা দিয়ে মারবার জন্যে রেগে-মেগে তেড়ে আসছে!

ওগুলো আবার কি গাড়ি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি লোকের মুখে ওর কথা শুনেছি, ওর ছবিও দেখেছি। ওর নাম ট্রামগাড়ি।

আরে, জটাধর যে ট্রামগাড়িতেই উঠে পড়ল! তাহ'লে—

গোবিন্দ প্রাণপণে দৌড়ে ট্রামগাড়ির উপর আগে নিজের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর নিজেও উঠে পড়ল।

জটাধর সামনের দিকের একটা "সিটে" গিয়ে বসল। গোবিন্দ রইল পিছন দিকে। গাড়ির দরজার কাছে এবং ভিতরেও জায়গার অভাবে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভিতর তার ছোট দেহ একরকম অদৃশ্য হয়েই গেল।

এর পর কি হবে? জটাধর একবার যদি তাকে দেখতে পায়, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। সে একলাফ মেরে নিচে নেমে কোথায় পালিয়ে যাবে, এই ভারি ব্যাগটা নিয়ে গোবিন্দ তার পিছনে পিছনে ছুটতে পারবে না কিছুতেই!

ওঃ, রাস্তায় মোটর-গাড়ি যে আরো বেড়ে উঠল! দু-ধারের ঢ্যাঙা বাড়িগুলো যে শূন্যে উঠে আকাশকে ঢেকে ফেলবার যোগাড় করেছে। রাস্তার দুদিকেই সারি সারি কত সাজানো-গুছানো দোকান! খাবারের দোকান, ফলের দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান! আর লোকের ভিড়ের তো কথাই নেই! এত লোকও শহরে ধরে? এই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে জটাধর একবার যদি ভিড়তে পারে, তাহ'লে আর কে পাবে তার পাত্তা?

গাড়িতে আরো লোক উঠছে। আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই, নিঃশ্বাস

ফেলতেও কষ্ট হয়। ভিড়ের মধ্যে জটাধর পাছে আবার ফাঁকি দেয়, সেই ভয়ে গোবিন্দ বারবার এর হাতের তলা, ওর পায়ের পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন লোক বিরক্ত হয়ে বললে, "ছোক্‌রা তো ভারি ছট্‌ফটে দেখছি। চুঁ মেরে মেরে জ্বালাতন ক'রে তুললে যে!"

গোবিন্দ দেখল, ট্রামের কণ্ডাক্টর সকলের কাছে পয়সা নিয়ে একখানা ক'রে টিকিট দিচ্ছে।

তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কি সর্বনাশ! আমার কাছে যে একটা আধলাও নেই। এবার সে নিশ্চয় আমার কাছে এসে পয়সা চাইবে! পয়সা না পেলেই আমাকে ট্রাম থেকে নামিয়ে দেবে। তাহ'লেই তো জটাধরের পোয়া বারো।

আচ্ছা, কোন ভদ্রলোককে কি ডেকে চুপি চুপি বলব, "মশাই, আমাকে ট্রাম-ভাড়ার পয়সা ক'টা ধার দেবেন?"

উঁহু, ওরা ধার-টার দেবে ব'লে মনে হচ্ছে না। ওদের মুখগুলো যা গোম্‌ড়া! যেন সারা দুনিয়ার ওপরেই ওরা বিরক্ত।

একজন আরোহী আর একজনকে ডেকে বললে, "ওহে, পকেট সামলাও! আজকাল ট্রামে ভারি পকেট-কাটার অত্যাচার হয়েছে।"

গোবিন্দ মনে-মনে বললে, "খালি ট্রামে নয়, ট্রেনেও।"

আর একজন আরোহী বললে, "শুনেছি, জনকয় ভদ্রলোকের ছেলে দল বেঁধে এই কাজ করছে। তারা ট্রামে উঠে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পকেট সাফ করে। তাদের চেহারা আর পোশাক দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারে না!"

গোবিন্দের রকম-সকম দেখে কেউ কেউ তার দিকেও সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকাতে লাগল। কেউ কেউ পাঞ্জাবী বা সার্টের পকেট টেনে কোলের উপর তুলে রাখলে।

কণ্ডাক্টর এসে গোবিন্দকে ডেকে বললে, "টিকিট।"

গোবিন্দ জানে, চুরির কথা বললে কেউ এখানে বিশ্বাস করবে না।

মাঝে মাঝে সত্য কথাও যে সাংঘাতিক হ'তে পারে, সে এই প্রথম সেটা অনুভব করলে। বললে, "আমার পয়সা হারিয়ে গেছে।"

কণ্ডাক্টর বললে, "পয়সা হারিয়ে গেছে? টিকিট কিনতে পারবে না? এ গল্প আগেও আমি অনেকবার শুনেছি। কোথায় যাবে শুনি?

—"আমি—আমি জানি না মশাই"—গোবিন্দ বললে বাধো বাধো গলায়।

—"ও, তাই নাকি? কোথায় যাবে তাও জানা নেই? বেশ, এইবার ট্রাম থামলেই তুমি সুড়্ সুড়্ ক'রে নেমে যেও।"

—"তা তো আমি পারব না। আমাকে এই গাড়িতেই যেতে হবে।"

—"আমি যখন বলছি তখন তোমাকে নামতে হবেই, বুঝলে?"

গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

একটি ভদ্রলোক একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি মুখ তুলে বললেন, "কণ্ডাক্টর, এই পয়সা নাও। ছেলেটিকে টিকিট দাও।"

কণ্ডাক্টর গোবিন্দের হাতে টিকিট দিয়ে ভদ্রলোকটিকে বললে, "আপনি জানেন না বাবু, প্রতিদিনই কত ছেলে ট্রামে উঠে এমনি বলে যে, তাদের পয়সা হারিয়ে গেছে। কেউ দয়া ক'রে পয়সা দিলে তারা আবার মনে মনে হাসে।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ'তে পারে। কিন্তু এই ছেলেটি হাসবে না।"

কণ্ডাক্টর আর কিছু না ব'লে অন্য দিকে চ'লে গেল।

গোবিন্দ বললে, "মশাই, আপনি আমার কী উপকারই যে করলেন।"

—"কিছু না খোকাবাবু, কিছু না।" ব'লেই তিনি আবার খবরের কাগজের দিকে মুখ ফেরালেন।

গোবিন্দ বললে, "আপনার নাম আর বাড়ির ঠিকানাটা কি বলবেন?"

—"কেন?"

—"তাহ'লে পয়সাগুলো আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। আমি কলকাতায় এখনো কিছুদিন থাকব। আমার নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র

রায়, বাড়ি কালিপুরে।"

—"গোবিন্দবাবু ভাড়ার পয়সা তোমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তুমি আরো কিছু পয়সা নেবে?"

গোবিন্দ জোরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, আর আমার পয়সা চাই না।"

ভদ্রলোক হেসে আবার কাগজ পড়তে লাগলেন।

ট্রাম চলছে আর থামছে। এতক্ষণ গোবিন্দের যা ভয় হচ্ছিল! তাদের এই গোলমাল শুনে যদি জটাধর একবার মুখ ফেরাতো, তাহ'লে কী যে হ'ত! ভাগ্যে রাস্তার আর ট্রামের নানান্ শব্দে তাদের কথাবার্তা অতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়নি!

এটা কি রাস্তা? গোবিন্দ একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, হ্যারিসন রোড।

রাস্তাটা চমৎকার বটে, আরো ভালো ক'রে দেখতে পারলে বেশ হ'ত, কিন্তু খুঁটিয়ে অন্য কিছু দেখবার মত মনের অবস্থা তার নয়।

কোথায় যে যাচ্ছে, তাও সে জানে না! এত বড় শহর, আর সে কত ছোট! কেতাবে পড়েছে, কলকাতায় লোক আছে কম করেও একুশ লক্ষ! ওরে বাব্বাঃ! এর মধ্যে হারিয়ে গেলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

চোর জটাধর এখনো ট্রামেই ব'সে আছে। হয়তো এর মধ্যে জটাধরের মত আরো অনেক চোরের অভাব নেই। কিন্তু তাকে নিয়ে তারা কেউ বোধ হয় আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ট্রামের আর কোন আরোহীও কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে না যে, কেন তার কাছে পয়সা নেই, কেন সে জানে না কোথায় তাকে নামতে হবে? কলকাতা শহরটাই বোধ হয় এমনি বেয়াড়া, এখানে কারুর কথা জানবার জন্যে কারুর আগ্রহ নেই।

ভবিষ্যতে তার কপালে কি আছে, কে জানে। গোবিন্দের মনে হ'ল এমন জনতার মধ্যেও সে যেন অত্যন্ত একাকী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নমিতা সেন ও তার সাইকেল

ওদিকে মাসতুতো বোন নমিতা সেন আর তার দিদিমা গোবিন্দের জন্য হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির।

নমিতা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসত, কিন্তু দিদিমার আসবার কথা নয়।

কিন্তু গোবিন্দের মেসো চন্দ্রবাবুর হঠাৎ কাল রাত থেকে পেটের অসুখ হয়েছে, কাজেই তাঁর পক্ষে আজ স্টেশনে আসা অসম্ভব! অন্য কোন লোক পাঠালেও চলবে না। কারণ, গোবিন্দকে কেউ চেনে না।

অতএব দিদিমা বললেন, "আমার নাতি এই প্রথম কলকাতায় আসছে, সে এখানকার কিছুই জানে না। যদি সে বিপদে পড়ে?... উঁহু, আমি এ-সব পছন্দ করি না—আমি এ-সব পছন্দ করি না। চাকরকে নিয়ে আমিই ইষ্টিশানে যাব। রামফল, শীগ্‌গির একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন্।"

চাকর রামফল গাড়ি ডাকতে ছুটল।

নমিতা বললে, "দিদ্‌মা, মিছে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কি হবে? আমার তো সাইকেল আছে, আমি চালাব আর তুমি দিব্যি আরামে আমার সামনে উঠে ব'সে থাকবে!"

দিদিমা শিউরে উঠে বললেন, "বাপ রে, বলিস কি রে সর্বনাশী!"

—"কেন দিদ্‌মা, পাড়ার বন্ধু তো আমার সঙ্গে এক সাইকেলে চড়ে। তুমি কি বন্ধুর চেয়েও ভারি?"

—"ও কথা শুনলে তোমার বাবা এখুনি সাইকেল কেড়ে নেবেন।"

নমিতা চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে, "মা গো মা! দিদ্‌মার কাছে কোন মনের কথাই বলবার যো নেই। এর মধ্যে আবার বাবার নাম ওঠে

কেন ?"

হাওড়ার স্টেশনে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে! কত গাড়ি এল, বাক্স-প্যাঁট্‌রা নিয়ে কত লোকই নামল! নাকে চশমা লাগিয়ে দিদিমা ভাল ক'রে দেখলেন, কিন্তু গোবিন্দের দেখা পান না।

নমিতা বললে, "গোবিন্‌দা বোধ হয় দেখতে খুব বড় হয়ে উঠেছে, আমরা কেউ আর তাকে চিনতে পারছি না।"

দিদিমার বিশ্বাস হয় না! নমিতা হতাশ ভাবে টুং-টাং ক'রে সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়।

দিদিমার ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁর নাতনী সাইকেল ঘাড়ে ক'রে স্টেশনে আসে। কিন্তু শেষটা সে এমন আবদার ধ'রে বসল যে, তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "নাতনী না পেত্নী! বেশ, তাই নিয়ে চল্‌! কিন্তু রাস্তায় চড়তে পাবে না, গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে হবে!"

নমিতা খুশি হয়ে বললে, "তুমি কিচ্ছু বোঝ না দিদ্‌মা! আমার সাইকেল দেখে গোবিন্‌দা যে কী অবাকটাই হবে!" মানসচক্ষে ব্যাপারটা আর একবার দেখে নিয়ে সে ব'লে উঠল, "ও হো, বড় মজা।"...

...দিদিমার দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। বললেন, "নমু, ক'টা বাজ্‌ল ছাখ্‌ তো!"

নমিতা হাত তুলে নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে, "বেলা একটা বাজতে বিশ মিনিট।"

দিদিমা বললেন, "এতক্ষণে তো গাড়ি এসে পড়বার কথা!"

নমিতা বললে, "আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি খবর নিয়ে আসছি।"

একটু তফাতেই একজন রেল-কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল, নমিতা সেখানে গিয়ে বললে, "কালিপুরের গাড়ির খবর কি বলতে পারেন ?"

—"কালিপুর, কালিপুর ? ওঃ, হ্যাঁ, সে গাড়ি তো বারোটার আগে এসে গিয়েছে!"

—"এসে গিয়েছে ? কাণ্ডটা দেখ একবার! বুঝছেন মশাই, সে-গাড়িতে আমার গোবিন্‌দার আসবার কথা।"

—"তাই নাকি ঠাকৃরুণ! শুনে খুশি হলুম—শুনে খুশি হলুম, হা হা হা হা!"

—"অত হাসির ঘটা কেন শুনি? যেন একটি আস্ত জন্তু!" ব'লেই নমিতা সাইকেল টান্‌তে টান্‌তে দিদিমার দিকে ছুটল।

সেখানে আর আর যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা হাসতে লাগল। রেল-কর্মচারী চ'টে লাল!

নমিতা গিয়ে বললে, "গাড়ি অনেকক্ষণ এসে গিয়েছে দিদ্‌মা!"

দিদিমা আরো বেশি চিন্তিত হয়ে বললেন, "তা'হলে কি হ'ল বল দেখি? আজ না এলে তার মা নিশ্চয় টেলিগ্রাম করত। তবে কি গোবিন্দ কোন ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে?"

খুব ভারিক্কের মত মুখের ভাব ক'রে নমিতা বললে, "ঠিক বুঝতে পারছি না। গোবিন্‌দা ভুল স্টেশনে নামতে পারে। ব্যাটাছেলেরা যা বোকা হয়! কোথায় যেতে কোথায় যায়! কিছু জানে না!"

আরো খানিকক্ষণ কাটল।

নমিতা বললে, "আর তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। আমার টিফিন খাবার সময় হ'ল।"

দিদিমা বললেন, "কালিপুর থেকে পরের গাড়ি কখন আসবে?"

—"রোসো, খবর আন্‌ছি।" ব'লেই নমিতা আবার সেই রেল-কর্মচারীর কাছে গিয়ে হাজির।

কর্মচারী তাকে দেখেই তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, "ও মশাই, শুনছেন? আপনি কি আমার ওপরে ভারি রেগে গিয়েছেন?"

কর্মচারী না ফিরেই বললে, "আবার তোমার কি দরকার?"

—"আপনার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। এর পরে কালিপুরের গাড়ি আবার কখন আসবে, দয়া ক'রে বলবেন কি?"

কর্মচারী এবারে হেসে ফেলে ফিরে বললে, "রাত সাড়ে আটটায়।"

দিদিমার কাছে গিয়ে সেই খবর নিয়ে নমিতা বললে, "গোবিন্‌দা

বোধ হয় সেই গাড়িতেই আসবে। এখন বাড়ি চল।”

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “আমি এ-সব পছন্দ করি না—আমি এ-সব পছন্দ করি না।”

খবর শুনে বাড়ির সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। গোবিন্দ নিরুদ্দেশ!

নমিতার বাবা চন্দ্রবাবু বললেন, “কালিপুরে আমি একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দি।”

নমিতার মা বিমলা বললেন, “সর্বনাশ! অমন কথা মুখেও এনো না গো! দিদি তাহ'লে ভয়েই মারা পড়বেন। তার চেয়ে রাতের ট্রেনটা পর্যন্ত সবুর কর।”

নমিতা বললে, “গোবিন্‌দার বুদ্ধি-সুদ্ধি বড় কম। সাড়ে আটটার সময়ে আমার ঘুম পাবে। সাইকেল নিয়ে ইষ্টিশানে যেতে পারব না। আমার রাগ হচ্ছে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে। মা, খাবার দাও।”

চন্দ্রবাবু বললেন, “আমার অসুখ ক'মে এসেছে। রাতে আমি স্টেশনে যেতে পারব। গোবিন্দ হয়তো সকালে ট্রেন ফেল্ করেছে।”

দিদিমা বললেন, “আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, আমি এ-সব পছন্দ করি না—আমি এ-সব পছন্দ করি না।”

দুখানা শিঙাড়া আর দুটো সন্দেশ খেয়ে নমিতা তার ছোট্ট মাথাটি দিদিমার অনুকরণে নাড়তে নাড়তে বললে, “আমিও এ-সব পছন্দ করি না।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘণ্টু ও তার মোটর-হর্ন

ট্রাম যখন হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল, তখন গান্ধী-টুপি-পরা জটাধর হঠাৎ উঠে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এবারে গোবিন্দ ছিল অত্যন্ত সজাগ। সেও নেমে পড়ল যথাসময়ে।

জটাধর আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভিতরে ঢুকল। খানিক পরেই দেখা গেল, একখানা ছোট্ট ঘর এবং তার বাইরে একখানা মস্ত সাইন-বোর্ডে লেখা— "দি গ্রেট্ নর্দার্ন রেস্তোরাঁ।"

জটাধর মুখ তুলে নামটা পড়লে। তারপর রেস্তোরাঁর বাইরে পাতা একখানা বেঞ্চির উপরে ব'সে বললে, "চারখানা টোস্ট্, দুখানা মামলেট্, এক কাপ চা।"

এদিকের ফুটপাথে একটু এগিয়েই গোবিন্দ পেলে একটা ছোট্ট গলি। সে সাঁৎ ক'রে তার ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সেইখান থেকে জটাধরকে নজরে নজরে রাখলে।

জটাধর ব'সে ব'সে টানতে লাগল সিগারেট। তার মুখখানা খুশি-খুশি। আজকের রোজগারটা ভালই হয়েছে—খুশি হবে না কেন?

গোবিন্দ এখন ভবিষ্যতের কর্তব্য কিছুই জানে না। আপাততঃ খালি এইটুকুই জানে যে, জটাধরকে সে কিছুতেই আর অদৃশ্য হ'তে দেবে না।

জটাধরের হাসিমুখ দেখে তার গা জ্বালা করতে লাগল। হতাভাগা চোর পরের টাকা চুরি ক'রে কেমন নিশ্চিন্ত প্রাণে সকলের সুমুখে ব'সে আরাম করছে, আর চোরের মত লুকিয়ে থাকতে হয়েছে তাকেই—চুরি গিয়েছে যার অতগুলো টাকা। ভগবান কি এ সব দেখেও দেখছেন না? এর পর ও মজা ক'রে খাবার খেয়ে ভরা পেটে কোথায় চ'লে যাবে, আর

ক্ষিধেয় ধুঁকতে ধুঁকতে আবার তাকে কুকুরের মত যেতে হবে তার পিছনে পিছনে! কী অবিচার!

এখন যদি কোন পাহারাওয়ালা তাকে দেখতে পায়, তাহ'লেই হয় চূড়ান্ত। পাহারাওয়ালা নিশ্চয় তার কাছে এসে বলবে, "ওহে, তোমাকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমার ভাবভঙ্গি চোরের মতন। ভালো-মানুষটির মত আমার সঙ্গে থানায় চল, নইলে বের কর হাত—পরো হাতকড়ি!"

হঠাৎ একেবারে গোবিন্দের পিছনেই ভোঁপ্ ভোঁপ্ ভোঁপ্ ক'রে মোটর-হর্নের বেজায় আওয়াজ হ'ল। সে আঁৎকে উঠে মস্ত এক লাফ মেরে পিছন ফিরেই দেখে, সার্ট ও প্যাণ্ট পরা একটা তারই সমবয়সী ছেলে হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

সে বললে, "সেলাম বাবু-সায়েব, অত বেশি ভয় পাবার দরকার নেই।"

গোবিন্দ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললে, "মোটরের হর্ন বাজল, মোটর গাড়ি নেই তো!"

ছোকরা বললে, "ধেৎ, তুমি ভারি বোকা! মোটর আবার কোথায়? হর্ন তো আমি বাজিয়েছি!...ও, বুঝেছি! তুমি এই অঞ্চলে থাকো না! এখানকার সবাই জানে, আমার কাছে সর্বদাই হর্ন থাকে!"

—"না, আমি তোমাকে চিনি না। আমার দেশ কালিপুরে, আমি সবে কলকাতায় এসেছি।"

—"ও, পাড়াগেঁয়ে ছেলে, বটে! তাই তুমি অমন বেয়াড়া খালাসী-রঙের পোশাক পরেছ!"

এই পোশাকটার সম্বন্ধে গোবিন্দেরও দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট! কিন্তু পরের মুখ থেকে সে মায়ের দেওয়া পোশাকের নিন্দা শুনতে রাজি নয়। ক্ষাপ্পা হয়ে বললে, "ফের ও-কথা বললে আমি তোমাকে ঘুষি মারব!"

বালক খুশি-মুখেই বললে, "আরে আরে—চট্‌লে নাকি ভায়া? প্রথম আলাপেই কি এতটা রাগারাগি করতে আছে?" তবে নিতান্তই যদি চাও, আমি তাহ'লে ঘুষি লড়তে রাজি আছি।"

গোবিন্দ বললে, "বেশ, আজ ও-সব থাক্। আমার এখন সময় নেই।" —ব'লেই উঁকি মেরে একবার দেখে নিলে, জটাধরের গান্ধী-টুপি রাস্তার ওধার থেকে অদৃশ্য হয়েছে কি না।

বালক বললে, "আমি তো দেখছি তোমার হাতে এখন অনেক সময় আছে। তুমি তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ! তুমি যখন খেলতে পারো, তখন লড়তেই বা পারবে না কেন?"

—"আমি লুকোচুরি খেলছি না, একটা ধাড়ী চোরের ওপরে নজর রাখছি।"

বালক দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "কি বললে? চোর? কোথায়? কি চুরি করেছে?"

গোবিন্দ গর্বিত স্বরে বললে, "সে আমার টাকা চুরি করেছে। রেলগাড়িতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিদিমাকে দেবার জন্য আমার পকেটে অনেক টাকা ছিল। ঐ লোকটা সেই টাকা চুরি ক'রে অন্য কাম্‌রায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ট্রেন থেকে নেমে ট্রামে চ'ড়ে এইখানে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি। দেখ না, এখন ও কেমন পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে টোস্ট আর মামলেট খাচ্ছে!"

বালক উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "অ্যাঃ! বল কি হে! এ যেন বায়োস্কোপের গল্প!...তারপর? এইবার তুমি কি করবে?"

—"কিছুই জানি না ভাই! তবে ওর পিছু আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

"ঐ তো একটা পাহারাওয়ালা আসছে। ওকে ধরিয়ে দাও না।"

—"না ভাই, না! কালিপুরে আমি একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি, হয়তো সেখানকার পুলিশ আমাকেও খুঁজছে। পুলিশ ডেকে শেষটা কি নিজেই বিপদে পড়ব?"

—"ও, বুঝেছি।"

—"হাওড়া স্টেশনে মেসোর বাড়ির সবাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা কি ভাবছেন, জানি না।"

বালক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভাবলে। তারপর বললে,

'ব্যাপারটা খুব জবর বটে! আচ্ছা ভাই, তুমি যদি নারাজ না হও, তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

—"তা যদি পারো, তাহ'লে তো আমি বর্তে যাই।"

—"বহুৎ আচ্ছা! আমার নাম কি জানো? ঘণ্টু।"

—"আমার নাম গোবিন্দ।"

তারা পরস্পরের সঙ্গে 'শেক্-হ্যাণ্ড' করলে। এতক্ষণ পরে তাদের দুজনেরই দুজনকে খুব ভালো লাগল।

ঘণ্টু বললে, "তা'হলে কাজ শুরু করা যাক্। এখানে আর বেশিক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চোর বেটা আবার ফাঁকি দেবে।···হ্যাঁ, এখন প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?"

—"রামচন্দ্র! আমার হাত একেবারে ফোক্কা!"

ঘণ্টু হতাশভাবে তার মোটর-হর্নে বার-তিনেক খুব আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে। কিন্তু তবু তার বুদ্ধি খুলল না।

গোবিন্দ বললে, "আচ্ছা ভাই ঘণ্টু, কিছু ধার-টার দিতে পারে তোমার কি এমন বন্ধুবান্ধব নেই?"

ঘণ্টু উৎসাহিত স্বরে বললে, "খাসা বুদ্ধি দিয়েছ! হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই আমি করব। এর জন্যে আমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না! আমি যদি আমার হর্ন বাজাতে বাজাতে এ-পাড়ার অলি-গলিতে এক-চক্কর ঘুরে আসি, তাহ'লেই আমার বন্ধুবান্ধবরা ছুটে আসবে চারিদিক থেকে!"

—"তাহ'লে চট্‌পট্ সেই চেষ্টাই কর গে যাও। কিন্তু মনে রেখ, তোমার দেরি হ'লে জটাধর স'রে পড়বে। তখন আমাকেও যেতে হবে তার পিছনে পিছনে। তুমি ফিরে এসে আমাদের কারুকেই আর দেখতে পাবে না।"

ঘণ্টু বললে, "হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই। দেখছ না জটা-বেটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, এখনো তার চা খাওয়া হয়নি, তার ডিশেও রয়েছে পুরো একখানা মামলেট! আমি যাব আর আসব। এটা হবে জবর ব্যাপার গোবিন্দ, জবর ব্যাপার, অবাক কাণ্ড!"

বলেই সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন চালিয়ে দিলে পা!

এতক্ষণ পরে গোবিন্দের মনটা হ'ল খানিকটা ঠাণ্ডা। দুর্ভাগ্যকে আর কিছু বলা যায় না, দুর্ভাগ্য ছাড়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময় কাছে বন্ধু থাকলে সেটাও একটা সান্ত্বনা বৈকি!

জটাধর মাম্‌লেটে আবার এক কামড় বসিয়ে আক্রমণ করলে চায়ের পেয়ালাকে।

গোবিন্দ মনে মনে বললে, "হতভাগা হয়তো আমার মায়ের টাকা ভাঙিয়েই খাবারের দাম দেবে। তারপর ও যদি একখানা রিক্সা ভাড়া করে চম্পট দেয়, তাহ'লে ঘণ্টু তার হর্ন বাজিয়েও আমার আর কোন উপকারই করতে পারবে না!"

কিন্তু জটাধর তখনো ওঠবার নাম পর্যন্ত করলে না। মাম্‌লেট আর টোস্ট্ খেতে তার ভারি ভালো লাগছে বোধ হয়! সে একটুও সন্দেহ করতে পারেনি যে, ট্রেনের সেই পাড়াগেঁয়ে ছোক্‌রা তার পিছনে পিছনে এতদূর এসে হাজির হয়েছে এবং তার চারিধারে এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, যার ভিতরে পড়লে চুনো পুঁটি নয়, বড় বড় রুই-কাৎলারও ছাড়ান্ পাবার কোন উপায়ই থাকবে না!

মিনিট-কয় পরেই শোনা গেল ঘণ্টুর মোটর হর্ন বাজছে—ভোঁপ্ ভোঁপ্ ভোঁপ্!

তাড়াতাড়ি ফিরে দেখে, গলি দিয়ে আসছে প্রায় দুই ডজন ছোক্‌রার পল্টন! দলের সব-আগে রয়েছে ঘণ্টু—মুখে মোটর হর্ন গর্বিত তার ভঙ্গি!

ঘণ্টু হঠাৎ হর্ন নামিয়ে একখানা হাত মাথার উপরে তুলে বললে, "সৈন্যগণ, দাঁড়িয়ে পড়!"

সৈন্যদের 'মার্চ', বন্ধ হ'ল তৎক্ষণাৎ।

গোবিন্দ দুই হাতে ঘণ্টুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "ভাই, আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে!"

ঘণ্টু বললে, "বন্ধুগণ, কালিপুরের গোবিন্দবাবুকে দেখ! এর

বিপদের কথা তোমাদের কাছে এর আগেই খুলে বলেছি। যে দুরাত্মা এর সর্বনাশ করেছে, ঐ দেখ সে আরামে ব'সে চায়ে চুমুক্ মারছে! ওকে যদি আমরা পালাতে দি, তাহ'লে আমাদের অপমানের আর সীমা থাকবে না!"

চশমা-পরা একটি ছেলে বললে, "ইনি নাকি, ওকে আর আমরা পালাতে দিলে তো?"

ঘণ্টু বললে, "গোবিন্দ, একে আমরা প্রফেসর ব'লে ডাকি।"

প্রফেসরের সঙ্গে গোবিন্দ 'শেক-হ্যাণ্ড' করলে। তারপর ঘণ্টু একে একে আর-সব ছেলের সঙ্গে গোবিন্দকে পরিচিত ক'রে দিলে।

প্রফেসর গম্ভীর মুখে বললে, "এইবার কাজের কথা হোক···বন্ধুগণ, তোমাদের কাছে যা আছে, আমাকে দাও।"

গোবিন্দ তার রুমাল বিছিয়ে ধরলে! প্রত্যেক বালক কিছু-না-কিছু চাঁদা দিলে। কেউ এক আনা, কেউ দু'আনা, কেউ দশ পয়সা,

কেউ পাঁচ আনা, কেউ আট আনা, একজন একটা টাকাও দিলে।

ঘণ্টু বললে, "মঙ্গলবার, আমাদের মূলধন কত হ'ল দেখো তো।

যার নাম মঙ্গল, বয়স তার সাত-আট বছরের ভিতরেই। দলের সবাই তাকে মঙ্গলবার ব'লে ডাকে। টাকা-পয়সা গোণবার ভার পেয়ে আনন্দে সে নাচতে লাগল চড়াই-পাখির মত!

গণনা শেষ ক'রে মঙ্গল বললে, "পাঁচ টাকা দশ আনা ছ পয়সা। আমার মত হচ্ছে, আমাদের মূলধন তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। কারণ যদি আমাদের আলাদা আলাদা কাজ করতে হয়, তাহ'লে একজনের কাছে টাকা থাকলে চলবে না।"

প্রফেসর বললে, "সাধু প্রস্তাব! মঙ্গলবারের পুঁচ্‌কে মাথাতে একটুও বাজে মাল নেই, সবটাই বুদ্ধিতে ভরা!"

গোবিন্দের হাতে দেওয়া হ'ল তুই টাকা, প্রফেসর ও ঘণ্টু পেলো যথাক্রমে তুই টাকা ও এক টাকা সাড়ে দশ আনা।

গোবিন্দ বললে, "থ্যাঙ্ক্‌ ইউ ভেরি মাচ! চোর ধরা পড়লেই তোমাদের টাকা ফিরিয়ে দেব। এখন আমরা কি করব? হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। আমার এই ব্যাগটা আর ফুলগুলো কোথায় রাখি বল তো? যদি আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়—"

ঘণ্টু বললে, "ব্যাগ আর ফুল আমাকে দাও। দি গ্রেট নর্দার্ন রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, ও-ছুটো ঐখানেই জিম্মা রেখে দেব আর সেই সঙ্গে জটা-বেটাকে আরো ভালো ক'রে দেখে আসব।"

প্রফেসর বললে, "কিন্তু খুব সাবধান! জটা-বেটা একবার যদি সন্দেহ করে তার পিছনে লেগেছে ডিটেক্‌টিভরা, তাহ'লে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে।"

ঘণ্টু যেতে যেতে বিরক্ত স্বরে বললে, "তুমি কি আমাকে এতটা হাঁদা-গঙ্গারাম ভেবেছ হে?"......

খানিক পরেই সে ফিরে এসে বললে, "জটা-বেটার মুখ ফোটোয়

তুলে রাখবার মত। গোবিন্দ, তোমার মালের জন্যে কিচ্ছু ভেবো না।"

গোবিন্দ বললে, "এইবারে আমাদের পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু এ-জায়গায় দাঁড়িয়ে গোপন কথা কওয়া তো চলবে না।"

প্রফেসর বললে, "বেশ তো, চল্ না আমরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাই। আমাদের দু'জন এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিক। পাঁচ-ছ'জন থাক পথের মাঝে মাঝে। কিছু ঘটলেই তারা একদৌড়ে আমাদের খবর দিয়ে আসবে।"

ঘণ্টু বললে, "তোমরা যাও, বাকি সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। তোমার কোন ভাব্না নেই গোবিন্দ, আমি নিজে এখানে হাজির থাকব।"

নবম পরিচ্ছেদ

ডিটেক্টিভদের পরামর্শ-সভা

পার্কের এক কোণে ডিটেক্টিভদের সভার অধিবেশন।

সকলে গোল হয়ে ঘাস-জমির উপরে গিয়ে ব'সে পড়ল—কেউ উবু হয়ে, কেউ হাঁটু গেড়ে, কেউ দু পা ছড়িয়ে।

প্রফেসর দাঁড়িয়ে মাঝখানে। তার বাবা হচ্ছেন আদালতের জজ। গভীর কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে তার বাবা যেমন চোখ থেকে চশমাখানা খুলে নাড়াচাড়া করতে থাকেন, ঠিক সেই ভাবেই চশমাখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে প্রফেসর বললে, "খুব সম্ভব, আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাব না। কাজেই খবর লেনদেনের জন্যে আমাদের একটা টেলিফোন দরকার। কার কার বাড়িতে টেলিফোন আছে?"

সাত-আটজন বালক হাত তুললে।

—"উত্তম। এখন দেখতে হবে তোমাদের মধ্যে কার মা-বাপের

মেজাজ সবচেয়ে ঠাণ্ডা।"

মঙ্গল বললে, "আমার মা-বাবা ভারি ঠাণ্ডা। কখনো আমি বকুনি খাইনি।"

—"উত্তম, মঙ্গলবার! তোমাদের টেলিফোনের নম্বর কি?"

মঙ্গল নম্বর বললে।

—"বুদ্ধু, কাগজ-পেন্সিল বার কর। এক এক টুকরো কাগজে মঙ্গলবারের টেলিফোন নম্বর লিখে সকলের হাতে বিলি ক'রে দাও। যার কোন খবর দেবার বা জানবার দরকার হবে, মঙ্গলবারের কাছে গেলেই চলবে।"

মঙ্গল বললে, "কিন্তু আমি তো থাকব বাইরে।"

প্রফেসর দৃঢ়স্বরে বললে, "না। সভাভঙ্গ হ'লেই তোমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।"

মঙ্গল প্রতিবাদ ক'রে বললে, "বা রে! তোমরা চোর ধরবে আর আমি দেখতে পাব না, তাও কি হয় দাদা? বয়সে ছোট হলেও আমি তোমাদের অনেক কাজেই তো লাগতে পারি!"

—"তুমি বাড়িতে টেলিফোনের কাছে থাকবে। এটা হচ্ছে মস্ত-বড় কাজ!"

একটু নিরাশ স্বরে মঙ্গল বললে, "বেশ।"

বুদ্ধু নম্বরের কাগজ বিলি ক'রে দিলে। অনেকে যত্ন ক'রে পকেটে রাখলে, অনেকে আবার তখনি তখনি নম্বরটা মুখস্থ ক'রে ফেললে।

গোবিন্দ বললে, "জনকয় বাড়তি লোক আমাদের হাতের কাছে রাখা উচিত।"

প্রফেসর বললে, "নিশ্চয়। আপাততঃ যাদের দরকার হবে না তারা এই পার্কেই অপেক্ষা করুক। আগে সকলকেই বাড়িতে খবর দিতে হবে যে, আমরা আজ একটু বেশি-রাতেই বাড়ি ফিরব। যাদের মা-বাবা অবুঝ, তারা যেন বলে যে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। আচ্ছা, তাহ'লে আমাদের ডিটেক্‌টিভ বিভাগ, বাড়তি বিভাগ টেলিফোন আপিস—

এ-সবের ব্যবস্থা একরকম হ'ল।"

গোবিন্দ বললে, "আমাদের কাজ কখন শেষ হবে, বলা যায় না! এর মধ্যে কিছু খাবারের দরকার হবে না কি?"

—"হবে বৈকি! খাঁদু, গাবু, নন্দ, মধু, কালু! তোমাদের বাড়ি খুব কাছেই! চট্ ক'রে কিছু খাবার যোগাড় করতে পার কি না দেখ না।"

পাঁচটা ছেলে উঠে দৌড় মারলে।

মান্‌কে বললে "প্রফেসর, তোমার বুদ্ধি বড় কম! টেলিফোন, খাবার আর যত বাজে ব্যাপার নিয়ে তো এতটা সময় কাটালে; কিন্তু আমরা চোর ধরব কেমন ক'রে, তা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামালে না দেখছি! যত-সব ইস্কুল-মাস্টার, খালি বক-বক ক'রে বকতেই জানে।"

ঝণ্টু সিনেমায় অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনীর ছবি দেখে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। সে বললে, "আমাদের কাছে চোরের আঙুলের ছাপ নেবার কোন মেসিন নেই, আমরা কি করে প্রমাণ করব যে, সেই-ই হচ্ছে চোর?"

মান্‌কে বললে, "আঙুলের ছাপের নিকুচি করেছে! আমরা সুবিধা পেলেই জটা-বেটাকে ধ'রে টাকাগুলো কেড়ে নেব!"

প্রফেসর বললে, "গাঁজাখুরি কথা শোনো একবার! কেউ যদি আমার টাকা চুরি করে, আর তার কাছ থেকে সেই টাকাই আমি আবার চুরি করি, তাহ'লে আমিই হব চোর!"

—"হ্যাঁ!"

—"বাজে বোকো না।"

গোবিন্দ মধ্যস্থ হয়ে বললে, "প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। টাকা আমার হোক্ আর না হোক্, কারুর কাছ থেকে লুকিয়ে নিলেই চুরি করা হয়।"

প্রফেসর বললে, "এখন বুঝলে তো? সুতরাং মুরুব্বির মতন লেকচার দিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না। জানি না চোরকে ধরবার জন্যে আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। চোরকে আমরা বাধ্য করব চুরির টাকা ফিরিয়ে দিতে। আমরা চুরি-টুরি

করতে পারব না।”

ক্ষুদে মঙ্গলবার বললে, “এ-সব কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। যে টাকা আমার, চোরের পকেটে গেলেও সে টাকা আমারই থাকবে। তবে আমার টাকা লুকিয়ে ফিরিয়ে নিলে চুরি করা হবে কেন?”

প্রফেসর বললে, “এ-সব ব্যাপার সহজে বোঝানো যায় না। হয়তো আসলে তুমি অন্যায় করছ না, কিন্তু আইনে তুমি হবে অপরাধী।”

মান্‌কে বললে, “হেঁয়ালি-টেয়ালি নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না।”

ঝণ্টু বললে, “ডিটেক্‌টিভ হতে গেলে রিভলভার চাই।”

মঙ্গল বললে, “খেলা করবার জন্যে বাবা আমাকে একটা রিভলভার কিনে দিয়েছেন। সেটা আনব না কি?”

আর একজন বললে, “ধেৎ, সে রিভলভারে একটা মশা পর্যন্ত মারা যায় না। আমাদের চাই সত্যিকার রিভলভার।”

প্রফেসর বললে, “না।”

মান্‌কে বললে, “আমি বাজি রেখে বলতে পারি, চোরের কাছে, রিভলভার আছে।”

গোবিন্দ বললে, “চোর ধরতে গেলে বিপদ তো হ’তেই পারে। যার ভয় হচ্ছে, সে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকুক্।”

মান্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে বললে, “তুমি কি আমাকে কাপুরুষ বলতে চাও?”

প্রফেসর দুই হাত তুলে বললে, “শান্ত হও—শান্ত হও! আজ নয়, কাল লড়াই কোরো! এ-সব কী ব্যাপার! ছিঃ, ছিঃ, আমরা কি শিশু?”

ক্ষুদে মঙ্গল বললে, “নিশ্চয়! আমরা শিশু নই তো বুড়ো-মানুষ না কি?”

সবাই হেসে উঠল।

গোবিন্দ বললে, “দেখ, আমার মাসীর বাড়িতেও একটা খবর দেওয়া দরকার, সেখানে আমার জন্যে সবাই বড় ভাবছে। আমার মাসীর

বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে দশ নম্বর হরেন ঘোষ লেন। কেউ কি সেখানে আমার একখানা চিঠি দিয়ে আসতে পারবে?"

ছট্টু ব'লে একটি ছেলে বললে, "হ্যাঁ, আমি দিয়ে আসব।"

কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে গোবিন্দ লিখলে,

"শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তোমরা সবাই বোধহয় ভাবছ, আমি এখন কোথায়? আমি কলকাতায়। তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে যেতে পারছি না, কারণ আগে আমাকে একটা ভারি-দরকারি কাজ সারতে হবে। কাজ ফুরুলে আমি আর একটুও দেরি করব না—এক দৌড়ে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার কাজটা কি জানতে চেও না। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, আমি কোথায় আছি সে তা জানে। কিন্তু সেও আমার সন্ধান হয়তো দেবে না, কারণ এটা হচ্ছে ভয়ানক গুপ্তকথা। মেসোমশাইকে, মাসীমাকে আমার প্রণাম আর নমিতাকে আমার ভালোবাসা জানিও।

সেবক—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়

পুঃ—মা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। মাসীমাকে বোলো, মা তাঁর জন্যে ফুল পাঠিয়েছেন, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।"

গোবিন্দ চিঠিখানা ছট্টুর হাতে দিয়ে বললে, "কিন্তু সাবধান, টাকা-চুরির কথা আর আমার ঠিকানা কারুকে জানিও না। তাহ'লে আমি ভারি বিপদে পড়ব।"

ছট্টু চ'লে গেল। তারপরই পাঁচটি ছেলে ফিরে এল খাবারের পাঁচটা কৌটো হাতে ক'রে। কেউ এনেছে লুচি, কেউ আলুর দম, কেউ সিদ্ধ ডিম, কেউ কচুরি-ডালপুরি।

নন্দ বললে, "আমার মা এই বিস্কুটের টিনটা দিলেন।"

কতক খাবার তারা তখনি খেয়ে ফেললে, কতক তুলে রাখলে রাত্রের জন্য। খেয়ে-দেয়ে সবচেয়ে খুশি হ'ল গোবিন্দই, কারণ দলের মধ্যে তার

চেয়ে ক্ষুধার্ত ছিল না আর কেউ।

পাঁচটি ছেলে আবার বাড়িতে ফিরে গেল—ছুটি চাইবার জন্যে। তাদের মধ্যে দুজন আর এল না—তাদের মা-বাবা ছুটি দেননি। মঙ্গলও বাড়িতে ফিরে গেল।

প্রফেসর বললে, "মান্‌কে, আমার বাড়িতে একটা ফোন্ ক'রে দিস যে, আমার ফিরতে রাত হবে। বাবা তাহ'লে আমি বাইরে আছি ব'লে আর কিছু বলবেন না।"

গোবিন্দ বললে, "কলকাতার বাপ-মায়েরা তো খুব ভালো দেখছি!"

আজ সকালেই বাপের হাতের কান-মলা খেয়ে মান্‌কের কান তখনো টাটিয়ে ছিল। সে গজ্ গজ্ ক'রে বললে, "সব বাপ-মাই যদি এত সহজে বুঝতেন, তাহ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি!"

প্রফেসর বললে, "মান্‌কে, বাপ-মাকে ভুল বুঝিস্‌নে। বাবার কাছে আমি অঙ্গীকার করেছি, তাঁর চোখের সামনে যে-কাজ করতে পারব না, তা আমি কখনো করবও না। বাবা জানেন, আমি মিথ্যা বলি না, তাই আমাকে বিশ্বাস করেন। যাক্ এ-সব কথা। এখন যাবার আগে শুনে রাখোঃ প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করবে, নইলে গোয়েন্দা-গিরি করতে পারবে না। আজ রাতের মত খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে। পাঁচজন ডিটেক্‌টিভ সর্বদাই এখানে হাজির থাকবে। কারুর কিছু জানবার দরকার হ'লেই টেলিফোন আপিসে গিয়ে খবর নেবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আজ আমাদের দলের সঙ্কেত-বাক্য হবে—'গোবিন্দ'। যে এই সঙ্কেত-বাক্য বলতে পারবে না, নিশ্চয় জেনো, সে আমাদের দলের লোক নয়। মনে থাকবে তো? আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!"

—"আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!"—প্রত্যেক ছেলে একস্বরে এই কথা ব'লে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, সারা পাড়ায় ছুটে গেল তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি!

গোবিন্দ ভাবলে, টাকা চুরি না গেলে তো আমি আজ এমন সব বন্ধুর দেখা পেতুম না! কি মিষ্টি এই ছেলেগুলি!

দশম পরিচ্ছেদ

কুমারী নমিতা সেনের সাইকেল

আচম্বিতে দেখা গেল, গুপ্তচর তিনজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে এবং তাদের নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে মাথার উপরে হাতগুলো নাড়ছে ঠিক পাগলের মতই।

প্রফেসর বললে, "এইরে, জটা-বেটা বোধ হয় ঘণ্টার চোখে ধুলো দিয়েছে!"

প্রফেসর, গোবিন্দ ও মানকে এমন বেগে দৌড় মারলে, যে, তাদের দেখলে মনে হয়, দৌড়-প্রতিযোগিতায় তারা পৃথিবীর 'রেকর্ড' ভাঙবার চেষ্টা করছে!

কিন্তু খানিক দূর এগিয়েই তারা দেখলে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘণ্টু তাদের আস্তে আসবার জন্যে ইসারা করছে। তখন তারা গতি কমিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রফেসর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ব্যাপার কি? জটা-বেটা স'রে পড়েছে না কি?"

ঘণ্টু বললে, "তাহ'লে আমি কি এখানে ব'সে ঘাস কাটছি? ঐ দেখ?"

রেস্তোরাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে জটাধর তখন এমন পরিতৃপ্ত ভাবে প্রশান্ত মুখে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে, যেন তার চোখের সামনে রয়েছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যাবলী। সেখান দিয়ে একটা বাংলা খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছিল, সে একখানা কাগজ কিনলে।

মানকে বললে, "নচ্ছারের আবার কাগজ পড়ার সখ আছে!"

বুদ্ধু বললে, "ও যদি এ ফুটপাতে এসে আমাদের আক্রমণ করে

তাহ'লেই মুস্কিল।"

সকলে মুখ লুকোবার জন্যে চোরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল এবং ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল তাদের বুকগুলো।

কিন্তু চোর তাদের দিকে ফিরেও তাকালে না, একমনে নিযুক্ত হয়ে রইল খবরের কাগজ নিয়ে।

মানিকে বললে, "আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজের আশপাশ দিয়ে ও উঁকি মেরে দেখছে, আমরা ওকে লক্ষ্য করছি কিনা!"

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, "ঘণ্টু, তোমরা যে এখানে পাহারা দিচ্ছ এটা ও ধ'রে ফেলে নি তো?"

—"উঁহু। ও আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। এমন গোগ্রাসে কেবল খাবার গিলেছে, যেন ও বহুকালের উপবাসী!"

গোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ!"

একখানা খালি ট্যাক্সি-গাড়ি যাচ্ছিল, চোর হঠাৎ তাকে ডাক্‌লে। ট্যাক্সি থামল। চোর এক লাফে উপরে উঠল। গাড়ি বোঁ ক'রে চলে গেল।

কিন্তু সে গাড়ির ভিতরে চোর ওঠবার আগেই সদা-সতর্ক ঘণ্টু রাস্তার মোড়ের দিকে দৌড় দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও। মোড়ের মাথায় তিনখানা ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘণ্টু লাফ মেরে তার উপরে উঠে ড্রাইভারকে ডেকে বললে, "ঐ যে সামনের ট্যাক্সি দেখছ, ওর পেছনে পেছনে চল। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন জানতে না পারে, আমরা ওদের পেছনে যাচ্ছি!

খানিক এগিয়েই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপারখানা কি?"

ঘণ্টু বললে, "ব্যাপার গুরুতর। ও যদি নরকেও যায়, আমরা ওর সঙ্গ ছাড়ব না।"

ড্রাইভার বললে, "ভাড়া পেলে আমি নরকেও যেতে রাজী আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমাদের কাছে ভাড়া আছে কি?"

প্রফেসর রাগ ক'রে বললে, "তুমি আমাদের কি মনে কর?"

ড্রাইভার বললে, "বললুম একটা কথার কথা।"

গোবিন্দ বললে, "আগের ট্যাক্সিখানার নম্বর হচ্ছে ৪৪৪।"

প্রফেসর নম্বরটা টুকে নিয়ে বললে, "হ্যাঁ, এটা খুব দরকারি।"

মানিকে বললে, "ড্রাইভার, তুমি ওদের অত কাছে যেও না।"

পরে পরে গাড়ি দুখানা ছুটছে। রাস্তার লোকেরা দ্বিতীয় গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে যায়—গাড়ি-ভর্তি রকম-বেরকম খোকা, সকলের মুখ উত্তেজিত।

হঠাৎ ঘণ্টু বললে, "নিচে শুয়ে পড়—নিচে শুয়ে পড়!"

সকলেই গাড়ির নিচের দিকে ঝাঁপ খেলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, "হ'ল কি?"

ঘণ্টু বললে, "এটা রাস্তার চৌমাথা, ট্রাফিক-পুলিশ হাত তুলেছে, সামনের গাড়ির সঙ্গে আমাদেরও এখানে থামতে হবে। চোর একবার ফিরে তাকালেই সর্বনাশ।"

দুখানা গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়ল মোড়ের মাথায়। এবং চোর সত্য সত্যই ফিরে তাকালে। কিন্তু তার পিছনের গাড়িতে কারুকেই দেখতে পেলে না। সেখানা ঠিক যেন খালি গাড়ি! দেখলে কে বলবে যে, তার মধ্যে একগাড়ি ছেলে আছে!

দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভারও পিছন ফিরে দেখে বুঝলে, ব্যাপারখানা কি! সে হো-হা ক'রে হেসে উঠল।

পথ খোলা পেয়ে আবার সব গাড়ি ছুটতে শুরু করলে। ছেলেরা আবার যথাস্থানে।

প্রফেসর 'মিটারে'র দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "ভাড়া উঠল আট আনা। ও বাবা, আরো কত দূরে যেতে হবে?"

কিন্তু আর বেশিদূর যেতে হ'ল না। চোরের ট্যাক্সিখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আপার সার্কুলার রোডের 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র সামনে।

ছেলেদের গাড়িখানাও দাঁড়িয়ে পড়ল খানিক তফাতে।

জটাধর গাড়ি থেকে নামল। তারপর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভোজনালয়ের

ভিতরে ঢুকে পড়ল।

প্রফেসর বললে, "ঘণ্টু, তুমিও হোটেলের ভেতরে যাও। ও বাড়ি-খানার খিড়কীর দরজা থাকে তো নজর রেখ। সামনের দিকে আমরা আছি।"

তাদের ভাড়া উঠল বারো আনা।

ওদিকে ফুটপাতের পরেই রয়েছে একটা ছোট বাজার।

প্রফেসর বললে, "আমাদের বরাত ভালো। এই বাজারের ভেতর আশ্রয় নিলে কেউ আমাদের বাধা দেবে না। এখানে লুকিয়ে আমরা অনায়াসেই হোটেলের ওপরে পাহারা দিতে পারব। বুদ্ধু, তুমি ঘণ্টুর খোঁজে যাও।"

সকলে বাজারের দিকে গেল।

মানকে বললে, "বাঃ, এখানে একটা 'পাবলিক টেলিফোনও আছে যে!"

গোবিন্দ বললে, ঘণ্টুর মাথা বেশ সাফ হ'লেই মঙ্গল।"

ঝণ্টু বললে, "ঘণ্টুকে তুমি চেনো না গোবিন্দ! দেখতে তাকে গাধার মত বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে সে চতুর শৃগাল!"

প্রফেসর বুকের উপরে দুই হাত রেখে বললে, "এখন ঘণ্টু ফিরলে বাঁচি যে!" তাকে তখন দেখাচ্ছিল পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে লর্ড ক্লাইভের মত।

ঘণ্টু একমুখ হাসি নিয়ে ফিরে এল। বললে, "মা ভৈঃ! জটাবেটাকে এইবারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! সে হোটেলের একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ও-বাড়ির খিড়কী-দরজা নেই। আমি তন্ন তন্ন ক'রে সব জায়গা খুঁজে এসেছি! ফুড়ুক্ ক'রে উড়ে পালাবার জন্যে জটার যদি ডানা না থাকে, তাহ'লে সে ফাঁদে পড়েছে।"

প্রফেসর বললে, "বুদ্ধু পাহারায় আছে তো?"

ঘণ্টু বললে, "তুমি আচ্ছা নিরেট তো! সে কথা আবার বলতে?"

প্রফেসর বললে, "মানকে, এইবার আমাদের টেলিফোন আপিসে

খবর দিতে হবে। পাব্‌লিক ফোন থেকে কথা কইলেই চলবে। ফোনের দাম এই দু-আনা নিয়ে যা।"

মান্‌কে তখনি 'ফোনে' নম্বর ব'লে ডাকলে, "হ্যালো, মঙ্গলবার।"

সাড়া এল—"হাজির।" —সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'। জটা-বেটা আপার সার্কুলার রোডের 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র ঘর ভাড়া করেছে। আমাদের 'হেড-কোয়ার্টার' হয়েছে ভোজনালয়ের সামনের বাজারে।

ক্ষুদে মঙ্গলবার সমস্ত খবর একখানা কাগজে লিখে রাখলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের কি আরো লোকের দরকার?"

—"না।"

—"জটা-বেটা হোটেলে কত নম্বরের ঘর ভাড়া নিয়েছে?"

—"সে খবর পরে দেব।"

—"তোমরা কি ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে গেলে?"

মান্‌কে সংক্ষেপে বর্ণনা করলে।

—"চোর এখন কি করছে?"

—"হয় খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখছে সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, নয় একলা ব'সে তাস খেলছে।"

—"আহা, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতুম! এবারে ইস্কুলের রচনা-প্রতিযোগিতায় আমি এই ঘটনাটাই বর্ণনা করব।"

—"এর মধ্যে আর কেউ তোমাকে ডেকেছে?"

—"না, ভারি একঘেয়ে লাগছে। একলা ব'সে খালি কড়িকাঠ গুণছি। ও হো হো, আমি যে সঙ্কেত-বাক্যটা বলতে ভুলে গিয়েছি—'গোবিন্দ'!"

—"সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'। আচ্ছা, আসি।"

মান্‌কে আবার 'হেড-কোয়ার্টারে' ফিরে এসে 'রিপোর্ট' দিলে।

প্রফেসর বললে, "উত্তম!"

ঘণ্টু বললে, সন্ধ্যে হ'ল। জটা-বেটাকে আজ বোধহয় ধরা যাবে না।"

গোবিন্দ বললে, "সে এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লেই বাঁচি। নইলে সে যদি আমার মায়ের টাকায় আবার ট্যাক্সি নিয়ে নবাবী করতে বেরোয়, কি থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখতে যায়, তাহ'লে আমাদের মূলধনে আর কুলোবে না।"

ইতিমধ্যে প্রফেসর একবার বাইরে টহল মেরে এসে বললে, "কি উপায়ে আরো কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা যায়, তোমরা একবার গভীর চিন্তা ক'রে দেখ দেখি।"

তারা একটা রোয়াকে ব'সে খানিকক্ষণ নীরবে গভীর চিন্তায় নিযুক্ত হয়ে রইল।

আচম্বিতে শোনা গেল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

প্রফেসর চম্‌কে বল্‌লে, "ও কি ও?"

মান্‌কে বললে, "একখানা চক্‌চকে নতুন সাইকেলে চ'ড়ে একটি টুকটুকে মেয়ে বাজারের উঠোনে ঢুকছে!"

ঝণ্টু আশ্চর্য স্বরে বললে, "আরে—সাইকেলে আমাদের ছট্টুও ব'সে আছে যে!"

ছট্টু মাথার উপরে হাত নাড়তে নাড়তে বললে, "হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে!"

"গোবিন্দ আনন্দে নৃত্য ক'রে বললে, "সাইকেলে মেয়ে? নিশ্চয় নমিতা!"

টুক ক'রে সাইকেল থেকে নেমে প'ড়ে নমিতা বললে, "হ্যাঁ, আমি কুমারী নমিতা সেন। আর তুমি নিশ্চয় পলাতক গোবিন্দদা?"

গোবিন্দ দৌড়ে গিয়ে নমিতার হাত ধ'রে ফিরে বললে, "বন্ধুগণ, আমার মাসতুতো বোন কুমারী নমিতা সেন।" নমস্কারের আদানপ্রদান হ'ল।

প্রফেসর নাক থেকে চশমা নামিয়ে নাড়তে নাড়তে গম্ভীর স্বরে বললে, "কুমারী নমিতা সেনের পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য হলুম। কিন্তু ছট্টু, আমি বলতে বাধ্য যে, তুমি অতি অন্যায় করেছ!"

—"আমি আবার কি অন্যায় করলুম?"

—"মূর্খ! কি অন্যায় করেছ তাও বুঝতে পারছ না? তোমাকে কি আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশ করতে মানা করা হয়নি?"

—"কে বলে আমি গুপ্তকথা প্রকাশ করেছি? আমি তো কেবল নমিতা সেনকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, "নিয়েও তুমি আসোনি বাপু, আমি জোর ক'রে নিজের সাইকেলে তোমাকেই তুলে নিয়ে এখানে এসেছি। খালি তাই নয়, আমি বাড়ির লোককে লুকিয়ে এখানে এসেছি। আবার এখুনি আমাকে পালাতে হবে।"

প্রফেসর বললে, কুমারী নমিতা সেন, এ-ব্যাপারের মধ্যে নারীর থাকা উচিত নয়।"

কিন্তু নমিতা তাকে আর আমলে না এনে গোবিন্দের দিকে ফিরে বললে, "হ্যাঁ গোবিন্দা, আমরা মরছি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে, আর তুমি এখানে দিব্যি অ্যাড্‌ভেঞ্চার নিয়ে মেতে আছ! ভাগ্যে ছট্টু গেল, নইলে আবার আমাদের হাওড়া স্টেশনে ছুটতে হ'ত। কিন্তু ছট্টু ছেলেটি বেশ, তোমার বন্ধু-ভাগ্য ভালো গোবিন্দা!"

ছট্টু অতিশয় বিনয়ে মাথা নত করলে।

নমিতা বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি গোবিন্দা? ভয় নেই, আমি কারুকে কিছু বলব না।"

গোবিন্দ অল্প কথায় সব বললে।

নমিতা বললে, "ওহো, এ যে সত্যিকার সিনেমা! বেটা-ছেলেদের যতটা বোকা ভাবি, তাহ'লে তারা ততটা বোকা নয়! হ্যাঁ গোবিন্দা, তোমার বন্ধুগুলিও বেশ! আমার সব-চেয়ে ভালো লাগছে ঐ প্রফেসর-টিকে। চমৎকার চশমা! খাসা গম্ভীর মুখ! তুমিই বুঝি গোয়েন্দা-সর্দার?"

এইবারে প্রফেসরের গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ ক'রে বেরিয়ে পড়ল খিল্ খিল্ ক'রে কৌতুক-হাসি। তারপর অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে প্রফেসর আবার গাম্ভীর্যের কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বললে, "কুমারী নমিতা সেন, আমি তোমার কাছে হার মানলুম। তুমি ধন্যি মেয়ে!"

নমিতা বললে, "গোবিন্দা, আমার হাতে আর সময় নেই। দিদ্‌মা, বাবা, মা, নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাকে খুঁজতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। আমি ছট্টুকে সদর খুলে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেব ব'লে পালিয়ে এসেছি! আমাকে খুঁজে না পেলে এখনি পুলিশে খবর দেবে। একদিনে ছেলে আর মেয়ে দুইই হারানো তারা সইতে পারবে না।"

গোবিন্দ বললে, "বাড়ির সবাই আমার ওপরে খুব চ'টে গিয়েছেন তো?"

—"ধেৎ, চটবে কেন? তোমার চিঠি পেয়েই দিদ্‌মা আহ্লাদে পাগলের মত হয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন—'আমার নাতি কলকাতায় এসেই লাট-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে!' বাবা আর মা অনেক কষ্টে দিদ্‌মাকে ঠাণ্ডা ক'রে বসালেন। আচ্ছা গোবিন্দা, আমি পালাই। নমস্কার প্রফেসর! এতদিন পরে একজন জ্যান্তো ডিটেক্‌টিভ দেখবার সৌভাগ্য হ'ল, ধন্য আমি!" সে দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, "গোবিন্দা, এই একটা টাকা রেখে দাও, তোমাদের দরকার হ'তে পারে। একখানা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস কিনব ব'লে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে এই টাকাটা আমি জমিয়েছিলুম। কিন্তু আজ তুমি যে আসল অ্যাড্‌ভেঞ্চার দেখালে, তারপর আর কেতাবের বানানো গল্প না পড়লেও চলবে। আমি আবার কাল সকালে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করব। রাতে কোথায় শোবে গোবিন্দা? আমি এখানে থাকলে তোমাদের জন্য চা তৈরি ক'রে দিতে পারতুম, কিন্তু উপায় কি—লক্ষ্মী-মেয়েদের বাড়িতেই থাকা উচিত, না প্রফেসর? আচ্ছা, সবাইকে নমস্কার!" দু'চারবার আদর ক'রে গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে নমিতা ছোট্ট একটি লাফ মেরে সাইকেলের উপরে উঠল এবং হাসিমুখে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানুকে বললে, "বাবা, মেয়ে যেন কথার ফুলঝুরি! আমাদের কারুকে আর মুখ খুলতে দিলে না!"

ঘণ্টু বললে, "একেবারে পাকা গিন্নী!"

প্রফেসর অভিভূতের মত বললে, "ধন্য, ধন্য, ধন্য!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

কালিপুরের পাখির গান

মিনিটের পর মিনিট এগিয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ একবার সন্তর্পণে বাজারের ভিতর থেকে বেরুলো। তারপর 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলে, বুদ্ধু ও আরো দুটি ছেলে রীতিমত পাহারায় মোতায়েন আছে।

তারপর ফিরে এসে বললে, "দেখ, আমাদের আরো কিছু করা দরকার। হোটেলের ভেতরও একজন গুপ্তচর না রাখলে চলবে না। বুদ্ধু ঠিক হোটেলের সদর-দরজার সামনেই আছে বটে, কিন্তু সে একবার যদি অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফেরায়, তাহ'লে জটাধরের টিকি কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ঘণ্টু বললে, "তুমি তো ফস্ ক'রে খুব সহজেই কথাটা ব'লে ফেললে, কিন্তু হোটেলের ভেতর আমাদের কারুকে থাকতে দেবে কেন? আর ভেতরে থাকলে বিপদেরও ভয় তো আছে। জটাবেটা যদি আমাদের কারুকে চিনে ফেলে?"

—"না, না, হোটেলের ভেতরে আমাদের কেউ থাকবে কেন?"

প্রফেসর বললে, "তবে তুমি কি বলতে চাও?"

গোবিন্দ বললে, "আমি অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করেছি, হোটেলে একটা ছোক্‌রা-চাকর আছে আর সে বার বার ওঠা-নামা করছে। সেও তো আমাদেরই বয়সী, তাকে কি আমাদের দলে টেনে নেওয়া যায় না?"

—"সৎ পরামর্শ।" প্রফেসর বললে, "হ্যাঁ, গুড্ আইডিয়া।" প্রফেসর ঠিক ইস্কুলের শিক্ষকের মতই মুরুব্বিয়ানা ক'রে কথা কয়, সেই জন্যেই সবাই তার নাম রেখেছে প্রফেসর। "সত্যি, গোবিন্দ ভারি

বুদ্ধিমান্। এ-রকম আর একটা ভালো পরামর্শ দিলেই গোবিন্দকে আমরা একটা উপাধি দিতে বাধ্য হব। কে বলে গোবিন্দ পাড়াগেঁয়ে ছেলে!"

ঘণ্টু বললে, "কলকাতায় থাকলে গোবিন্দের বুদ্ধি আরো খুলত!"

পল্লীগ্রামের ছেলে গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, "পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা বুদ্ধির জন্ম কলকাতার বাইরেই। সাড়ে পনেরো আনা কেন, প্রায় ষোলো আনাই। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, তোমার সঙ্গে এখনো আমার ঘুষির লড়াই বাকি আছে।"

প্রফেসর বললে, "ঘুষির লড়াই!"

—"হ্যাঁ, বক্সিং। ঘণ্টু আমার নীলরঙের পোশাককে অপমান করেছে।"

প্রফেসর বললে, "উত্তম। কাল চোর ধরা পড়বার পর তোমাদের মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা করব।"

ঘণ্টু হাসতে হাসতে বললে, 'গোবিন্দ, এতক্ষণ ধ'রে দেখে দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে যে, আসলে তোমার নীলরঙের পোশাকটি দেখতে বিশেষ মন্দ নয়। অবিশ্যি তোমার সঙ্গে ঘুষি লড়তে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কেবল এইটুকু মনে রেখো ভায়া, কলকাতার এ-অঞ্চলে ঘুষির লড়াইয়ে কেউ আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।"

গোবিন্দ বললে, "কালিপুরের ইস্কুলেও আমার ঘুষি খেয়ে কোন ছেলেই দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না!"

প্রফেসর বললে, "ঘণ্টু! গোবিন্দ! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বাক্য-নবাবী ক'রে সময় কাটিও না, প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান। আমি এখন হোটেলের দিকে যেতে চাই। কিন্তু তোমাদের দুজনকে এখানে রেখে যেতেও আমার ভয় হচ্ছে। কারণ আমি গেলেই তোমরা হয়তো মারামারি শুরু ক'রে দেবে।"

ঘণ্টু বললে, "বেশ, আমিই না হয় যাচ্ছি।"

প্রফেসর বললে, "উত্তম। সেই ছোক্‌রা-চাকরকে দলে টানবার

চেষ্টা কর। কিন্তু খুব সাবধান! জটা-বেটার ঘরের নম্বরটাও জেনে নিও। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে রিপোর্ট দেবে।"

ঘণ্টু অদৃশ্য।

বাজারের প্রবেশ-পথের রোয়াকের উপর ব'সে গোবিন্দ ও প্রফেসর নিজের নিজের ইস্কুলের মাস্টারদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

গোবিন্দ বললে, "আমি আঁক শিখেছি বেতের ভয়ে। আমাদের আঁকের মাস্টার কোন ভুল করলেই পিঠে তার বেতের ডোরা-দাগ কেটে দেন।"

প্রফেসর বললে, "আমিও বাধ্য হয়ে খুব ভালো আঁক কষ্‌তে শিখেছি। কারণ, আঁকে যে-ছেলের মাথা খোলে না তার মাথায় গাধার টুপির ঢাক্‌না বসিয়ে দেন আমাদের আঁকের মাস্টার।"

গোবিন্দ বললে, "বেতের চেয়ে গাধার টুপি ভালো।"

প্রফেসর বললে, "ভালো নয়, ভদ্র বলতে পারো। বেতে জখম হয় দেহের উপরটা। গাধার টুপি আহত করে দেহের ভিতরে মনকে। মফঃস্বলের মাস্টার বেশি-বর্বর, আর শহরের মাস্টার বেশি-নিষ্ঠুর। কারণ দেহের ঘা সারে দুদিনে, আর মনের ঘা সারতে লাগে অনেক দিন।"

গোবিন্দ বললে, "তুমি অমন জ্ঞানীর মতন কথা কইতে শিখলে কেমন ক'রে?"

—"বাবার কাছ থেকে। বাবা যা বলেন, আমি মন দিয়ে শুনি!"

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আমার বাবা স্বর্গে। তিনি বেঁচে থাকলে আমিও তোমার মত কথা কইতে পারতুম।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, "আমার খিদে পেয়েছে।"

প্রফেসর বললে, "আমারও।"

তারা দুজনে কৌটোর ভিতর থেকে দুখানা ক'রে লুচি ও একটা ক'রে আলুর দম বার ক'রে ক্ষুধার অত্যাচার দমন করলে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে রাস্তার আলোর থামগুলো জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের কোলাহল ও রেলগাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজপথের ট্রাম, লরি, মোটর, সাইকেল ও রিক্সা প্রভৃতির আওয়াজ এবং জনতার হট্টগোল। এ যেন একটা বন্য কন্সার্ট।

গোবিন্দ বললে, "দেখ প্রফেসর, শহরের এই গাড়ির, বাড়ির আর মানুষের ভিড়ে মাঝে মাঝে এক-একটা সবুজ গাছ দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? ওরা যেন ঠিক আমারই মত। মফস্বল থেকে এখানে এসে প'ড়ে ওরা যেন ভুল ক'রে পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে!"

প্রফেসর বললে, "কিন্তু ও-সব গাছেও পাখিরা ডাকে ঠিক তোমাদের পাড়াগাঁয়েরই মত।"

গোবিন্দ বললে, "স্বীকার করি। কিন্তু ও-সব গাছে তো খালি পাখির ডাকই শুনলুম,—গান তো গাইলে না কোন পাখি! পাখির গান বলতে আমি কাক-চিল-চড়াইয়ের চিৎকার বুঝি না, প্রফেসর!"

প্রফেসর এত সহজে কলকাতার দীনতা মানতে রাজি নয়। বললে, "গানের পাখিদের আমরা আদর ক'রে ভালো খাঁচায় আশ্রয় দি, আর তাদের গান শুনি সারাদিন।"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বললে, "না ভাই প্রফেসর! পাখির গান বলতে কি বোঝায় তা যদি শুনতে চাও, তাহ'লে আমাদের কালিপুরে যেও। সেখানে সকালে তুমি প্রথমেই জেগে উঠবে যেন পাখির গানের স্বপনপুরে। সে তোমার দু-চারটে খাঁচার পাখির কান্না-গান নয়, হাজার হাজার পাখির আনন্দ-গান—যেন অন্ধকারকে হারিয়ে দিয়েছে ব'লে আলোর উদ্দেশে বিজয় গান! ঘর থেকে বেরিয়ে এলে দেখবে, রোদ-হাসি-মাখা সবুজে-ছাওয়া নাচঘরে কোকিল গাইছে, দোয়েল-শ্যামা শিস দিচ্ছে, খঞ্জন নাচছে, বৌ-কথা-কও বউকে সাধাসাধি করছে আর তিতির ধরেছে যেন টিটকারির সুর! আরো কত-রকম পাখির কত গানের কথা। সেখানে দুপুরে ডাকে, গান গায় অন্য রকম নানা পাখি, আবার রাতে

চাঁদের আলোর আসর রাখতে আসে নতুন নতুন দলের পাখিরা। পাখির গানের কথা তুলো না প্রফেসর, তাহ'লে আমাদের কালিপুরের পাশে ব'সে তোমাদের কলকাতা কিছুতেই এক্‌জামিনে পাস করতে পারবে না।"

প্রফেসর বললে, "হার মানলুম গোবিন্দ! দেখছি তুমিও তো কম কথা জানো না! তুমি বুঝি কবিতা-টবিতা লিখতে পারো?"

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বললে, "কবিতা পড়েছি বটে, কিন্তু লিখিনি তো কখনো!"

—"এইবার থেকে লিখো। তুমি কবি হ'তে পারবে। কিন্তু আঁক না ক'ষে কবিতা লিখলে তোমার মা বোধহয় বকবেন?"

—"আমার মা? আমার মা কখনো আমাকে বকেন না। আমার যা-খুশি করতে পারি। কিন্তু আমি যা-খুশি করতে চাই না। বুঝলে?"

—"উঁহু, বুঝলুম না।"

—"বুঝলে না? তবে শোনো। তোমরা কি খুব ধনী?"

—"জানি না গোবিন্দ! আমার বাড়িতে টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

—"টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা যখন ঘামায় না তখন নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক টাকা আছে।"

প্রফেসর কিছুক্ষণ ভেবে বললে, "হ'তে পারে।"

—"কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমাকে টাকাকড়ির অনেক কথাই কইতে হয়। কারণ আমাদের টাকাকড়ি বড় কম। এত কম যে, মাকে টাকা রোজগারের জন্যে দিন-রাত খাটতে হয়। তবু মা আমাকে রোজ এত পয়সা দেন যে, বড়লোকের ছেলেরাও তার চেয়ে বেশি পায় না।"

—"কি করে তোমার মা দেন?"

—"তা জানি না। তবে দেন। কিন্তু তবু সব পয়সা খরচ না ক'রে মায়ের কাছে কিছু কিছু আমি ফিরিয়ে আনি।"

—"তোমার মা কি তাই চান?"

—"তিনি চান না, কিন্তু আমি চাই।"

—"ও, তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ। তেমনি, মা যদি আমাকে খেলবার জন্যে দু'ঘণ্টা ছুটি দেন, আমি এক ঘণ্টা খেলা ক'রেই ফিরে আসি। মা ঘরকন্নার কাজ নিয়ে একলাই ব্যস্ত হয়ে থাকবেন আর আমি খেলে খেলে বেড়াব, তা কি হয় ভাই? মা আমাকে খেলতে ছুটি দেন বটে, কিন্তু আমি জানি ছেলে তাঁর কাছে কাছে থাকলে তিনি ভারি খুশি হন। তাই আমি যা-খুশি করতে চাই না। এইবারে বুঝলে?"

রাত হয়েছে। তারা উঠেছে। শহরের গ্যাসের আলোর সঙ্গে মিলেছে অল্প-অল্প চাঁদের আলো। পথের গোলমাল ক'মে আসছে ধীরে ধীরে।

এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির ভিতরে প্রফেসর একটি নতুন রূপ দেখতে পেলে। তার হাতখানি স্নেহভরে নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "মাকে বুঝি তুমি খুব ভালোবাসো?"

গোবিন্দ বললে, "হ্যাঁ! খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টুর বখ্‌শিস্ লাভ

রাত যখন দশটা বাজে বাজে, একদল ছোকরা বাজারের ভিতরে এসে হাজির। সঙ্গে ক'রে এনেছে তারা এত মাখন আর পাঁউরুটি যে, তার দ্বারা মস্ত এক সৈন্যদলের খোরাকের কাজ চলতে পারে।

প্রফেসর বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমাদের থাকবার কথা পার্কে। দরকার হ'লে আমি 'ফোনে' তোমাদের ডাকতুম। তবু কেন তোমরা এখানে এসেছ—যখন কেউ তোমাদের ডাকেনি?"

ঝণ্টু বললে, "মুখ-নাড়া দিও না প্রফেসর! এখানে কি কাণ্ড চলছে জানতে না পেরে আমরা সবাই পেট ফুলে মারা যাবার মত হয়েছি।"

নন্দ বললে, "আমাদের দুর্ভাবনাও হয়েছিল! অনেকক্ষণ খবর না পেয়ে ভেবেছিলুম, হয়তো তোমরা কোন বিপদে পড়েছ।"

—"পার্কে এখন ক'জন আছে?"

খাঁদু বললে, "তিন কি চারজন।"

প্রফেসর বললে, "অন্যায় করেছ—তোমরা অন্যায় করেছ।"

ঝণ্টু খাপ্পা হয়ে চেঁচিয়ে বললে, "প্রফেসর, তোমার মোড়লগিরি আর সহ্য হয় না! তোমার হুকুম কেন আমরা শুনব?"

প্রফেসর মাটিতে লাথি মেরে বললে, "আমাদের তালিকা থেকে এখনি ঝণ্টুর নাম কেটে দেওয়া হোক্!"

গোবিন্দ বললে, "আমার উপকার করতে এসে তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে চাও? ঝণ্টুর নাম কেটে না দিয়ে এবারে তাকে খালি সাবধান ক'রে দেওয়া হোক্। সবাই যদি নিজের নিজের মত চলে, তাহ'লে মিলে-মিশে কোন কাজই করবার উপায় থাকে না যে।"

ঝণ্টু বললে, "চুলোয় যাক তোমাদের কাজ! আমি আর তোমাদের মধ্যে নেই!" ব'লেই হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল।

নন্দ বললে, "আমরা প্রথমে আসতে চাইনি প্রফেসর! ঝণ্টুই আমাদের নিয়ে এল।"

প্রফেসর ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "আর ঝণ্টুর নাম কোরো না। তাকে ভুলে যাও।"

খাঁদু বললে, "আমরা এখন কি করব?"

গোবিন্দ বললে, "ঘণ্টু ফিরে না আসা পর্যন্ত এইখানেই তোমরা থাকো।"

প্রফেসর বললে, "সেই কথাই ভালো।......গোবিন্দ, হোটেলের সেই ছোক্‌রা-চাকরটা এইদিকেই আসছে না?"

—"হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।"

নন্দ তারিফ ক'রে বললে, "ওর পরোণে কি চমৎকার উর্দি!"

উর্দি-পরা বাচ্চা-চাকরটা ভিতরে এসে দাঁড়াল। আধা-অন্ধকারে তার মুখখানা ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিল না।

প্রফেসর বললে, "ঘণ্টু কি তোমাকে পাঠিয়েছে?"

—"হ্যাঁ?"

—"সঙ্কেত-বাক্য?"

—"গোবিন্দ বল মন, গোবিন্দ!"

গোবিন্দ হেসে ফেলে বললে, "হুঁ, তুমি তো খুব রসিক দেখছি। এখন খবর কি বল।"

হঠাৎ বেজে উঠল এক মোটর-হর্ন—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্! সঙ্গে সঙ্গে সেই উর্দি-পরা ছোক্‌রা হো হো হাসি হাসতে হাসতে এমন এক তাণ্ডব-নাচ শুরু ক'রে দিলে, যেন ক্ষেপে গিয়েছে একেবারে!

তারপর সে হাসি-নাচ থামিয়ে বললে, "গোবিন্দ-ভায়া, তুমি ডাহা অন্ধ!"

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, "আরে, তুমি যে আমাদের ঘণ্টু!"

আর সব ছেলেও হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

প্রফেসর বললে, "অতুল। অপূর্ব। সাধু! কিন্তু হাসির ঘটা থামাও। ঘণ্টু ও এদিকে এই রোয়াকে এসে বসো। রিপোর্ট দাও।"

ঘণ্টু বললে, "এ একেবারে রীতিমত নাটক! শোনো: আমি হোটেলের ভেতরে গেলুম। সিঁড়ির ওপরে হোটেলের সেই ছোক্‌রা দাঁড়িয়েছিল। আমি চোখ মট্‌কে ইসারা করলুম। সে কাছে এল। বললুম সব কথা—A থেকে Z পর্যন্ত। বললুম গোবিন্দের কথা, চোরের কথা, আমাদের কথা। এও জানালুম, কাল সকালেই আমরা তাকে জব্দ করব। আজ রাতটা আমি খালি হোটেলের ভেতরে থেকে চোরের ওপরে পাহারা দিতে চাই।

সব শুনে ছোক্‌রার উৎসাহ, আগ্রহ আর আনন্দ দেখে কে? বললে, "আমার আর একটা উর্দি আছে। সেইটে প'রে তুমি পাহারা দাও।"

আমি বললুম, "হোটেলের যদি কেউ আপত্তি করে?"

সে বললে, "কর্তারা রাতে এদিকে আসে না। চোর যে ঘরে আছে তার পাশেই আমার ঘর। আমি তোমাকে সেইখানেই লুকিয়ে রাখব।"

বুঝেছ প্রফেসর, আজ থাকো তোমরা বাজারে প'ড়ে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে আছে হোটেল বাস!"

প্রফেসর বললে, "তুমি যদি হোটেলে থাক, তাহ'লে আমাদের রাত কাটাতে হবে কেন? আমরাও বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারি। চোর যে ঘরে আছে তার নম্বর কত?"

—"পনেরো। শোনো, এখনো, আমার সব কথা বলা হয় নি। জটা-বেটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।"

গোবিন্দ উত্তেজিত স্বরে বললে, "অ্যাঁঃ!"

—"হ্যাঁ। উর্দি প'রে হোটেলের দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পনেরো নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। তারপর বেরিয়ে এল জটা-বেটা নিজে। দেখেই চিনলুম। গান্ধী-টুপি-পরা সেই ঘোড়ামুখ, একবার দেখলে কি এ-জীবনে ভোলা যায়?"

আমি তাকে সেলাম ঠুকে বললুম, "আপনার কি কিছু দরকার আছে বাবু?"

সে বললে, 'না।······হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখো। কাল ঠিক বেলা আটটার সময়ে আমাকে তুলে দিও। এই নাও বখ্‌শিস্‌!'
ব'লেই সে আমাকে একটা দুয়ানি উপহার দিলে।

আমি আবার সেলাম ক'রে বললুম, 'যে আজ্ঞে হুজুর! আমি ভুলব না।'

তারপর সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিলে।

প্রফেসর বললে, "উত্তম! মহারাজ কাল সকালে জেগে উঠে দেখবেন, আমার সৈন্যদল তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।"

নন্দ বললে, "মাছ তাহ'লে জালে পড়েছে। এখন জাল তুলতেই যা দেরি।"

ঘণ্টু বললে, "আমি তাহ'লে এখন আসি। কাল সকালে চোরকে জাগিয়ে দিয়েই আমি আবার এইখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

গোবিন্দ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "ভাই ঘণ্টু, তুমি আজ আমার যে উপকারটা—"

ঘণ্টু বাধা দিয়ে বললে, "ও-সব কথা যেতে দাও ভাই গোবিন্দ! এরা তো শুনছি আজ রাতের মত বাড়ি যাচ্ছে, তুমি কোথায় যাবে? মাসীর বাড়ি?"

গোবিন্দ শিউরে উঠে বললে, "বাপ্‌ রে, টাকার ব্যবস্থা না ক'রেই? উঁহু!"

ঘণ্টু বললে, "তাহ'লে তুমিও আমার সঙ্গে এস। ব'লে-ক'য়ে তোমাকেও আজকের রাতটা হোটেলে রাখতে পারব।"

গোবিন্দ বললে, "রাজি!"

প্রফেসর বললে, "বন্ধুগণ, তাহ'লে আজ আর কারুর এখানে থাকার দরকার নেই। আমিও এখন মঙ্গলবারকে 'ফোন' ক'রে বাড়িতে যাব।

কিন্তু সবাই স্মরণ রেখ, কাল সকাল সাড়ে-সাতটার ভেতরে সকলকেই আবার এখানে আসতে হবে। ঠিক এখানে নয়, কারণ এটা হচ্ছে বাজার, সকালে ভিড়ে দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না। বাজারের পাশেই যে মাঠটা রয়েছে, কাল ঐখানেই হবে আমাদের 'হেড-কোয়ার্টার'। মনে থাকে যেন, কাল সকাল সাড়ে সাতটা, পাশের মাঠ।"

ঘণ্টু হেসে বললে, "হ্যাঁ সর্দার!"

—"পারো তো সঙ্গে ক'রে কিছু কিছু পয়সা এনো। বিদায়!"

একঘণ্টা পরেই ডিটেক্‌টিভদের দল যে-যার বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারা ঘুমুলো বিছানায়, কিন্তু ক্ষুদে মঙ্গলের অদৃষ্টে সে-রাতে তখনো বিছানা জোটে নি।

মাঝ-রাতে তার বাবা আর মা থিয়েটার থেকে বাড়িতে ফিরে সবিস্ময়ে দেখলেন টেলিফোনের টেবিলের সামনে, চেয়ারের কুশনের উপর হেলে তাঁদের ছোট ছেলে মঙ্গল ঘুমিয়ে রয়েছে।

মা তাকে কোলে তুলে যখন বিছানায় শোয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, ঘুমের ঘোরে বিড়-বিড় ক'রে সে বললে, "সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ··· সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জটাধরের রক্ষী সৈন্য

'আদর্শ ভোজনালয়ে'র পনেরো নম্বর ঘরটি ছিল একেবারে বড় রাস্তার উপরে।

পরদিন সকালে জটাধর যখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আরশি-চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত, তার কানে ঢুকল অনেক ছোট ছোট ছেলের চিৎকার।

জটাধর জানলার কাছে এসে দেখলে, রাস্তার ওধারকার মাঠে অন্ততঃ দুই ডজন ছেলে খেলছে ফুটবল।

আর একদল ছেলে বাজারের সাম্‌নের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

হোটেলের ঠিক তলা থেকে এল আর একদল ছেলের চিৎকার।

জটাধর মনে মনে ভাবলে, পুজোর ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ কিনা, ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নেই।

মাঠের এক প্রান্তে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রফেসর চোখ থেকে চশমা খুলে নাড়াতে নাড়াতে বলছিল, "না, এত অসম্ভব সব মূর্খ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব! চোর ধরবার উপায় আবিষ্কার করবার জন্যে দিন-রাত আমি মাথা ঘামিয়ে মরছি, আর তোমরা কিনা সব পণ্ড করবার চেষ্টায় আছ! খবর দিয়ে সারা কলকাতাকে এখানে ডেকে এনেছ! আমরা যাত্রা করছি না থিয়েটার করছি যে, আমাদের দর্শক দরকার হবে? তোমাদের পেটে কি একটাও গুপ্তকথা থাকে না? এখন চোর যদি চম্পট দেয়, দায়ী হবে তোমরা, হে মূর্খের দল!"

প্রফেসরের এই প্রাঞ্জল বক্তৃতার ফলে, কেউ কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয়েছে ব'লে বোধ হ'ল না।

নন্দ বলল, "ভয় নেই প্রফেসর, জটা-বেটাকে আমরা কিছুতেই পালাতে দেব না!"

প্রফেসর বললে, "এখন শোনো গাধার দল। যা করেছ তা করেছ, কেবল এইটুকু দেখো, ছোক্‌রারা যেন আর হোটেলের সামনে না যায়। বুঝেছ? অগ্রসর হও!"

গুপ্তচরেরা প্রস্থান করল। রইল শুধু ডিটেকটিভরা।

মান্‌কে বললে, "বে-পাড়ার ছেলেগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব নাকি?"

প্রফেসর বললে, "তাড়ালে ওরা যদি যেত তা'হলে আর ভাবনা ছিল

কি ! পৃথিবী উলটে গেলেও ওরা আর এখান থেকে এক পা নড়বে না !"

গোবিন্দ বললে, "তাহ'লে আমাদের একটা নতুন ফন্দি আঁটতে হবে ! লুকোচুরি যখন আর চলবে না, তখন এস, চোরকে আমরা চারিদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলি ! সে স্বচক্ষে দেখুক, আমরা কি করতে চাই !"

প্রফেসর বললে, "ও-কথা আমিও যে ভাবিনি তা নয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায়ও নেই।"

নন্দ উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "গ্র্যাণ্ড্ আইডিয়া !"

গোবিন্দ বললে, "চোরের পেছনে দেড়-শো ছেলে যদি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে যেতে থাকে, তাহ'লে পুলিশের নজরে পড়বার ভয়ে টাকাগুলো সে আবার ফিরিয়ে না দিয়ে পারবে না !"

আর সবাই মহা বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং ! সাইকেলের ঘণ্টা ! কুমারী নমিতা সেন !

"গুড্ মর্নিং !" ব'লেই নমিতা মাঠের উপরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

সাইকেলের 'হ্যাণ্ডেল-বারে' ঝুলছিল একটি 'বাস্কেট'। সেটি খুলে নিয়ে নমিতা বললে, "আমি দুটো 'ফ্লাস্কে' ক'রে চা, মাখন-মাখানো টোস্ট আর একটা 'কাপ' এনেছি। নাও, তোমরা 'ব্রেকফাস্ট' সেরে নাও !"

ডিটেক্‌টিভরা সানন্দে পান-ভোজনে নিযুক্ত হ'ল। চায়ের পেয়ালার হাতল ছিল না বটে, কিন্তু তার জন্যে অসুবিধা হ'ল না কিছুমাত্র।

মানুকে বললে, "চমৎকার লাগল !"

প্রফেসর বললে, "টোস্টগুলি কি মুড়্‌মুড়ে !"

নমিতা বললে, "বাড়িতে মেয়ে না থাকলে কি লক্ষ্মীশ্রী আসে ?"

ছুটু শুধরে দিয়ে বললে, "বাড়িতে অর্থাৎ মাঠে ?"

গোবিন্দ বললে, " বাড়ির খবর ভালো তো ?"

নমিতা বললে, "হ্যাঁ গোবিন্দা। কিন্তু দিদ্‌মা বলেছেন তুমি যদি

শীগ্‌গির বাড়িতে না ফেরো, তাহ'লে রোজ তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে।"

গোবিন্দ বললে, "নিরামিষের নিকুচি করেছে।"

বুদ্ধু বললে, "কেন নিকুচি করেছে? নিরামিষ খাবার খারাপ নাকি?"

নমিতা বললে, "না খারাপ নয়। তবে শুনেছি, মাছ না পেলে গোবিন্দা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। ছেলেমানুষ কিনা!"

তারা ভারি খুশি হ'য়ে গল্প করতে লাগল। সবাই নমিতার মন রাখতে ব্যস্ত। প্রফেসর নিয়েছে তার সাইকেলের ভার। মান্‌কে রাস্তার কলে গেল ফ্লাস্ক আর পেয়ালা ধোবার জন্যে। ছট্টু বাস্কেটটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিলে। বুদ্ধু সাইকেলের 'টায়ার'গুলো পরীক্ষা ক'রে দেখলে, তাদের মধ্যে যথেষ্ট হাওয়া আছে কিনা! এবং নমিতা সর্বক্ষণ চঞ্চলা হরিণীর মত নাচতে নাচতে গল্প ব'লে যাচ্ছে অনর্গল!

হঠাৎ সে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ছেলে আজ এখানে এসে জুটেছে কেন? এ-পাড়ায় আজ কিসের তামাসা?"

প্রফেসর বললে, "কেমন ক'রে খবর পেয়ে ওরা আমাদের চোরধরা দেখতে এসেছে!"

আচম্বিতে মোটর-হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে এল ঘণ্টু! হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চল্‌, চল—জলদি! চোর আসছে!"

প্রফেসর চিৎকার ক'রে বললে, "সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফ্যালো! ওর সামনে থাকুক ছেলের পাল, ওর পিছনে থাকুক ছেলের পাল, ওর ডাইনে আর বাঁয়ে থাকুক ছেলের পাল! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও!"

মুহূর্তের মধ্যে মাঠ খালি! নমিতা একেবারে একলা! সবাই তাকে এ-ভাবে ফেলে গেল ব'লে অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে উঠতে চাইলে। তারপর সে সাইকেলের উপরে উঠে প'ড়ে দিদিমার মত মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, "আমি এ-সব পছন্দ করি না—আমি এ-সব পছন্দ করি না!" তারপর সে ছেলেদের পিছনে পিছনে চালিয়ে দিলে সাইকেল।

গান্ধী-টুপি প'রে জটাধর হোটেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ডানদিকে ফিরে একটু এগিয়েই বৌবাজারের রাস্তা ধরলে।

প্রফেসর, ঘণ্টু ও গোবিন্দ ছেলেদের বিভিন্ন দলের ভিতরে চর পাঠিয়ে দিলে। মিনিট-কয়েক পরেই দেখা গেল জটাধরকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে মহা হট্টগোল করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে শিশু-পল্টনের পর শিশু-পল্টন!

জটাধর চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল দস্তুরমত। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও বকাবকি করতে করতে চলেছে তার সঙ্গে-সঙ্গেই। অনেক ছেলে তার মুখের দিকে এমন কটমট ক'রে তাকাচ্ছে যে, মহাবিব্রত হয়ে সে বুঝতেই পারলে না যে, কোন্ দিকে মুখ ফেরালে এই-সব দৃষ্টি-বাণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

হঠাৎ সোঁ ক'রে একটা ঢিল জটাধরের মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

ভয়ানক চম্‌কে উঠে সে আরো তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে। কিন্তু ছেলেরাও বাড়িয়ে দিলে তাদের পায়ের গতি। ধাঁ ক'রে সে পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হয়েই হতাশ ভাবে দেখলে, সেখান থেকেও তেড়ে আসছে নতুন শিশুপাল!

ঘণ্টু বললে, "জটা-বেটার মুখখানা দেখ! ও যেন ক্রমাগত হাঁচতে চাইছে, কিন্তু পারছে না!"

গোবিন্দ বললে, "ঘণ্টু, আমাকে তোমার আড়ালে আড়ালে নিয়ে চল! চোর যেন এখুনি আমাকে না চিনে ফেলে! এখনো দেখা দেবার সময় হয়নি!"

এই অপূর্ব শোভাযাত্রার পিছনে চঞ্চল-কৌতুকে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে সাইকেল-বাহিনী নমিতা সেন!

এইবারে জটাধরের বুক ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। সে সকল দিক থেকেই পেলে যেন একটা অদৃশ্য বিপদের গন্ধ! পা ফেলতে লাগল সে লম্বা লম্বা! কিন্তু শিশুপালকে এড়ানো অসম্ভব!

হঠাৎ সে ফিরে দৌড় মারবার চেষ্টা করলে—সঙ্গে সঙ্গে মান্‌কে ঠিক

তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং অমনি জটাধরও দড়াম্ ক'রে পপাত ধরণীতলে!

জটাধর ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠল, "ওরে ক্ষুদে বিচ্ছুর দল, মতলব-খানা কি তোদের? এখান থেকে বিদায় হ', বিদায় হ', বলছি! নইলে এখুনি আমি পুলিশ ডাকব।"

মান্‌কে মুখ ভেংচে বললে, "তাই ডাকো—লক্ষ্মী সোনা আমার।" তুমি পুলিশ ডাকলেই আমরা খুশি হই!"

পুলিশ ডাকবার ইচ্ছা জটাধরের মোটেই নেই। ভয়ে তার প্রাণ ক্রমেই কুঁকড়ে পড়ছে। সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তার লোক অবাক্ হয়ে গেছে—এত শিশু একসঙ্গে কেউ দেখেনি। পথের দু'পাশের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় দলে দলে কৌতূহলী মুখ! দোকানদাররা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছে, ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি?" পথের মোড়ে মোড়ে সার্জেন্ট-পাহারাওয়ালারা বিস্ময়-বিস্ফারিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তার মুখের পানে। তারপরই একদল ছেলে এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে গান ধরলে:

"জটা-বেটা, জটা-বেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা.
মাথায় গান্ধী-টুপি,
ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি,
চুরি করে এটা-সেটা—
জটা-বেটা, জটা-বেটা!"

ও বাবা, বলে কিগো! হতভাগারা তার নাম পর্যন্ত আদায় করেছে—তার নামে পদ্য পর্যন্ত লিখে ফেলেছে! এ যে সঙিন্ ব্যাপার!

তখন তারা ডালহাউসি স্কোয়ারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এসে পড়েছে।

জটাধর বাঁদিকে মুখ ফিরিয়েই দেখলে 'কারেন্সির' বাড়ি। চট্ ক'রে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধির উদয় হ'ল। বেগে শিশু-ব্যূহ ভেদ ক'রে একেবারে সে কারেন্সি-বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল!

এক মুহূর্তে প্রফেসরও কারেন্সির দরজার কাছে হাজির। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে, "আমি আর ঘণ্টু আগে ভেতরে যাই। আর সকলে দরজার কাছে অপেক্ষা করুক। তারপর ঘণ্টু হর্ন বাজালেই গোবিন্দ যেন বাছা বাছা দশজন ছেলে নিয়ে ভেতরে যায়!"

প্রফেসর ও ঘণ্টু ভেতরে ঢুকে গেল।

বিপুল উত্তেজনায় গোবিন্দের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে। এতক্ষণ পরে একটা-না-একটা কিছু হবেই। সে বুদ্ধু, ছটু, মানুকে ও নন্দ প্রভৃতি দলের কয়েকজন মাতব্বরকে কাছে ডাকলে। বাকি সবাইকে বললে, সেখান থেকে চ'লে যেতে।

বাকি ছেলের দল সেখান থেকে একটু তফাতে সরে গেল মাত্র, বিদায় হবার নামও কেউ করলে না। পরিণাম না দেখে কেউ নড়তে রাজি নয়।

একটি ছেলের হাতে সাইকেলের ভার দিয়ে নমিতা এসে দাঁড়াল গোবিন্দের কাছে। বললে, "গোবিন্‌দা, এই আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ভয় পেও না, ব্যাপার বড় বিষম। আমার বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে ঠিক ব্যাঙের মত!"

গোবিন্দ বললে, "আমারও তাই!"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আল্‌পিনের মহিমা

প্রফেসর ও ঘণ্টু ভিতরে ঢুকে দেখলে, জটাধর একেবারে 'কাউণ্টারে'র ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার কর্মচারী তখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

প্রফেসর চোরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিকারীর মত তীক্ষ্ণ চোখে

তার দিকে তাকিয়ে রইল।

চোরের পিছনে দাঁড়াল ঘণ্টু, মোটর-হর্ন বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

কর্মচারী ফোন ছেড়ে এসে প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলে, তার কি দরকার?

চোরকে দেখিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললে, "এই ভদ্রলোক আমার আগে এসেছেন।"

—"আপনি কি চান মশাই?"

জটাধর বললে, "একশো টাকার নোটের বদলে দশখানা দশ টাকার নোট চাই।"

কর্মচারী নোটখানা নিলে।

প্রফেসর বললে, "মশাই, একটু অপেক্ষা করুন। ওখানা চোরাই নোট।"

কর্মচারী চমকে বললে, "কি?"

অন্যান্য কেরানী কাজ করতে করতে সবিস্ময়ে মুখ তুলে দেখলে।

প্রফেসর বললে, "এই ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর পকেট থেকে ঐ নোটখানা চুরি করেছে।"

—"কী! এত বড় আস্পর্ধা! আমি চোর? তবে রে ছুঁচো!" বলেই জটাধর প্রফেসরের গালে সশব্দে মারলে প্রচণ্ড এক চড়!

প্রফেসর বললে, "চড় মেরে তোমার কোনই লাভ হবে না!" ব'লেই এমন তেজে জটাধরকে আক্রমণ করলে যে, সে কোনরকমে 'কাউণ্টার' ধ'রে পতন থেকে করলে আত্মরক্ষা!

কেরানীরা কাজ ফেলে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। কারেন্সির একজন বড় কর্তা বা অফিসারও এসে হাজির!

ঘণ্টু বাজালে মোটর-হর্ন। গোবিন্দের পিছনে পিছনে হ'ল আরো দশ শিশু মূর্তির আবির্ভাব।

অফিসার ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "এখানে এত গোলমাল কেন? এত

ছেলে কেন? ব্যাপার কি?"

জটাধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "স্যর, আমি যে একশো টাকার নোটখানা ভাঙাতে দিয়েছি, এরা বলে সেখানা নাকি চোরাই নোট!"

জটাধরের সুমুখে এসে গোবিন্দ বললে, "এরা কেউ মিথ্যে বলছে না। কাল কালিপুর থেকে কলকাতায় আসবার সময়ে ট্রেনে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ফাঁকে তুমি আমার পকেট থেকে একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেছিলে!"

অফিসার বললেন, "ছোক্‌রা, তোমার কথার কোন প্রমাণ আছে?"

চোর গোবিন্দকে দেখে প্রথমটা দ'মে গিয়েছিল। এখন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "কিছু প্রমাণ নেই স্যর! আমি আজ এক হপ্তার ভেতরে কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি।"

রাগে প্রায় কেঁদে ফেলে গোবিন্দ বললে, "মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা!"

জটাধর হাসতে হাসতে বললে, "ট্রেনে তোমার কেউ সাক্ষী আছে?"

—"আছে। কালিপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, এই লোকটি কাল ট্রেনে ক'রে আমার সঙ্গে এসেছে।"

অফিসার জটাধরকে বললেন, "এ-কথার উত্তরে তোমার কি বলবার আছে?"

জটাধর বললে, 'স্যর, আমি আদর্শ ভোজনালয়ে থাকি। আমি—"

ঘণ্টু বাধা দিয়ে বললে, "আদর্শ ভোজনালয়ে তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছ কাল বৈকালে। হোটেলের চাকরের উর্দি প'রে আমি কাল সারারাত তোমার ওপরে পাহারা দিয়েছি।"

অফিসার ও কেরানীরা সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে হাসতে লাগল।

অফিসার বললেন, "আপাতত এই একশো টাকার নোট ভাঙানো হ'তে পারে না"—ব'লেই তিনি নাম ও ঠিকানা নেবার জন্যে কাগজ ও কলম হাতে করলেন।

গোবিন্দ বললে, "এর নাম জটাধর।"

চোর বললে, "এরা দেখছি আমার নাম পর্যন্ত বদলে দিতে চায়। স্যর, আমার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।"

গোবিন্দ বললে, "উঃ কি মিথ্যাবাদী! ট্রেনে তুমি আমাকে নিজে বলেছ, তোমার নাম জটাধর!"

অফিসার বললেন, "আপনার নাম যে অবিনাশ, তার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?"

জটাধর বললে, "তা'হলে আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমার কাগজ-পত্তর আছে হোটেলেই।"

গোবিন্দ বললে, "স্যর, ও পালাতে চায়! আপনি আমার টাকাগুলো আদায় ক'রে দিন—আমার একশো পঁচিশ টাকা।"

অফিসার গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে বললেন, "খোকাবাবু, ব্যাপারটা তুমি যতটা সহজ মনে করছ ততটা সহজ নয়। নোট যে তোমার, তার প্রমাণ কি? নোটের পিছনে তোমার নাম লেখা আছে? নোটের নম্বর তুমি বলতে পারো?"

—"না, তা পারি না বটে। তবু নোটগুলো আমারই। মা আমার হাত দিয়ে নোটগুলো পাঠিয়েছিলেন দিদিমার কাছে।"

জটাধর বললে, "স্যর, ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারি, ও নোট আমার। ছোট ছোট খোকার টাকা চুরি করা আমার ব্যবসা নয়।"

হঠাৎ গোবিন্দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎসাহভরে বললে, "স্যর, একটা কথা আমার মনে পড়েছে। আমি আলপিন দিয়ে নোট-শুদ্ধ একখানা খাম পকেটের সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলুম। এই দেখুন সেই আল্‌পিন!"

জটাধর দুই পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

অফিসার একশো টাকার নোটখানা চেয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ছেলেটি ঠিক বলেছে! নোটের পিছনে একটা বড় আলপিন বেঁধার দাগ রয়েছে তো বটে!"

ঠিক সেই মুহূর্তেই জটাধর ফিরে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে ছেলের দলকে দুদিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে মারলে দৌড়! বিদ্যুতের মত সে একেবারে বাড়ির বাইরে!

অফিসার চিৎকার করলেন, "পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো! এই সেপাই!"

সকলেই বাইরে ছুটে গেল। না, চোর পালাতে পারেনি—ছেলের দল আবার তাকে ঘিরে ফেলেছে! সে মাটির উপরে প'ড়ে আছে চিৎপাত হয়ে এবং প্রায় কুড়িজন শিশু-যোদ্ধা তার দুই হাত, দুই পা, জামা ও মাথা ধ'রে করছে টানাটানি! জটাধর পাগলের মত ছটফট করছে, কিন্তু ছেলেরা তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে ছিনে-জেঁাকের মত।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং! কেউ জানে না, ইতিমধ্যে নমিতা সেন কখন গিয়েছিল পুলিশ ডাকতে। এখন দেখা গেল নমিতার সাইকেলের পিছনে পিছনে ছুটে আসছে একজন সার্জেণ্ট ও একজন পাহারাওয়ালা।

কারেন্সির অফিসার বললেন, "সার্জেণ্ট, এর নাম অবিনাশ কি জটাধর আমি তা জানি না! কিন্তু এ যে চোর, তাতে আর সন্দেহ নেই!"

চোর গ্রেপ্তার ক'রে সার্জেণ্ট চলল থানার দিকে। সে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা!

সর্বপ্রথম সার্জেন্ট ও কারেন্সির অফিসার এবং তাদের মাঝখানে জটাধর বা অবিনাশ। তারপর প্রায় দেড়-শো ছেলে গাইতে গাইতে চলেছে—

"জটা-বেটা, জটা-বেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা!"

এবং শোভাযাত্রার পাশে পাশে আসছে সাইকেল-বাহিনী কুমারী নমিতা সেন, তার ছোট হাতের চাপে মিষ্টি ঘণ্টা বাজছে ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

থানার সামনে এসে নমিতা বললে, "গোবিন্দ, ভাই! আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির সবাইকে সিনেমার এই গল্পটা বলতে চললুম!"

গোবিন্দ বললে, "আমিও একটু পরে যাচ্ছি। আমার খাবার যেন তৈরী থাকে—কিন্তু নিরামিষ নয়, খবরদার!"

নমিতা সেনের সাইকেল আবার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করতে লাগল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুপ! চুপ!

থানার ইন্‌স্পেক্টার গোবিন্দকে তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলে।

তারপর চোরকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি?"

চোর বললে, "সুদর্শন বিশ্বাস।"

গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘণ্টু হো হো ক'রে হেসে উঠল—এমন কি কারেন্সির সুগম্ভীর অফিসার পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

ঘণ্টু বললে, "অদ্ভুত! প্রথমে ওর নাম হ'ল জটাধর। তারপর শোনা গেল—অবিনাশ দাস। এখন আবার শুনছি সুদর্শন বিশ্বাস! তা'হলে ওর আসল নাম কি?"

ইন্‌স্পেক্টার বিরক্ত স্বরে বললে, "চুপ! ওর আসল নাম বার করতে

আমাদের দেরি লাগবে না! ওরে জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন! থাকা হয় কোথায়?"

—"আপার সার্কুলার রোডের আদর্শ ভোজনালয়ে।"

—"এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

—"চন্দননগরে।"

প্রফেসর বললে, "আর-একটা নতুন মিথ্যে কথা!"

ইন্স্পেক্টার গর্জন ক'রে বললে, "চুপ। মিথ্যে কি সত্যি, জানতে আমাদের বাকি থাকবে না।"

এই সময়ে কারেন্সির অফিসার বিদায় নিলেন এবং যাবার সময়ে গোবিন্দের পিঠ চাপ্‌ড়ে গেলেন আদর ক'রে।

—তারপর বাপু সুদর্শন, তুমি কি গোবিন্দের একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।"

—"তাহ'লে বাকি পঁচিশ টাকা কোথায় গেল?"

পকেট থেকে একখানা খাম বের ক'রে চোর বললে, "হুজুর, বাকি টাকা ঐ খামের ভিতরেই আছে।"

—"ঐটুকু ছেলের টাকা চুরি করতে তোমার মায়া হ'ল না?"

—"মনের ভুল হুজুর, গ্রহের ফের! ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছিল আর ওর পকেট থেকে টাকাগুলো বেরিয়ে গাড়ির ভিতরে প'ড়ে গিয়েছিল। আমার পকেটে একটা আধলাও ছিল না, কাজেই আমি লোভ সামলাতে পারি নি।"

প্রফেসর বললে, "আবার মিথ্যে কথা স্যর! গোবিন্দের সব টাকা ও ফিরিয়ে দিয়েছে। ও বলছে ওর পকেটে আর একটা আধলাও ছিল না। অথচ হোটেল ভাড়া ও খাবারের টাকা দিয়েছে, তারপর ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছে—"

ইন্স্পেক্টার চিৎকার করলে, "চুপ। ও-সব জানাও আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না।" ব'লেই এতক্ষণ যে যা বলেছে সমস্তই একে একে লিখে

নিলে।

চোর বললে, "হুজুর, আমি তো অপরাধ স্বীকার করেছি, এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দিতে হুকুম হোক্।"

ইন্‌স্পেক্টার বললে, "চুপ! এটা তোমার মামার বাড়ি নয়, এখানে কেউ তোমার আবদার শুনবে না। স্যার্জেন্ট, আসামীকে 'লক-আপে' রাখবার ব্যবস্থা কর।"

গোবিন্দ বললে, "স্যর আমার টাকাগুলো কখন ফেরত পাব?"

—"পুলিশ হেড-কোয়ার্টার থেকে শীঘ্রই তোমার ডাক আসবে খোকাবাবু, টাকা ফেরত পাবে সেখান থেকেই।"

গোবিন্দ বললে, "স্যর, আমার নাম খোকাবাবু নয়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়!"

এতক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টারের মুখে হাসি ফুটল। বললে, "হ্যাঁ, গোবিন্দবাবু, তোমাকে খোকাবাবু ব'লে ডাকা আমার উচিত হয় নি। কারণ, তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যে ভাবে চোর ধরেছ, তার ভেতরে একটুও খোকাবাবুত্ব নেই। তোমরা হ'চ্ছ পাকা ডিটেক্‌টিভ, তোমরা হ'চ্ছ বাহাদুর! আচ্ছা, পরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আজ তোমরা বাড়ি যাও।"

গোবিন্দ থানার বাইরে এসে দেখলে, ছেলের দল—সেই শ-দেড়েক পঙ্গপালের মত শিশুপাল তখনো রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয় নি। গাড়ি-ঘোড়া ও লোক-চলাচলের বাধা হচ্ছে ব'লে পাহারাওয়ালারা তাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে যথাসাধ্য! কিন্তু তাড়া খেয়ে তারা বড়জোর হাত দশ-পনেরো স'রে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র। গোবিন্দের একটা হেস্তো-নেস্তো না হ'লে রাস্তা থেকে তারা কিছুতেই অদৃশ্য হবে না।

গোবিন্দ তাদের সম্বোধন ক'রে হাসতে হাসতে বললে, "ভাই সব! চোর ধরা পড়েছে, আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, আর কেন তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে খেলার সময় নষ্ট করছ? তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ, কারণ, তোমরা না থাকলে জটা আজ ধরা পড়ত না। এইবার যে-যার

কাজে যাও, নমস্কার!"

তখন ছেলেরা দল বেঁধে আবার গাইতে গাইতে চ'লে গেল---

"জটা-বেটা, জটা-বেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা!"

সেখানে গোবিন্দের সঙ্গে তখন রইল কেবল গোয়েন্দারা।

গোবিন্দ বললে, "এর পর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, টেলিফোনে মঙ্গলবারকে সব খবর জানানো। কারণ, খবর না পেয়ে সে হয়তো এতক্ষণ ছটফট ক'রে সারা হচ্ছে!"

নন্দ ফোন্ করতে ছুটল।

গোবিন্দ আর সকলের দিকে ফিরে বললে, "ভাই, তোমরা আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক খেটেছ! তার ঋণ আর এ-জীবনে শোধ হবে না! কিন্তু আমার জন্যে তোমরা যে টাকা-পয়সা খরচ করেছ, সেটা আমি যত শীঘ্র পারি শোধ ক'রে দেব।"

ঘণ্টু বললে, "কী! ও-খরচটাকে যদি তুমি ধার ব'লে মনে কর তাহ'লে আমরা সবাই রেগে হব টং! তারপর তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন গোবিন্দ, আর-এক বিষয়ে এখনো আমাদের হিসেব-নিকেশ হয় নি? সেই তোমার অদ্ভুত খালাসি-রঙের জামার জন্যে মুষ্টিযুদ্ধের কথা এখুনি তুমি ভুলে গেলে নাকি?"

নিজের দু'হাতে প্রফেসর ও ঘণ্টুর হাত ধ'রে গোবিন্দ বললে, "ভুলি নি ভাই, কিছুই ভুলি নি! আজ আমার আনন্দের দিনে তোমার মুষ্টিযুদ্ধের কথা ভুলে যাও ঘণ্টু! আজ কৃতজ্ঞতায় মন যখন ভরে উঠেছে, তখন ঘুষি মেরে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেব কেমন ক'রে।"

ঘণ্টু বললে, "কৃতজ্ঞ হও, আর না হও, ঘুষি মেরে আমাকে মাটিতে ফেলে দেবার ক্ষমতা কিন্তু তোমার নেই, বুঝলে ভায়া?"

খোকা-খুকীদের বন্ধু হেমেন রায়

চোর ধরা পড়ল বটে, কিন্তু এখনো আমাদের গল্প শেষ হয় নি। আর গল্পের আসল মজাটুকুই আছে শেষের দিকে।

সেদিন প্রফেসর ও ঘণ্টুকে নিয়ে গোবিন্দ আবার রাস্তায় বেরিয়েছে সেজেগুজে। কারণ, উত্তরাঞ্চলের পুলিশের ডেপুটি-কমিশনার তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঘণ্টু আড়-চোখে লক্ষ্য করলে, গোবিন্দ আজ নীল রঙের পোশাক পরে নি।

জোড়াবাগানে ডেপুটি-কমিশনারের আস্তানা। চারিদিকে সাদামুখো সার্জেন্ট, লালপাগড়ী চৌকিদার, ব্যস্তমুখ উকীল, গম্ভীর ইন্‌স্পেক্টার আর শুক্‌নো-চেহারা চোর-জুয়াচোর প্রভৃতির ভিড়। গোবিন্দ হতভম্ব হয়ে গেল—তার ভয়ও যে হচ্ছিল না, তা নয়!

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, "কলকাতায় এত চোর-বদমাইস আছে!"

প্রফেসর বললে, "এর চেয়ে ঢের—ঢের বেশি আছে গোবিন্দ! কলকাতার পথ দিয়ে রোজ যারা হাঁটে, তাদের মধ্যে সাধুর চেয়ে, পাপীই আছে বেশি। সব পাপী ধরা পড়ে না তাই তারা সাধু! আমরা না থাকলে জটা বেটাকে আজ কে চোর ব'লে চিনতে পারত?"

গোবিন্দ বললে, "ও ভাই, জটা-বেটাও যে চোরদের সঙ্গে বারান্দায় ব'সে আছে—দেখ, দেখ!"

জটাধর উবু হ'য়ে ব'সে আছে, তার মাথায় আজ গান্ধী-টুপি নেই!

ঘণ্টু বললে, "কিগো জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন বাবু! তোমার সাধের গান্ধী-টুপি কে কেড়ে নিলে?"

জটাধর কথা কইলে না—ঘোড়ামুখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে। বোধ-হয় রাজার অতিথি হ'তে পেরেছে ব'লে জাঁক হয়েছে তার মনে মনে।

এমন সময়ে গোবিন্দের ডাক এল।

সে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলে, ডেপুটি-কমিশনার ও আরো কয়েক-জন পোশাক-পরা ভদ্রলোক সেখানে ব'সে রয়েছেন।

ডেপুটি-কমিশনার তাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "এস এস, —কলকাতার সব-চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু সব-চেয়ে বুদ্ধিতে বড় ডিটেক্-টিভ এস। বোসো জটাধর, বোসো!"

সে বললে, "আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ!"

—"হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। চেয়ারে উঠে বোসো। তোমার আর তোমার বন্ধুদের আশ্চর্য কাহিনী আমি শুনেছি। বাহাদুর, বাহাদুর! হ্যাঁ, তুমি তোমার টাকাগুলো ফেরত চাও? মামলা শেষ হবার আগে আমরা টাকা ফেরত দিই না, তবে তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'ল। এই নাও তোমার টাকা। দেখো, আবার যেন হারিয়ে বোসো না।"

—"আজ্ঞে, না স্যর। এ টাকা এখুনি গিয়ে আমার দিদিমার হাতে দেব!"

—"হ্যাঁ, তাই দিও।"...ঠিক সেই সময়ে তাঁর টেবিলের উপরে টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। ডেপুটি-কমিশনার 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ...বেশ তো, আপনারা এখানে এলেই তার দেখা পাবেন। এখুনি আসবেন? আচ্ছা।...হ্যাঁ, শোনো জটাধরবাবু—"

—"আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ।"

—"হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। শোনো: তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খবরের কাগজের এক সম্পাদক আর রিপোর্টাররা এখুনি এখানে আসবে!"

—"কেন স্যর? আমি কি কোন অন্যায় ক'রে ফেলেছি?"

ডেপুটি-কমিশনার হেসে উঠে বললেন, "না, না, অন্যায় করবে কেন? রিপোর্টাররা পাহারাওয়ালা নয়, তারা তোমাকে ধরতে আসছে না, তোমাকে কেবল গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে আসছে! বোধহয় খবরের কাগজে তোমার নাম বেরুবে!"

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, "খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে?

কেন স্তর ?"

—"গোয়েন্দাগিরিতে তুমি আমাদের—অর্থাৎ পুলিশের ওপরেও টেক্কা মেরেছ ব'লে।"

—"কিন্তু এ বাহাদুরি তো খালি আমার একলার নয়। আমাদের চশমা-পরা প্রফেসর, ছোক্‌রা চাকরের উর্দি-পরা ঘণ্টু ছিল, আরো ছিল মান্‌কে, বুদ্ধু, ছট্টু, মঙ্গলবার—"

ডেপুটি-কমিশনার আবার হেসে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদেরও নাম যাতে বাদ না যায় সে-চেষ্টা আমি করব জটাধর—"

—"আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ।"

—হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। জটাধর বুঝি সেই পাজী চোরটার নাম ? বটে! ও-নাম ধ'রে তোমাকে ডাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়। আচ্ছা, আর আমি ভুলব না। ঐ দেখ গোবিন্দ, রিপোর্টাররা আসছে।"

চারজন ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন। গোবিন্দের মনে হ'ল, তাদের মধ্যে একটি রোগা রোগা লম্বা-চুল, চশমা-পরা লোকের মুখ যেন সে আগে কোথায় দেখেছে!

তাদের অনুরোধে গোবিন্দ একে একে নিজের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলে।

একজন রিপোর্টার বললেন, "এ যেন কেতাবী গল্প! পাড়াগেঁয়ে ছেলে একদিনে হয়ে দাঁড়াল শহরের ডিটেক্‌টিভ। অদ্ভুত, অভাবিত!"

আর-একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "গোবিন্দ, এত কাণ্ড না ক'রে তুমি পাহারাওয়ালা ডেকে চোরকে ধরিয়ে দিলে না কেন ?"

গোবিন্দের মুখে হঠাৎ ভয়ের ছায়া পড়ল। তার চোখের সামনে জেগে উঠল, কালিপুরের নটবর-চৌকিদারের মুখ!

ডেপুটি-কমিশনার বললেন, "জবাব না দিয়ে, চুপ ক'রে রইলে কেন গোবিন্দ ?"

—"আজ্ঞে, ভয়ে আমি পাহারাওয়ালা ডাকি নি। কালিপুরের মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছ থেকে আমি যখন পেয়ারা পাড়ছিলুম, তখন

নটবর-চৌকিদার আমাকে দেখে ফেলেছিল।"

ঘরসুদ্ধ সবাই হাসতে হাসতে পেটে খিল্ ধরিয়ে ফেলে আর কি!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে ডেপুটি-কমিশনার বললেন, "না গোবিন্দ, না। তোমার মতন এত-বড় ডিটেক্‌টিভকে নটবর-চৌকিদারের কথায় আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি কি? না, তোমার কোন ভয় নেই।"

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বললে, "গ্রেপ্তার করবেন না? আঃ, বাঁচলুম।"

—"তবে, ভবিষ্যতে পরের বাগানের পেয়ারা গাছের দিকে আর নজর দিও না! হ্যাঁ, নজর অবশ্যি দিতে পারো, কিন্তু পেড়ে খেতে যেও না।"

গোবিন্দ ধীরে ধীরে সেই চশমা-পরা ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে তার মনে পড়েছে! বললে, "স্যর, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?"

—"না গোবিন্দবাবু, পারছি না তো।"

—"আমার কাছে পয়সা ছিল না। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আপনি আমার ট্রাম-ভাড়া দিয়েছিলেন।"

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গোবিন্দের সঙ্গে সেক-হ্যাণ্ড ক'রে বললেন, "ওহো তাহ'লে আমরা দেখছি পুরানো বন্ধু? হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমার পয়সা ফিরিয়ে দেবে বলেছিলে—"

—"কিন্তু আপনি নাম-ঠিকানা বললেন না!"

—"আজ বলতে পারি। আমার নাম—হেমেন রায়, আমি কাগজের সম্পাদক, থাকি আমি বাগবাজারের গঙ্গাতীরে।"

—"আজ কি ট্রাম-ভাড়ার পয়সাগুলো আমি ফিরিয়ে দিতে পারি?"

—"না গোবিন্দ, তা পারো না! কারণ তোমাদের পয়সাতেই তো আমি ক'রে খাচ্ছি! আমি তো খালি খবরের কাগজে লিখি না, ছেলেদের উপন্যাসও যে লিখি। ছেলেরা আমার বই কেনে আর আমাকে ভালোবাসে ব'লেই তো আজ আমি বেঁচে আছি।" তারপর ডেপুটি-

কমিশনারের দিকে ফিরে হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যর, এইটেই কি চোর জটাধরের প্রথম চুরি ?"

—"না হেমেনবাবু, আমার তা মনে হয় না। জটাধরের সম্বন্ধে ক্রমেই অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ পাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে আমাকে ফোন্ করলেই পাকা খবর দিতে পারব।"

হেমেন রায় বললেন, 'গোবিন্দ, চল আজ আমার সঙ্গে হোটেলে চল। কিছু খাবার আর চা খেতে তোমার আপত্তি আছে কি ?"

—"না স্যর, আপত্তি নেই। কিন্তু—"

—"কিন্তু, কি ?"

—"প্রফেসর আর ঘণ্টু বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

—"বেশ তো, তাদেরও নিমন্ত্রণ করছি। এখানে তোমার আর কোন কাজ নেই তো ? তবে চল।"

হেমেন রায়ের সঙ্গে গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘণ্টু রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ট্যাক্সি ডাকা হ'ল। তারপর সিধে চৌরঙ্গীর এক হোটেলে। (এখানে ব'লে রাখি, ইতিমধ্যে ট্যাক্সিতে হেমেন রায়ের পাশে ব'সেই ঘণ্টু তাঁর কানের কাছে এত-জোরে ভোঁপ্ ভোঁপ্ ক'রে মোটর-হর্ন বাজিয়ে দিয়েছিল যে, ভদ্রলোক চমকে ও লাফিয়ে উঠে গাড়ি থেকে পড়ে যান আর কি ! তাঁর ভয় দেখে ঘণ্টুর খিল্ খিল্ ক'রে কি হাসির ধুম।)

চৌরঙ্গীর সব অট্টালিকা, মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ ও বিলাতী হোটেলের সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখে বিস্মিত গোবিন্দের চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল !

হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কে কি খাবে বল।"

প্রফেসর চশমা খুলে নাড়তে নাড়তে বললে, "চপ, ফাউল-কাটলেট আর চা।"

ঘণ্টু বললে, "ফাউল স্যাণ্ডউইচ, ওমলেট আর চা।"—বাড়ি থেকে পেট ভ'রে খেয়ে বেরিয়েছে ব'লে তার অত্যন্ত অনুতাপ হ'তে লাগল। ক্ষুধা থাকলে তার অর্ডারের ফর্দ এর চেয়ে ঢের বড় হ'ত নিশ্চয়ই !

গোবিন্দ বললে, "আমি তো সব খাবারের নাম জানি না, হোটেলে

কখনো খাই নি। আমার যে-কোন খাবার হ'লেই চলবে—কেবল ফাউল আর গরুর মাংস খাব না স্যর।"

হেমেন রায় খাবারের অর্ডার দিয়েই দেখলেন, ঘণ্টু তার মোটর-হর্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তিনি হর্নটি তার হাত থেকে নিজের হস্তগত ক'রে বললেন, "এটা আপাতত আমার কাছে থাক্, ঘণ্টু! হোটেল থেকে বেরিয়ে আবার তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দেব।"

…খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে পর হেমেন রায় হোটেলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার ডেপুটি-কমিশনারকে ফোন করি।" ফোনের কাছে গিয়ে বললেন, "হ্যালো! হ্যাঁ আমি, হেমেন রায়!…কি বললেন? তাও কি সম্ভব: বলেন কি? …এখন তার কাছে এ-খবর ভাঙব না, আচ্ছা! কাগজে এ গল্প বেরুলে আমাদের পাঠকরা যে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!"

ফোন ছেড়ে ফিরে এসে হেমেন রায় এমনভাবে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন সে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক জীব! জীবনে এর আগে তিনি তাকে আর যেন কখনো দেখেন নি।

বললেন, "চল গোবিন্দ, ফটোগ্রাফারের কাছে চল। আমরা তোমার একখানা ছবি তুলব।"

অত্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গোবিন্দ বললে, "ছবি? আমার? কেন?"

—"পরে জানতে পারবে। এখন চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

যথাসময়ে গোবিন্দের ছবি তুলে নিয়ে হেমেন রায় তাকে আর তার দুই বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

গোবিন্দ গাড়ি থেকে নেমে নমস্কার করলে।

হেমেন রায় বললেন, "গোবিন্দ, তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিও। আর, কাল সকালে উঠে আগে খবরের কাগজ পড়তে ভুলো না।"

গোবিন্দ বুঝলে, কাগজে তার নাম বেরুবে ব'লেই হেমেন রায় তাকে

কাগজ পড়তে বলছেন। লজ্জায় মুখ নামিয়ে সে বললে, "আচ্ছা স্যর।"

হেমেন রায় রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "শীঘ্রই তুমি আরো একটা মস্ত সুখবর পাবে। যে-সে খবর নয়, একেবারে অবাক হয়ে যাবে গোবিন্দ। আজ আসি তা'হলে—"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নমিতার 'ওরিয়েণ্টাল ডান্স'

গোবিন্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলে, নমিতা চায়ের সরঞ্জাম-সাজানো একখানা 'ট্রে' হাতে নিয়ে নিচে নামবে ব'লে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবিন্দ উৎফুল্ল-স্বরে বললে, "নমু, নমু! টাকা পেয়েছি! কি মজা!

নমিতা তাড়াতাড়ি পিছনে স'রে গিয়ে বললে, "এখন আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না গোবিন্‌দা, এখুনি হাত থেকে 'ট্রে' প'ড়ে যাবে। তুমি দিদ্‌মার কাছে যাও, এখুনি আমি আসছি। কি করব বল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, সংসার নিয়ে খাটতে খাটতেই জীবনটা বয়ে গেল।" বলেই খিল্ খিল্ ক'রে কৌতুক-হাসি।

দোতলার বড় ঘরে ঢুকেই গোবিন্দ দেখলে, তার সাড়া পেয়ে দিদিমা উৎকণ্ঠিতভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সে এক ছুটে দিদিমার কাছে গিয়ে তার হাতে নোটগুলো দিলে। দিদিমা নোটগুলো আঁচলে বেঁধে রেখে, নাতির ডান-গালে মারলেন চড় এবং বাঁ-গালে খেলেন চুমো!...তারপর কি মনে ক'রে আঁচল খুলে একখানা নোট বার ক'রে নিয়ে বললেন, "গোবু!"

—"দিদিমা!"

—"এ নোটখানা তোর।"

—"আমি নেব না।"

—"ইস্, নিবি না বৈকি! নিতেই হবে, এটা হচ্ছে তোর বক্‌শিস,

তুই মস্ত-বড় টিক্‌টিকি হয়েছিস্ কিনা।" (দিদিমা ডিটেক্‌টিভকে বলেন, টিক্‌টিকি।)

এমন সময় নমিতা এসে বললে, "নিয়ে নাও গোবিন্‌দা। ব্যাটাছেলেরা ভারি হাঁদা! আমি হ'লে কারুকে দু'বার সাধতে হ'ত না!"

—"না, নেব না।"

দিদিমা বললেন, "তোকে নিতেই হবে! না নিলে দেখবি আমি এমন রেগে যাব যে, এখুনি হি হি ক'রে বাত-জ্বর তেড়ে আসবে।"

নমিতা বললে, "চটপট নাও গোবিন্‌দা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।"

—"বেশ দিদিমা, তাহ'লে দাও।"

গোবিন্দের মাসীমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনি বললেন, "নোটখানা নিয়ে কি করবে গোবিন্দ?"

—"তুমিই বল না মাসীমা, আমার কি করা উচিত?"

—"আমি তো বলি বাছা, তোমার যে-সব নতুন বন্ধুর জন্যে টাকাগুলো ফিরে পেয়েছ, তাদের একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াও-দাওয়াও!"

গোবিন্দ মাসীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "তুমি আমার মনের কথা টেনে বলেছ মাসীমা! আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলুম।"

নমিতা আহ্লাদে এক-পায়ে নাচতে নাচতে গানের সুরে বললে, "চা তৈরী করব কিন্তু আমি—চা তৈরী করব কিন্তু আমি।"

দিদিমা বললেন, "আহা, সব সোনার চাঁদ ছেলে! বেঁচে থাক্, সুখে থাক্, রাঙা বউ হোক্।"

সেইদিন বিকাল-বেলায় বাড়ির সুমুখের পথে নমিতা গাছ-কোমর বেঁধে গোবিন্দকে শিখিয়ে দিচ্ছিল, কেমন ক'রে সাইকেল চড়তে হয়।

সাইকেল চালাতে গিয়ে গোবিন্দ যখন উপরি উপরি তিনবার আছাড় খেলে, নমিতা তখন বললে, "নামো মশাই, নামো। তুমি যে পারবে না তা আমি আগে থাকতেই জানি! ব্যাটা-ছেলেরা যা বোকা।"

এমন সময়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে একজন ইন্‌স্পেক্টারের ইউনিফর্ম

পরা ভদ্রলোক নমিতাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তো দেখছি ১০ নম্বর বাড়ি! হ্যাঁ খুকী, এইটে কি চন্দ্রমোহন সেনের বাড়ি?"

নমিতা তাঁর কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আর খুকীটি নই? আমার নাম কুমারী নমিতা সেন, চন্দ্রবাবু আমার বাবা হন।"

ইন্‌স্পেক্টার হেসে ফেলে বললেন, "ঠিক, ঠিক! কুমারী নমিতা সেনকে খুকী ব'লে ডাকা আমার পক্ষে অন্যায় হয়ে গেছে! কিন্তু, তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?"

—"হুঁ-উ-উ!"

—"তাঁকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।"

নমিতা তখনি ছুটে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার আবার তাকে ডেকে বললেন, "গোবিন্দচন্দ্র রায় নামে যে ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকে, তাকেও একবার ডেকে আনো।"

পুলিশ দেখে গোবিন্দ তখন পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়ছিল—নটবর-চৌকিদারের বিভীষিকা তখনো তার মন থেকে বিলুপ্ত হয় নি। তার উপরে পুলিশের মুখে আবার নিজের নাম শুনে, ভয়ে তার প্রাণ যেন উড়ে গেল।

নমিতা বললে, "ও গোবিন্‌দা, তোমায় যে ইনি ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না?"

গোবিন্দ আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, "হ্যাঁ স্যর,—আমি কি কোন ...দোষ করেছি?"

ইন্‌স্পেক্টার আশ্বাস দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "না গোবিন্দ, কোন ভয় নেই! তোমার কপাল খুব ভালো।"

গোবিন্দ তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

চন্দ্রবাবু নেমে এসে ইন্‌স্পেক্টারকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

পাহারাওয়ালার হাত থেকে 'ব্রিফ্-কেস্'টা নিয়ে ইন্‌স্পেক্টার বললেন, "চন্দ্রবাবু, আপনাদের গোবিন্দ যে চোরটাকে ধরেছে, সে হচ্ছে একজন সাংঘাতিক লোক। ছ'মাস আগে কলকাতার একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্ক থেকে সে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার টাকা চুরি ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। পুলিশ কিছুতেই তার খোঁজ পাচ্ছিল না। এতদিন পরে সে ধরা পড়ল। তার জিনিসপত্র খানাতল্লাস ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি।"

নমিতা গালে হাত দিয়ে বললে, "ওমা!"

—"তিন মাস আগে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, যে এই চোরকে ধ'রে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গোবিন্দ, চোর ধরেছ তুমি, সুতরাং ব্যাঙ্ক থেকে তোমার নামেই পাঁচ হাজার টাকার একখানা 'চেক' এসেছিল। ডেপুটি-কমিশনারের হুকুমে সেই 'চেক'-ভাঙানি টাকা আমি তোমাকে দিতে এসেছি। চন্দ্র-বাবু, আপনি গোবিন্দের হয়ে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে একখানা রসিদ লিখে দিন।"

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আমার এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—আমার এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।"

দিদিমা নোট ফেলে দুই হাত দিয়ে গোবিন্দকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলেন—গোবিন্দ তখন একেবারে নির্বাক্, তার দুই চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরছে আনন্দের অশ্রু।

নমিতা তখন দুই হাতে ঢেউ খেলিয়ে ও পায়ের তালে ঘর কাঁপিয়ে রীতিমত 'ওরিয়েণ্টাল ডান্স' শুরু ক'রে দিয়েছে।

হঠাৎ গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দিদিমা! মাসীমা! কালিপুরে টেলিগ্রাম ক'রে দাও, মা যেন নিশ্চয়ই কাল কলকাতায় চলে আসেন!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

খোকনের ছবি

পরের দিন দুপুর বেলা। চল, আমরা কালিপুরে যাই।

গোবিন্দেরই মুখে শুনেছ, সেখানে বড় বড় বাড়িও নেই, রকমারি গাড়িও নেই, হট্টগোল বা ভিড়ের হুড়োহুড়িও নেই।

আছে সেখানে ছায়ামাখা জলে-ভরা টলমলে সরোবর; বাতাস-ছোঁয়ায় শিউরে-উঠা আম-জাম-কাঁটাল বন, নরম সবুজ পাতার কোল-জোড়া দোয়েল শ্যামাদের চপল হাসির তান আর ঘুঘুদের মধুর অশ্রু-গান; এবং বালি-মাটির বিছানায় প্রায়-ঘুমিয়ে-পড়া ছোট নদী খঞ্জনার তন্দ্রামাখা স্বপ্নসুর।

আজ সদ্যগত বর্ষাজলে স্নান সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্যামলতা পোয়াচ্ছে শরতের সোনালী রোদ। ও-পাড়ার চৌধুরী-বাড়ি থেকে ভেসে আসছে মহালয়ার প্রথম শানাইয়ের মুর্ছনায় মা-দুর্গার আগমনী গীতি।

প্রতিদিনকার মত আজও কমলা শেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে সেই গান শুনছেন আর তাঁর প্রাণের ভিতরটা ক'রে উঠছে হুহু হুহু। আনন্দের দিনেই আমাদের শানাই বাজে বটে, কিন্তু যাদের ভালোবাসি, তারা কাছে না থাকলে তার সুর যেন জাগিয়ে তোলে বুক-চাপা কান্নার স্মৃতি!

বিধবা কমলা, তাঁর একমাত্র সন্তান গোবিন্দ। পুজোর দিনে আমোদে থাকবে ব'লে তাকে তিনি নিজেই একরকম জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন বটে কলকাতায়, মাসীর বাড়িতে; কিন্তু আজ শানাইয়ের সুর শুনে মনটা তাঁর কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। তিনি জানেন, সে পরম সুখেই আছে, তবু আজ শারদীয় উৎসবের দিনে তাকে কাছে না পেয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা যেন খালি খালি মনে হচ্ছে; কমলার দুই চোখ ভ'রে এল অশ্রুর উচ্ছ্বাস, তাঁর শেলাইয়ের কল হয়ে গেল বন্ধ!

ঠিক সেই সময়েই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন নিস্তারিণী ঠাকরুণ!

রোজই এই সময়ে একবার ক'রে কমলার কাছে না এলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না। সকালে-বিকালেও মাঝে মাঝে আসেন কিংবা আসেন না, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁর নিয়মিত আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী! কারণ দু-জনে বড় ভাব।

নিস্তারিণী বললেন, "ও বোন, শেলাইয়ের কলের সামনে ব'সে জানলার দিকে অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

কমলা মৃদু হেসে বললেন, "না দিদি, অসুখ করেনি। খোকনকে অত ক'রে ব'লে দিলুম, কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখে একটা খবর দিতে, কিন্তু সে তার গরীব মাকে একেবারেই ভুলে গেছে। ব'সে ব'সে তার কথাই ভাবছিলুম।"

নিস্তারিণী মেঝের উপর ধুপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললেন, "কিচ্ছু ভাবিস্ নে বোন্, কিচ্ছু ভাবিস্ নে! আমি তোর গোবিন্দের খবর দিতে পারি।"

কমলা চম্‌কে উঠে বললেন, "খোকনের খবর তুমি দিতে পারো! সে কি? কেমন ক'রে জানলে দিদি?

—"আমার নব (নব হ'চ্ছে নিস্তারিণীর বড় ছেলে) আজ কলকাতা থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছে কিনা, তার মুখেই তোর গোবিন্দের খবর পেলুম।"

—"নব'র সঙ্গে কি খোকনের দেখা হয়েছে?"

—"না বোন, খবরের কাগজে সে গোবিন্দের কথা পড়েছে।"

কমলা উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "খবরের কাগজে! খবরের কাগজে খোকনের কথা! দিদি, দিদি, শীগ্‌গির বল খোকনের কি হয়েছে? কোথায় সে? তুমি জানো? কী তুমি শুনেছ?"

নিস্তারিণী হেসে বললেন, "ঠাণ্ডা হয়ে বোস কমলা! খবরের কাগজ কেবল খারাপ খবরই দেয় না, আর খারাপ খবর হ'লে আমি তোর কাছে বলতে আসতুম না! আমি তো তোর শত্রু নই বোন! গোবিন্ ভালোই

আছে।"

কমলা কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে আবার ব'সে পড়লেন। কিন্তু তবু তাঁর বুকের ধুক্‌পুকুনি ঘুচ্‌ল না। বললেন, "খবরের কাগজে খোকনের কথা কি লিখেছে দিদি?"

—"গোবিন্‌ নাকি একটা মস্ত-বড় চোরকে ধরেছে। সে চোরটা রেলগাড়িতে কেবল গোবিনেরই পকেট থেকে একশো-পঁচিশ টাকা চুরি করে নি, কোন্‌ ব্যাঙ্ক থেকে নাকি পাঁচ লাখ টাকা চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল (তোমরা বুঝতেই পারছ, পঞ্চান্নো হাজার লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে পাঁচ লক্ষে!), তোমার গোবিন্‌ বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে ধ'রে ফেলেছে! তাই পুলিশের কাছ থেকে গোবিন্‌ বখশিস পেয়েছে পাঁচ হাজার টাকা! বুঝলে বোন? এ কি খারাপ খবর?"

কমলা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "না দিদি, এটা খুব ভালো খবরও নয়। একটা চোর ধ'রে খোকন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে চোর ধরতে বলেছিল? এই রকম সব বোকামি করাই তার স্বভাব, সেই জন্যেই তো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।"

—"কিন্তু ভেবে ভাখ বোন, একটা চোর ধ'রে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া কি চারটি-খানিক কথা! পাঁচ হাজার টা—কা!"

কমলা এইবারে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দিদি আমার কাছে বার-বার তুমি ঐ পাঁচ হাজার টাকার কথা তুলো না। আমার খোকনের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি!"

—"পাঁচ হাজার টাকা তো খুব বেশি টাকা বোন, লোকে এক হাজার টাকা পাবার জন্যেই মাথা খুঁড়ে মরে!"

—"যারা মরে তারা মরুক্‌! আমার কাছে টাকা আগে, না খোকন আগে? চোর যদি খোকনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিত? চোর কী না পারে? মাগো, ভাবতেও প্রাণ আমার কেঁপে উঠছে!"

—"ছি ছি, অমন অলক্ষুণে কথা ভাবিস্‌ নে বোন, ভাবিস্‌ নে। গোবিন্‌

মস্ত বাহাদুরি করেছে ব'লেই ছাপার হরফে তার নাম উঠেছে!"

কমলা মাথা নেড়ে বললেন, "খোকন আমার কোলেই লুকিয়ে থাকুক্ দিদি, ছাপার হরপে আমি তার নাম দেখতে চাই না। আজকেই আমি কলকাতায় যাব, খোকনের কাছে না গেলে প্রাণে আমি আর শান্তি পাব না!"

ঠিক সেই সময়েই বাইরে সদর-দরজার কাছ থেকে শোনা গেল—"টেলিগ্রাম। কমলা দেবীর নামে টেলিগ্রাম।"

তোমরা বুঝতেই পারছ, এ টেলিগ্রাম কলকাতা থেকে, কমলাকে যাবার জন্যে জরুরি অনুরোধ বহন ক'রে এনেছে।

সেই দিনেই কমলা কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু রেলগাড়িতে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল আরো বড় বিস্ময়।

কলকাতায় গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত কমলার বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করা বন্ধ হবে ব'লে মনে হয় না। থেকে থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, রেলগাড়িগুলো তাঁকে জব্দ করবার জন্যে যেন ষড়যন্ত্র ক'রেই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছে না—যেন তিনি নিচে নামলে গাড়িকে ঠেলে এর-চেয়ে শীঘ্র দৌড়ে নিয়ে যেতে পারেন।

গাড়ির দু-পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের যে সব থাম বোঁ বোঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে, কমলা খানিকক্ষণ ধ'রে সেইগুলো গুণতে লাগলেন। তারপর গুণতে আর ভালো লাগল না, তিনি গাড়ির ভিতর দিকে ফিরে বসলেন।

ঠিক সুমুখের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ দু-হাতে বিছিয়ে ধ'রে আগ্রহভরে কি পাঠ করছিলেন।

হঠাৎ কমলার চোখ পড়ল কাগজের উপরে। তার পরেই সাঁৎ ক'রে হাত চালিয়ে ফস্ করে, তিনি কাগজখানা কেড়ে নিলেন ভদ্রলোকের হাত থেকে!

বৃদ্ধ ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি কোন পাগলীর খপ্পরে পড়েছেন—তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিষম আতঙ্কের চিহ্ন। চলন্ত ট্রেনে পাগল বা

পাগলীর সঙ্গে এক কামরায় থাকা বড় সোজা কথা নয়।

তোতলার মতন থেমে থেমে তিনি বললেন, "কি কি কি বাছা? কি চাও?"

খবরের কাগজের মাঝখানে একখানা ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে কমলা উত্তেজিত স্বরে বললেন, "এ যে আমার খোকনের ছবি!"

—"খোকন? ও, বুঝেছি।" ভদ্রলোক আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "তাহ'লে আপনিই হচ্ছেন মাষ্টার গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মা? সোনার টুকরো ছেলে! অমন ছেলের মা হওয়াও ভাগ্যের কথা!"

কমলা বললেন, "আপনার মত আর সকলেও খোকনকে বোধহয় আকাশে তুলছে! ভাগ্য! অমন ভাগ্য আমি চাই না!" গজ্ গজ্ করতে করতে তিনি খবরের কাগজখানা পড়তে শুরু ক'রে দিলেন।

গোড়াতেই বড় বড় হরফে শিরোনামা:

খোকা-ডিটেক্‌টিভের কীর্তি!!!
দেড়-শো খোকার কাণ্ড!!

তারপর গোবিন্দ কালিপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে-সব ঘটনার পর ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তারই উজ্জ্বল বর্ণনা!

কমলার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তাঁর হাতের কাগজখানা কাঁপতে লাগল থর্ থর্ ক'রে!

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "সঙ্গে কেউ না থাকলেই খোকন এমনি সব কাণ্ড ক'রে বসে! আমি এমন পৈ পৈ ক'রে বলে দিলুম টাকাগুলো সাবধানে রাখতে! তা সে কিনা অম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। অত টাকা হারালে আমার কি দশা হ'ত।"

বৃদ্ধ বললেন, "মা, আপনি মিছেই ছেলেকে দোষ দিচ্ছেন। কে বলতে পারে, চোর তাকে চকোলেটের সঙ্গে ঘুম-পাড়ানি ওষুধ খেতে দিয়েছিল কিনা! এমন তো হামেশাই হয়। কিন্তু ঐ খোকার দল চোর ধরবার যে কায়দা দেখিয়েছে আশ্চর্য, তা আশ্চর্য!"

ছেলের গৌরবে গর্বিত স্বরে কমলা বললেন, "হাঁ এ-কথা মানি।

চালাক ছেলে বটে আমার খোকন। ইস্কুলে কি লেখাপড়ায়, কি খেলা-ধুলোয় তার চেয়ে ভালো ছেলে আর নেই। কিন্তু কি দরকার বাপু চোর-ধরায়? ভেবে দেখুন তো, যদি কোন বিপদ আপদ হ'ত? আমার খোকন যে বেঁচেছে, এই ঢের! সে যদি আবার কখনো একলা রেল-গাড়িতে চড়ে, তাহ'লে ভয়েই আমি মারা পড়ব। আর কখনো তাকে একলা ছাড়ব না!"

বৃদ্ধ বললেন, "কাগজে তার ছবি কি ঠিক উঠেছে?"

—"হ্যাঁ, খোকনকে ঠিক এমনটি দেখতে। সে কি বেশ সুশ্রী নয়!"

—"সুন্দর চেহারা।"

—"কিন্তু তার জামার ছিরি দেখুন একবার! লণ্ডভণ্ড, ভাঁজ-পড়া! জামা-কাপড়ের দিকে তার একেবারেই নজর নেই!"

—"এই যদি তার একমাত্র দোষ হয়—"

বাধা দিয়ে কমলা বললেন, "না, না! তা যদি বলেন তবে সত্যি কথা বলতে কি, খোকনের কোন দোষই আমি দেখতে পাই না! এমন ছেলে কি হয়!"

কাগজখানি কমলাকেই সমর্পণ ক'রে বুড়ো ভদ্রলোকটি পরের স্টেশনে নেমে গেলেন।

কমলা বার বার পড়তে লাগলেন তাঁর খোকনের কীর্তি-কাহিনী। যত বার পড়েন, আবার পড়তে সাধ হয়। ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে থামল কাগজখানি তখন তিনি প'ড়ে ফেলেছেন এগারো বার।

স্টেশনে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল গোবিন্দ। সে দৌড়ে গিয়ে দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ধ'রে সগর্বে বললে, "মা, তোমার হাতেও যে কাগজ দেখছি। তা'হলে জেনেছ?"

দুই হাতে গোবিন্দের দুই গাল টিপে ধ'রে কমলা বললেন, "ওঃ দেমাক যে আর ধরছে না!"

—"মাগো, মা! তোমাকে পেয়ে আমার যে কী আহ্লাদ হচ্ছে!"

—"চোর ধরতে গিয়ে পোশাকের যা দশা করেছ!"

মা খুশি হবেন ব'লে গোবিন্দ তার নীলরঙের পোশাক প'রেই স্টেশনে গিয়েছিল। এ পোশাকটি কমলার ভারি পছন্দসই।

সে বললে, "ভাবছ কেন মা, আমি না হয় এবার আন্‌কোরা নতুন পোশাক পরব।"

—"কে দেবে শুনি?"

—"একজন দোকানদার।"

—"দোকানদার!"

—"হ্যাঁ মা, দোকানদার। তার পোশাকের দোকান। সে আমাকে, প্রফেসরকে আর ঘণ্টুকে এক এক স্যুট পোশাক উপহার দিতে চায়। তারপর নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে—'বালক-গোয়েন্দারা কেবল আমাদের দোকান থেকেই পোশাক কেনে।' তার বিশ্বাস তাহলে দেশের সব ছেলেই ঐ দোকানের পোশাক কেনবার জন্যে আবদার ধরবে। আজকাল আমরা খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছি কিনা! বুঝেছ মা?"

—"বুঝেছি বাছা, বুঝেছি।"

—"কিন্তু আমরা স্থির করেছি, ও-উপহার নেব না। আমাদের নাম নিয়ে এত হৈ-চৈ আমরা পছন্দ করি না। বুড়ো বুড়ো লোকেরা এ-সব ব্যাপারে বোকামি করতে পারে, কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ হ'লেও তাদের মতন বোকা নই!"

—"বাপরে, কি বুদ্ধিমান!"

—"এইবারে আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে চল।"

—"তারা আবার কোথায় রে?"

—"আজ তুমি আসবে ব'লে মাসীর বাড়িতে তাদের নেমন্তন্ন করেছি। চল।"

বোনের বাড়িতে ঢুকে কমলার মনে হ'ল, সেখানে যেন হুলুস্থুল কাণ্ড উপস্থিত।

খাবার ঘরটার ভিতরে পিল্ পিল্ করছে ছেলের পাল। কেউ হো

হো হো ক'রে হাস্‌ছে, কেউ চোঁ চোঁ শব্দে চায়ে চুমুক মারছে, কেউ সশব্দে ডিস ভেঙে ফেলছে, কেউ টেবিল চাপড়ে, কেউ হাততালি দিয়ে এবং কেউ বা পিরিচে পেয়ালা ঠুকে বাদ্যধ্বনি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। কেউ ধুপ-ধাপ্‌ লাফাচ্ছে—সে নাকি নৃত্য। কেউ প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে—সে নাকি গান। কেউ ক্রমাগত ডিগবাজি খাচ্ছে—সে নাকি আনন্দের চূড়ান্ত।

এবং তারই ভিতর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছুটোছুটি করছে কুমারী নমিতা সেন, হাতে নিয়ে টাটকা কেকের ডালা।

নমিতার মা হাসিমুখে টেবিলের উপরে সাজিয়ে দিচ্ছেন ফলের থালা।

এক কোণে সোফায় ব'সে দিদিমা—তাঁর ফোক্‌লা মুখে হাসির বাহার। কিন্তু ফোক্‌লা হ'লে কি হয়, দিদিমার বয়স যেন আজ দশ বছর ক'মে গেছে।

আর ঘণ্টুর মোটর-হর্ন। তোমরা কেউ যেন ভেব না, আজকের দিনে সে বোবা হয়ে আছে।

নমস্কার, কুশল প্রশ্ন, আলাপ-অভ্যর্থনা এবং তারপর ভোজ ও গোলমালের পালা শেষ হ'ল।

তারপর দিদিমা তাঁর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন, "শোনো নাতির দল! এইবারে আমি দুটো কথা বলব। ভেব না, তোমরা ভারি চালাক। সবাই আহা-মরি ক'রে তোমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের বাহবা দেব না—আমি তোমাদের বাহবা দেব না।"

ছেলের দল একেবারে চুপ। এমন কি ঘণ্টু পর্যন্ত তার মোটর-হর্ন লুকিয়ে ফেললে।

"শোনো। দেড়-শো ছেলে মিলে একটা চোরকে তাড়া ক'রে ধরতে পারা আমি মস্ত কীর্তি ব'লে মনে করি না। শুনে কি নাতিদের রাগ হচ্ছে? কিন্তু তোমাদের দলে এমন একজন আছে, যে অনায়াসেই এই মজার চোর-ধরা খেলায় যোগ দিয়ে তোমাদের মতই নাম কিনতে পারত। চাকরের উর্দি প'রে সেও নিতে পারত বাহাদুরি। কিন্তু সে তা না ক'রে বাড়ির ভিতর চুপ ক'রে বসেছিল—তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল ব'লে।"

সবাই ক্ষুদে মঙ্গলের দিকে ফিরে তাকালে—লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল তার ছোট্ট মুখখানি।

—"হ্যাঁ, আমি মঙ্গলের কথাই বলছি। পুরো দুদিন ঘরের কোণে টেলিফোন ছেড়ে সে নড়তে পারে নি। কারণ সে জানত, তার কর্তব্য কি? এ কর্তব্যে মজা নেই, তবু কর্তব্য হচ্ছে কর্তব্য! আশ্চর্য তার কর্তব্যপরায়ণতা, আশ্চর্য। মঙ্গল তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সেই-ই হচ্ছে আসল বাহাদুর।"

ছেলের দল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, নমিতা ছুটে গিয়ে মঙ্গলের হাত ধরলে।

সবাই চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "জয় মঙ্গলবারের জয়! হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে!"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এ গল্পের আসল কথা কি

রাত্রিবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মাঝের-ঘরে এসে বসেছে। প্রফেসর ও তার দলবল তখন বিদায় নিয়েছে।

গোবিন্দের মেসো চন্দবাবু লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট বার করে কমলার হাতে দিয়ে বললেন, "টাকাগুলো গোবিন্দের নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখো।"

কমলা বললেন, "তাই রাখব।"

গোবিন্দ বললে, "উঁহু, আগে মায়ের জন্যে একটি ভালো শেলাইয়ের কল আর একখানি দামী কাশ্মীরী শাল কিনতে হবে। টাকা যখন আমার, তখন টাকা নিয়ে আমি যা খুশি করব।"

চন্দ্রবাবু বললেন, "না, তা তুমি পারো না। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার মা যা বলবেন তাই হবে।"

বাবার দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে নমিতা বললে, "বা-রে! মাকে উপহার দিতে পারলে গোবিন্দা কত খুশি হবে এটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন বাবা? বড়রা ভারি অবুঝ তো।"

দিদিমা বললেন, "ঠিক কথা। কমলাকে নতুন শেলাইয়ের কল আর শাল কিনে দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু বাকী সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে, না গোবিন্দ?"

—"তা থাক। কি বল মা?"

কমলা বললেন, "হ্যাঁ গো আমার বড়লোক ছেলে! যা ধরেছ, ছাড়বে না তো।"

গোবিন্দ বললে, "তাহ'লে কাল সকালেই আমরা বাজারে বেরুব।

নমু, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো ?"

নমিতা বললে, "তুমি কি ভাবছ তোমরা বাজারে বেড়াতে বেরুবে, আমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে মশা মারব কি মাছি ধরব ? হ্যাঁ, আমিও যাব। আর শোন গো মাসী, গোবিন্‌দাকে একখানা সাইকেলও কিনে দিও, নইলে ও আমার সাইকেলখানা ভেঙে গুঁড়ো না ক'রে ছাড়বে না।"

কমলা ব্যস্ত ভাবে বললেন, "খোকন, তুমি কি নমুর সাইকেলের কোন ক্ষতি করেছ ?"

গোবিন্দ বললে, "না মা, ও বাঁদ্‌রীর বাজে কথা শোনো কেন ?"

নমিতা ভুরু কুঁচকে বললে, "আমি বাঁদ্‌রী, না তুমি বাঁদর ? ফের যদি আমার সাইকেলে হাত দাও, তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার দস্তুরমত আড়ি। এ-জন্মের মতো তোমাতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে, বুঝলে।"

গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে দুদিকের পকেটে দুই হাত পুরে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "কি বল্‌ব নমি, একে তুই মেয়েমানুষ তায় রোগা-টিক্‌টিকি! নইলে তোর সঙ্গে আজ আমি ঘুষি লড়্‌তুম। যাক্‌, আজকের দিনে আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজী নই। টাকা আমার, আমি সাইকেল কিনি আর না কিনি তা নিয়ে অন্য কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

দিদিমা বললেন, "ঝগড়া করিস্‌-নে—ঝগড়া করিস্‌-নে, তার চেয়ে দুজনেই দুজনের চোখ খুব্‌লে নে।"

তারপর আবার এ-কয়দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'ল।

মাসী বিমলা বললেন, "দিদি, তুমি তো কেবল মন্দ দিকটাই দেখছ। এ-ব্যাপারে ভালো দিকও কি নেই ?"

গোবিন্দ বললে, "অবশ্যই আছে মাসীমা। আমি কি শিক্ষা পেয়েছি জানো ?—কখন কারুকে বিশ্বাস কোরো না।"

কমলা বললেন, "আমিও একটা শিক্ষা পেয়েছি। শিশুদের একলা বেড়াতে যেতে দেওয়া উচিত নয়।"

দিদিমা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "বাজে কথা আমি পছন্দ করি না—বাজে কথা আমি পছন্দ করি না।"

চেয়ারের উপর ঘোড়ার মত ব'সে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে নমিতা গানের সুরে বললে, "বাজে কথা—বাজে কথা—বাজে কথা।"

বিমলা বললেন, "হ্যাঁ মা, তুমি কি বলতে চাও, এ-ব্যাপারে শেখবার কিছুই নেই?"

—"নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই আছে।"

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কি, কি?"

দিদিমা ডানহাতের তর্জনী তুলে বললেন, "টাকা সর্বদাই পাঠাবে মনি-অর্ডার ক'রে।"

চেয়ার-ঘোড়ায় চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নমিতা ব'লে উঠল, "জয় মনি-অর্ডারের জয়।"

●

মোহন মেলা

বৌনির দিনে

দাঁতের ডাক্তার নীলমণি বড় সাধে ডিসপেনসারি খুলে বসল। কিন্তু হায় রে পোড়াকপাল, আজ ছ' মাসের মধ্যে একটিও রুগীর টিকি দেখা গেল না।

অথচ তার অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। সাজানো ডাক্তারখানা, চকচকে ইস্পাতের যন্ত্র, কাঁচ-ঢাকা জানলায় বড় বড় দাঁত-ওয়ালা পাথরের মুখ, এ-সমস্তই ছিল দস্তুরমত। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিট্‌ফাট্ সায়েব সেজে সেখানে এসে গম্ভীর মুখে বসে থাকত নীলমণি। কিন্তু তবু দুষ্টু রুগীর সাড়া পাওয়া যায় না।

শেষটা নীলমণি যখন হতাশ হয়ে দাঁতের ডাক্তারি ছেড়ে ঘোড়ার ডাক্তারি ধরবে ব'লে মনে করছে, তখন হঠাৎ একদিন দেখতে পেলে যে, রাস্তার ওপারে একটি রোগাপানা লোক একখানা বাঁধানো খাতা-হাতে দাঁড়িয়ে, একদৃষ্টিতে তার ডাক্তারখানার দিকে তাকিয়ে আছে।

নীলমণি দেখেই বুঝে নিলে যে, লোকটা নিশ্চয়ই দাঁতের ব্যামোয় ভুগছে—কেবল ভয়ে ডাক্তারখানার মধ্যে ঢুকতে পারছে না।

নীলমণি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ডাক দিলে, "আসুন মশাই, আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক!"

লোকটি আস্তে আস্তে ডাক্তারখানার ভিতরে এল।

নীলমণি বললে, "বসুন—বসুন, ঐ চেয়ারখানায় বসুন। হাতের খাতাখানা ঐ টেবিলের ওপরে রেখে দিন। আচ্ছা, একবার হাঁ করুন তো, আপনার দাঁতগুলো দেখি।"

আগন্তুক হাঁ করলে কেমন যেন নারাজভাবে।

তার মুখের ভিতরটায় একবার উঁকি মেরে দেখেই নীলমণি চেঁচিয়ে

ব'লে উঠল, "ওরে বাস্‌রে, কি ভয়ানক!"

আগন্তুক চমকে বললে, "কেন মশাই, কি হয়েছে?"

নীলমণি বললে, "আর কি, যা ভেবেছি তাই হয়েছে। আপনার ওপর-পাটির দাঁতগুলো সব খারাপ! এখনি না তুলে দিলে নয়!"

আগন্তুক লাফিয়ে উঠে বললে, "ও বাবা, বলেন কি?"

নীলমণির ভয় হোলো, হাতে এসেও খদ্দের বুঝি চম্পট দেয়! সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল, "দাঁত তোলবার নামে ভয় পাচ্ছেন কেন? মুখের ভেতরে পচা দাঁত থাকলে শরীরে নানান ব্যাধি হয়, তা জানেন?"

আগন্তুক বললে, "হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু—"

নীলমণি বাধা দিয়ে বললে, "এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই মশাই! রামচরণ, এদিকে এস তো শীগ্‌গির!"

নীলমণির ষণ্ডা চাকর রামচরণ এগিয়ে এসে কোমর বেঁধে দাঁড়াল।

নীলমণি জামার আস্তিন গুটোতে গুটোতে বললে, "আসুন, আপনার ওপরপাটির দাঁতগুলো খুব আস্তে আস্তে তুলে দি। চুপ ক'রে ব'সে থাকুন, যেন—"

আগন্তুক ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু মশাই, আগে আমার কথা শুনুন, তারপর—"

নীলমণি চট ক'রে আগন্তুকের মুখ চেপে ধরলে,—তার ভয় হোলো, পাছে সে ফস্ ক'রে "দাঁত তোলাব না" ব'লে ফেলে! ডাক্তারির এই বৌনির দিনে প্রথম রুগীকে নীলমণি কিছুতেই স'রে পড়বার অবকাশ দিলে না। সে ইশারা করবামাত্রই জোয়ান রামচরণ আগন্তুককে চেয়ারের ওপরে দুইহাতে চেপে ধরলে—প্রায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে আর কি!

নীলমণি তাড়াতাড়ি কি-একটা যন্ত্র দিয়ে রুগীর মুখের মধ্যে পুরে দিলে, তার মুখটা মরা মাছের মুখের মত হাঁ হয়ে রইল—সে আর কোন কথা কইতে পারলে না,—খালি চোখ কপালে তুলে গোঁ গোঁ ক'রে গ্যাঙাতে আর কলে-পড়া ইঁদুরের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

নীলমণি একটা সাঁড়াশি বাগিয়ে ধ'রে বললে, "রামচরণ, আরো

জোরে চেপে ধর্—হুঁ, আরো জোরে! কোন ভয় নেই মশাই, আমি একটা একটা ক'রে পচা দাঁতগুলো এখনি টপাটপ উপ্ড়ে ফেলব। এই যে—উঃ, আপনার দাঁত কি শক্ত—মারি কাটি জোয়ান—হেঁইও! ব্যাস্—একটা দাঁত তুলে ফেলেছি! এইবার আর একটা! ওকি মশাই, কাঁদছেন কেন—রামচরণ, আরো জোরে চেপে ধর্—হুঁ, মারি কাটি জোয়ান—হেঁইও!—"

এম্‌নিভাবে একে একে উপর পাটির সব দাঁত সাঁড়াশির টানে চারা-মূলোর মত উপড়ে ফেলে নীলমণি রুগীকে ছেড়ে দিলে।

রুগীর সর্বাঙ্গ তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ সে আর একটাও কথা কইতে পারলে না—চেয়ার থেকে মাটির উপরে ট'লে পড়ে অজ্ঞান আচ্ছন্নের মতন হয়ে রইল।

নীলমণি একগাল হেসে বললে, "ব্যাস, আর আপনার দাঁতের ব্যথা হবে না। এইবার আপনার দাঁতগুলো বাঁধিয়ে নিন!"

রুগী লাফিয়ে উঠে রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, "এইবার দাঁত বাঁধাব, না, তোমার মুণ্ড চিবিয়ে খাব! হতভাগা, রাস্কেল, হাতুড়ে ডাক্তার!"

নীলমণি বললে, "ওকি মশাই, খামকা গালাগাল দিচ্ছেন কেন?"

রুগী বললে, "এই চললুম আমি থানায়। তোমাকে ছ-মাস জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব!"

নীলমণি বললে, "কলিকালে লোকের ভালো করলে মন্দ হয়। কি দোষে আমি জেল খাটব মশাই? আমি ডাক্তার, আপনার দাঁতের ব্যায়রামের চিকিৎসা করেছি বৈ তো নয়!"

রুগী মুখ খিঁচিয়ে বললে, "চিকিৎসা করেছ, না আমার সর্বনাশ করেছ! আমার কোন-পুরুষে দাঁতের ব্যথা নেই—তুমি আমার তাজা ভালো দাঁতগুলো সব জোর ক'রে উপড়ে নিয়েছ! ঐ খাতাখানা নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম বারোয়ারির চাঁদা আদায় করতে!"

—"বারোয়ারির চাঁদা আদায় করতে—অ্যাঁ—বলেন কি! কই,

আপনি আগে তো সে কথা বললেন না ?”

—“তুমি আমাকে বলতে দিলে কৈ—আমার মুখ চেপে ধ’রে এখন আবার সাধু সাজা হচ্ছে!—উহু, বাপ্‌রে—কট্‌কট্‌—ঝন্‌ঝন্‌—প্রাণ যে যায় রে বাবা!”

বৌনির দিনে এ কি মুশকিল! নীলমণি মাথায় হাত দিয়ে ব’সে পড়ল।

হট্টমালার ষষ্ঠিবাড়ি

হট্টমালার ছোট্ট দেশে অট্ট-গোলের রান্না
আসল ‘সোনার পাথর-বাটি’ দৌড়ে গিয়ে আন্ না।
বারো-‘হন্দী’ কাঁকুড়ের ঐ বীচির বহর মস্ত,
মাপ্‌লে হবে একেবারে পাকা তেরো হস্ত।
‘ঘণ্ট’ খাবে ? ঘণ্ট তারি হচ্ছে ওরে রন্ধন,
খোকন, তুমি বোক্‌নো বাজাও, আর কোরো না ক্রন্দন।
আস্তাবলে টাট্টু ঘোড়া প্রত্যহ দ্যায় ডিম্ব,
পট্ট-বাঁশের ‘ষষ্টি-মধু’,—নয় তো তেঁত নিম্ব।
‘বুনো-ওল’ আর ‘বাঘা-তেঁতুল’ ভীষণ-রকম মিষ্টি,—
‘ছাই-ভস্মের’ খেচরান্নে নোলায় ঝরে বিষ্টি।
‘দগ্ধকচু’র মোরব্বাতে ভুর্-ভুরে কি গন্ধ,
গব্‌গবিয়ে গিল্‌ছে গবা চক্ষু ক’রে বন্ধ।
‘আচাভূয়ার বোম্বা-চাকে’ ঝর্‌ছে মধুর বিন্দুই,
ছুচুন্দরের ছ্যাঁচড়া খেলে রয় না ক্ষিদে দিন-দুই।
গাছপাকা এক কাঁটাল দিয়ে হয় খাসা আমসত্ত্ব,
মাগ্‌না পেয়ে টাক্‌না দিলেই বুঁজবে ভুঁড়ির গর্ত্ত।

'উড়ম্বরের-পুষ্প'-ভাজা খাচ্ছে খ্যাঁদা গোষ্ঠ,
কোঁৎকোঁতিয়ে ঢোঁক্ গিলে আর ফাঁক্ ক'রে দুই ওষ্ঠ।
'সর্ষেফুলে'র নাম শুনেছ, চেকেছ তার খাট্টা ?
এগিয়ে এসে খাও তবে কিল তিনশো-সাড়ে-আট্‌টা।
কাঁটা-মন্‌সার দুগ্ধ ঢেলে হচ্ছে তোফা রাব্‌ড়ী,
উচ্চিংড়ের মালাই-কারি না খেলে হ্যায় দাব্‌ড়ি।
'ঘেঁচুর চাট্‌নি' চাটিয়ে যখন বলবে খেতে 'খাবিং',
তখন কিন্তু পালিয়ে এস লাগিয়ে মুখে 'চাবিং'।

বাদ্‌লা

হো হোঃ হো হোঃ! বিষ্টি ঝরে,
জলের ছাটে ছিষ্টি ভরে!
কর্‌লে ফুটো আকাশটাকে,
বাঁশবাগানে বাতাস ডাকে,

মেঘ মাতিয়ে সাজল বাদল,
দুম্‌দুমিয়ে বাজল মাদল,
কোন্ সাপুড়ে ধম্‌কে ওঠে,
বিজ্‌লি-সাপ ঐ চম্‌কে ছোটে।

তাল-পুকুরের রাণায় রাণায়,
জল উঠেছে কাণায় কাণায়,
একসা হোলো খাল-বিলেতে,
লাফায় মাছের পাল ঝিলেতে।

বান ডেকেছে ষাঁড়াষাঁড়ি,
রোদ-মেঘেতে আড়াআড়ি,
দিন-দুপুরেই রাত করেছে,
আব্‌ছায়াতে আঁৎ ভরেছে।

মা, তোর খোকার দিস্‌ খুলে সাজ,
কেউ যাবে না ইস্কুলে আজ,
যেমনি ছুটি সূয্যি-মামার,
তেমনি ছুটি বুঝছি আমার।

বাগিয়ে ধ'রে মাথার ছাতায়,
নৌকো গ'ড়ে পাতার খাতায়,
কি মজা ভাই, ভাসাই যদি—
বাইবে নিজে কাঁসাই নদী।

নৌকোখানি ছুটবে দুলে,
কাগুজে পাল উঠবে ফুলে,
কঙ্কাবতী ডাকবে তারে—
ড্যাঙাতে আর থাকবে না রে।

ক্ষীর-সাগরে খানিক গিয়ে,
সাত-রাজার-ধন মাণিক নিয়ে
নৌকো আবার ভাসবে ধীরে,
আমার কাছে আসবে ফিরে।

মেঘ্‌লা হাওয়ার ঝুমকুড়িতে,
আজকে কি ভাই ঘুমপুরীতে,
রাজার মেয়ে উঠল ব'সে,
নয়ন-কমল ফুট্‌ল ও সে।

তেপান্তরের স্যাঁত্‌লা মাঠে,
রাজার ছেলে একলা হাঁটে।
হেথায় মেয়ে—হোথায় ছেলে,
প্রাণ এসেছে কোথায় ফেলে।

কাজ্‌লা মেঘের বিষ্টি ঝরে—
ছিষ্টি কালোকিষ্টি করে।
ময়ূর ডাকে বনের ভেতর,
সাধ জাগিয়ে মনেতে মোর,

পদ্মমধু কে খাবি আজ—
ফুলের মেলায় যে যাবি, সাজ্‌!
টাপুর-টুপুর বিষ্টি-ঝরা,
জলছবি ত্থাখ্‌, দিষ্টি-ভরা!

ঠাকুমাগো! গল্প যা-হয়
শোনাও—তবে অল্প না-হয়।
সাতটি চাঁপার বোনের কথা,
দুয়োরাণীর মনের ব্যথা।

জপের মালা আজ্‌কে তোলো,
ঠাকুরঘরের কাজ্‌কে ভোলো।
গল্প বল মিষ্টি ক'রে—
ঝাপ্‌সা আলোয় বিষ্টি ঝরে।

বুদ্ধদেবের বুদ্ধি

(জাতকের গল্প)

বুদ্ধদেব এই পৃথিবীতে অনেকবার জন্মেছিলেন—কখনো মানুষ আবার কখনো বা পশু-পক্ষী রূপে।

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা।

বারাণসী-ধামে রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন সিংহাসনে। শহরে একটি গরিব লোক ছিল, পাথর কেটে তার দিন চলত। বুদ্ধদেব তার ছেলে হয়ে জন্মালেন। বড় হয়ে তিনিও বাপের ব্যবসাই ধরলেন।

একবার একটি পোড়ো গাঁয়ের ভিতরে বুদ্ধদেব পাথর কাটতে গেলেন। সে গাঁয়ে কোন লোক ছিল না, ঘর-বাড়ি সব ভেঙে পড়েছে, পথে-ঘাটে জঙ্গল জমেছে।

অনেকদিন আগে এই গাঁয়ে এক সওদাগর ছিল, তার এত টাকা যে, গুণে ওঠা ভার! সওদাগর মারা গেলে পর তার বৌ সব টাকার মালিক হ'ল। কিন্তু সে এমন কিপটে ছিল যে, একটি পয়সাও খরচ করতে পারত না। এই টাকা আগ্‌লাতে আগ্‌লাতে সওদাগর-বৌও মারা পড়ল। তার-পর সে ইঁদুর হয়ে জ'ন্মে আবার টাকার উপর পাহারা দিতে লাগল।

সওদাগরের টাকা যেখানে লুকানো ছিল, বুদ্ধদেব তার কাছে ব'সেই রোজ নিজের মনে পাথর কাটতে থাকেন। ইঁদুরও রোজ তফাতে ব'সে ব'সে তাঁকে দেখে আর ভাবে, এ গরিব বেচারী জানে না যে, এর হাতের কাছেই আছে সাত রাজার ধনের ভাণ্ডার।

এইভাবে দিন যায়। ইঁদুর যখন দেখলে বুদ্ধদেব বড় শান্তশিষ্ট লোক, কারুর উপরে অত্যাচার করেন না, তখন সে তাঁর কাছে এসে বসতে শুরু করল

তারপর একদিন সে মনে মনে ভাবতে লাগল, আমার এত টাকা, কিন্তু হায়, এ টাকা তো কোন কাজেই লাগছে না। মিছিমিছি টাকায় ছাতা ধরিয়ে লাভ কি ? কবে ম'রে যাব তার ঠিক নেই, তার চেয়ে এই বেলা ঐ ভালো মানুষটির সঙ্গে কিছুদিন সুখ ভোগ ক'রে নি।

ইঁদুর একটি টাকা মুখে ক'রে বুদ্ধদেবের কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধদেব তাকে দেখে বললেন, "ইঁদুর-ভায়া যে! এখানে কি মনে ক'রে ?"

ইঁদুর বললে, "মিতে, এই টাকাটা নিয়ে বাজারে যাও। কিছু মাংস কিনে আনো, দু'জনে মিলে ভাগাভাগি ক'রে খাব।"

বুদ্ধদেব বাজার থেকে মাংস কিনে আনলেন। ইঁদুর তাঁর সঙ্গে সেই মাংস ভাগাভাগি ক'রে খেলে।

এমনি রোজই ইঁদুর একটি ক'রে টাকা দেয়, পরে বুদ্ধদেব মাংস কিনে আনেন। খেয়ে-দেয়ে দুজনেরই শরীর বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

একদিন ইঁদুর নিজের ঘরে গিয়ে ব'সে মাংস খাচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে এক বিড়াল এসে হাজির। ইঁদুরকে দেখেই সে কপ্ ক'রে ধরে ফেললে।

ইঁদুর কেঁদে বললে, "ভাই বাঘের মাসী, আমাকে মের না, তোমার পায়ে পড়ি!"

বিড়াল বললে, "আলবৎ তোকে মারব—ক্ষিধের চোটে পেট আমার চুঁই-চুঁই করছে!"

ইঁদুর বললে, "ভাই বাঘের মাসী, এক দিন আমার একরত্তি দেহ খেয়ে তোমার ক্ষিদে মিটবে না। তার চেয়ে আমাকে যদি ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে রোজ মাংস খাওয়াব!"

বিড়াল বললে, "আচ্ছা, সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু মাংস না পেলেই আমি তোর ঘাড় মট্‌কাব, তা কিন্তু আগে থেকেই ব'লে রাখছি।"

ইঁদুর রোজই বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস দিতে লাগল।

দিন-কয়েক পরে দ্বিতীয় এক বিড়াল এসে ইঁদুরকে কপ্ ক'রে ধ'রে ফেললে। মাংসের লোভ দেখিয়ে ইঁদুর বেঁচে গেল সে-যাত্রাও।

ইঁদুর রোজই দুই বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস খাওয়াতে লাগল।

দিন কয়েক পরে তৃতীয় এক বিড়াল এসে ইঁদুরকে ফলার ক'রে ফেলে আর কি! মাংসের লোভ দেখিয়ে সে ছাড়ান পেলে সেবারেও।

ইঁদুর রোজই তিন বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস খাওয়াতে লাগল।

একদিন বুদ্ধদেব পাথর কাটছেন, ইঁদুর বিমর্ষের মত তাঁর পাশটিতে এসে বসল। তিন বিড়ালের জুলুমে ইঁদুরের নিজের ভাগে আর কিছু থাকে না। সে আবার রোগা হয়ে পড়েছে।

বুদ্ধদেব বললেন, "কিহে ইঁদুর-ভায়া, খাচ্ছ-দাচ্ছ তবু রোগা হয়ে পড়ছ কেন?"

ইঁদুর বললে, "দুঃখের কথা আর বল কেন? প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছি, এই ঢের!" সে বুদ্ধদেবের কাছে একে একে সব কথা খুলে বললে।

বুদ্ধদেব সব শুনে বললেন, "এর জন্যে আর ভাবনা কি ভায়া? রও, আমি তোমার উপায় ক'রে দিচ্ছি!"

তারপর একটি কাঁচের ঘর বানিয়ে বুদ্ধদেব আবার ইঁদুরকে বললেন, "এবার যখন বিড়াল আসবে, তুমি এই কাঁচের ঘরের ভেতরে ব'সে থেক।"

ইঁদুর কাঁচের ঘরের ভিতরে মজা ক'রে ব'সে আছে, এমন সময়ে প্রথম বিড়াল এসে হাজির। এসেই বললে, "কি লো চেরন-দাঁতী, আমার মাংস-টাংস দেখতে পাচ্ছি না যে বড়?"

ইঁদুর বুক ফুলিয়ে বললে, "আয় আয় খ্যাঁদা-নাকী! মাংস তুই বাজার থেকে নিজে কিনে খে গে যা, আমার কাছে আর আবদার খাটবে না!"

বিড়াল কাঁচ চিনত না, ইঁদুর যে কাঁচের ঘরের ভিতরে আছে, তাও বুঝতে পারলে না, মহা ক্ষাপ্পা হয়ে সে ইঁদুরের ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে

যেই লাফ মারলে, অমনি কাঁচে মাথা ঠুকে তুললে পটল।

একটু পরেই দ্বিতীয় বিড়াল এসে বললে, "মাংস লে আও।"

ইঁদুর বললে, "ভারি সুখ যে, ভাগো হিয়াসে।"

বিড়াল রেগে বললে, "গোঁ—গোঁ—গর্‌র্‌র্ ফ্যাচ্"—তারপরেই লাফ মেরে কাঁচের ঘরের উপরে প'ড়ে মাথা ফেটে একেবারে তার দফা রফা!

দেখতে দেখতে তৃতীয় বিড়াল এসে বললে, "ওরে নেংটে ইঁদুর, আমার মাংস কোথায়?"

ইঁদুর বললে, "যা, আমাকে আর জ্বালাস্ নে, এখানে ফের গোল-মাল করলে দেব তোর ল্যাজ কামড়ে!"

বিড়াল বললে, "হু-উ-উ-উ—বটে?"—তারপরই কাঁচের ঘরের উপরে লাফ মেরে সাঙ্গ করলে লীলা খেলা।

তখন ইঁদুরের ফুর্তি দেখে কে। সে নাচতে নাচতে বাইরে এসে বুদ্ধদেবকে বললে, "মিতে, তুমি আমাকে বাঁচালে, আমিও তোমার কিছু উপকার করব।" এই ব'লে সে গুপ্তধনের ঠিকানা জানিয়ে দিলে।

বুদ্ধদেবকে সে জন্মে আর পাথর কাটতে হ'ল না! ইঁদুরকে নিয়ে তিনি শহরে গিয়ে মস্ত এক বাড়ি তৈরি ক'রে ফেললেন, তারপর দিন কাটাতে লাগলেন দুজনে মিলে পরম সুখে।

পালোয়ান প্যালারাম

হাঁপ ছেড়ে হুস্ হুস্ ভাঁজি ক'ষে ডম্বল,
খাসা আছি! হয়নাকো জ্বর, কাশি, অম্বল।
মহাবীর হব আমি, লেখা আছে কুষ্টিতে,
ক্ষ্যাপা হাতি কুপোকাৎ, এত জোর মুষ্টিতে।
আমাদের গুষ্টিতে একা আমি পালোয়ান—
শীতকালে ঘেমে মরি, চাইনাকো আলোয়ান।

টপাটপ্ ডন্ দিই, খপাখপ্ বৈঠক,
দৌড়েতে হারে রাণা প্রতাপের 'চৈতক' !
চড়িনাকো এনে দিলে 'ফিটন' কি 'ল্যাণ্ডো'ই,
হাঁটি দশ-বিশ ক্রোশ—কোথা লাগে স্যাণ্ডোই !
চোর-টোর আসে নাকো আমাদের রাস্তায়,
ভ্যারেণ্ডা ভেজে শুধু গুণ্ডারা ঘাস খায় !
মাস্টার মারে বটে বিষ্টু ও কেষ্টকে,
মোর কাছে হেসে বলে—'ভালোবাসি বেশ তোকে !'
সাঁতারেতে গাঙ্ পার—লাফে পার পর্বত,
তেষ্টাতে গিলি খালি বাদামের শরবত !
ভোরবেলা উঠে রোজ পাঁঠা গিলি আস্ত হে,
একমণ মাছ খেলে হয়নাকো দাস্ত হে !
পাঁচ হাঁড়ি দৈয়ে গুলে গুটি ত্রিশ মণ্ডা গো,
তার সাথে দাও যদি রুটি বিশ গণ্ডা গো,
ফাউ চাই সের-বারো বোঁদে, গজা, রস্‌করা,
তাইতেই ভরে পেট, ভেব না এ মস্করা !
পেটুক তো নই আমি ক্ষুধা মোর অল্পই,—
হাস্‌ছ যে ? ভাব্‌ছ কি এটা গাল-গল্পই ?
ফের হাসি, বেয়াদব ! আমি তবে রাগ্‌বই,
আখ্‌ড়ায় ছুটে গিয়ে 'বীর-মাটি' মাখ্‌বই,
তাল ঠুকে দেব হুঁ-হুঁ, হা-রে-রে-রে হুঙ্কার,
তাই শুনে, হাসবে যে মুখ হবে চুন তার !
হ'তে পারি আমি যাদু, রোগা, বেঁটে-খর্বুটে,
দিতে পারি তবু তোর ভিরকুটি ছরকুটে !
ক্রোধানল জ্বলে যদি, কিছুতেই ক্ষমা নয়,
অতিশয় তাড়াতাড়ি যাবে বাছা যমালয় !

কাঠুরের কপাল

জমিদার রত্নাকর সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে, এক মস্ত বড় গর্তে ঝুপ্ ক'রে প'ড়ে গেল।

যখন বাঘের উৎপাত বেশি হয়, কাঠুরেরা তখন বনের ভেতরে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখে। গর্তের মুখ খড়কুটো আর গাছের ডালপালায় ঢাকা থাকে, তার তলায় যে গর্ত আছে সেটা আর টের পাওয়া যায় না। বাঘেরা তখন সেই খড়কুটো আর ডালপালার উপর দিয়ে যেতে গেলেই হুড়মুড় ক'রে গর্তের ভেতরে প'ড়ে যায়, তারপর কাঠুরেরা এসে বাঘটাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে।

রত্নাকর মানুষ হয়েও দেখতে না পেয়ে এমনি এক গর্তের মধ্যে প'ড়ে গেছে। গর্তের ভেতরে—বাপ্‌রে, কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! যেন অমাবস্যার রাত্রি এসে সেখানে বাসা বেঁধেছে! তাকিয়ে দেখতেও গা শিউরে ওঠে!

খালি কি অন্ধকার? তাহ'লেও তো রক্ষে ছিল! অন্ধকারের ভেতরে যে আবার কতরকম ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে, তাও আর বলবার-কইবার নয়। ফোঁস ফোঁস,—কিচির-মিচির—হালুম-হুলুম—এমনি আরো কত কি!

ভয়ে রত্নাকরের প্রাণপক্ষী দস্তুরমত খাবি খেতে লাগল—কাঁদবে কি, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারলে না—একেবারে 'নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু' হয়ে আড়ষ্টের মত ব'সে রইল। সন্ধ্যে হোলো, রাত হোলো, আবার ভোর হোলো। রত্নাকর কিন্তু তখনো 'এই মরি, এই মরি' ক'রে ঠায় ব'সে আছে তো ব'সেই আছে—ছবিতে আঁকা মানুষের মত!

দিনের আলো গর্তের ভেতরে যেন ভয়েই সেঁধুতে পারলে না। কিন্তু গর্তের বাইরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

রত্নাকর চেঁচিয়ে ডাকলে, "ওহে ভাই, ওহে ভাই, দয়া ক'রে আমাকে বাঁচাও ভাই!"

বাইরে থেকে সাড়া এল—"কে ও!"

—"আমি জমিদার রত্নাকরবাবু, গর্তে প'ড়ে বেজায় কাবু হয়ে আছি। তুমি কে ভাই?"

—"আমি কাঠুরে।"

—"কাঠুরে হও আর যাইই হও, আগে আমাকে বাঁচাও! অনেক বকশিস্ দেব।"

—"বকশিস্ দাও তো ভালোই, না দিলেও তোমাকে বাঁচাব"—এই বলে কাঠুরে লম্বা একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, "এস, এই ডাল্ ধ'রে উঠে এস!"

ডাল ধ'রে উঠে এল—ওমা, মস্ত এক রূপী বাঁদর! রত্নাকরের মত সে-বেচারীও গর্তে প'ড়ে জব্দ হয়েছিল—এখন যাহাতক ডাল পাওয়া, তাহাতক উঠে আসা।

—"তবে কি ঐ বাঁদরটাই মানুষের মত গর্তের ভেতর থেকে আমার সঙ্গে কথা কইছিল? বাপ, তাহ'লে ওটা তো বাঁদরও নয়, বাঁদরের চেহারায় আসল ভূত!" এই ভেবে কাঠুরে চটপট লম্বা দিতে গেল।

কিন্তু গর্তের ভেতর থেকে আবার মানুষের গলা এল, "ভাই, ডাল নামিয়ে তুলে নিলে কেন? আমাকে বাঁচাও ভাই, তোমাকে মুঠো মুঠো মোহর দেব!"

ভরসা পেয়ে কাঠুরে ফের লম্বা ডালটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। এবারে সড়াৎ ক'রে ডাল বেয়ে উঠে এল মস্ত এক গোখ্‌রো সাপ!

কাঠুরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "বাপ্ রে বাপ্, সাপে কথা কইলে মানুষের মত! এ যে বেজায় ভুতুড়ে কাণ্ড বাবা! আর এখানে থাকা নয়!"

গর্তের ভেতর থেকে আবার মানুষের গলায় শোনা গেল, "যেও না ভাই, যেও না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি! আমাকে বাঁচাও, আমি জমিদার রত্নাকর, আমাদের অর্ধেক জমিদারী তোমাকে দেব!"

কাঠুরে কি আর করে, আস্তে আস্তে ডালটা আবার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। ডাল বেয়ে এবারে এক প্রকাণ্ড বাঘ উঠে এসে, বনের ভেতরে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে!

কাঠুরে হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে বললে, "নাঃ, এ ভুতুড়ে কাণ্ড ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে যে! আগে বাঁদর, পরে সাপ, তারপরে বাঘ! এখন প্রাণটা থাকতে থাকতেই প্রাণ নিয়ে পালানো যাক!"

গর্তের ভেতর থেকে কাকুতি-মিনতি ক'রে রত্নাকর বললে, "আমাকে ফেলে পালিও না ভাই, পালিও না—ভগবান তোমার ভালো করবেন। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব! দেব, দেব, দেব—এই তিন সত্যি করলুম!"

কাঠুরের দয়ার শরীর, কাজেই ভয়ে ভয়ে রাম-নাম জপতে জপতে আর একবার সে গর্তের মধ্যে ডালটা ঢুকিয়ে দিলে।

এবারে বাস্তবিকই মানুষকে উঠে আসতে দেখে কাঠুরে 'দুর্গা,' ব'লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল!

রত্নাকর বললে, "কাঠুরে, তোমার উপকার আমি কখনো ভুলব না।"

কাঠুরে হাত জোড় ক'রে বললে, "জমিদারবাবু, আপনি কি সত্যিই আমাকে আপনার অর্ধেক জমিদারী আর মেয়েটিকে দেবেন?"

রত্নাকর বলল, "হ্যাঁ, দেব বৈকি। তুমি আমার বাড়িতে যেও, তারপর কথা হবে।"

দুই

গরীব কাঠুরে, কখনো ধন-দৌলতের মুখ তো দেখেনি! আজ তার প্রাণ যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেছে। নাচতে নাচতে সে জমিদার রত্নাকরবাবুর বাড়ির দিকে চলেছে। মনে মনে ভাবছে, "আঃ, বাঁচা গেল! আর কুড়ুল কাঁধে ক'রে বনে বনে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না, অর্ধেক জমিদারী পেলে আমার আর ভাবনা কি! তার ওপরে আবার জমিদারের মেয়েও আমার গলায় মালা দেবে। জমিদারের

মেয়ে, দুধ-ঘি খায়, কত আদরে থাকে, সে নিশ্চয়ই দেখতে পরমা-সুন্দরী। আহা, আমার শ্বশুর-মশায়ের ভারি দয়ার শরীর গো, ভগবান তাঁর ভালো করুন।"

রত্নাকরবাবুর বাড়ির ফটকের সামনে এসে দারোয়ানকে ডেকে কাঠুরে বললে, "এই দারোয়ান, বাবুকে গিয়ে বলগে যা, আমি এসেছি।"

দারোয়ান বাড়ির ভেতর ঢুকে ফের যখন ফিরে এল, কাঠুরে তখন বললে, "কিরে, বাবু কি বললে?"

—"বাবুজী বললেন, লাঠি মেরে তোর মাথা ভেঙে দিতে।" এই ব'লেই গালপাট্টা নেড়ে বন বন ক'রে লাঠি ঘুরিয়ে তেড়ে এল দারোয়ান।

বেগতিক দেখে কাঠুরে ভোঁ-দৌড় দিয়ে সে যাত্রা কোনগতিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে বটে, কিন্তু তার বড় সাধের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ল।

মুখখানি চুন ক'রে কাঠুরে-বেচারী বনের মাঝে নিজের ভাঙা কুড়ে-ঘরে ঢুকেই, থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ওরে বাবা, ঘরের ভেতরে বসে আছে গর্তের সেই বাঁদর, গোখরো সাপ, আর ইয়া গোঁফ-ওয়ালা মস্ত বাঘটা! দেখেই তো তার পেটের পিলে গেল চমকে! বুঝলে, লাঠির ঘা থেকে আজ মাথা বাঁচলেও, এদের খপ্পর থেকে আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!

কাঠুরে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হা ভগবান, যাদের আমি বাঁচালুম, তাদের সবাই কিনা আমারি শত্রু হয়ে দাঁড়াল!"

কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই বাঘ, সাপ আর বাঁদর কাঠুরেকে দেখে একটুও তেড়ে এল না, বরং তার পায়ের তলায় গড়িয়ে প'ড়ে আদর ক'রে তার পা চেটে দিতে লাগল! কাঠুরে তো একেবারে গালে হাত দিয়ে অবাক!

তারপর বাঁদরটা তাড়াতাড়ি বনের গাছ থেকে ভালো মিষ্টি ফল পেড়ে আনলে, বাঘটাও একছুটে বাইরে গিয়ে কোথা থেকে একটা নধর

হরিণ মেরে এনে দিলে, আর গোখরো সাপ তার জ্বলজ্বলে মাথার মণি-খানা কাঠুরের পায়ের তলায় নামিয়ে রাখলে!

কাঠুরে চোখের জল মুছে, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "ওরে, তোরা দেখছি জন্তু হয়েও মানুষের চেয়ে ঢের ভালো, উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যাস না! দুষ্টু রত্নাকর আমাকে আজ বড় দাগাটাই দিয়েছে, অর্ধেক জমিদারী আর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চুলোয় যাক্—উল্টে কিনা লাঠি নিয়ে পেছনে তাড়া? ছি, ছি, মানুষকে ধিক্!"

হরিণের মাংস আর ফল-মূল পেট ভ'রে খেয়ে মণিটি ট্যাঁকে গুঁজে কাঠুরে শহরে গিয়ে হাজির হোলো।

একটি জহুরীর দোকান দেখে সে তার ভেতরেই ঢুকল। ঠিক করলে মণিটি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাই নিয়েই এ-জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে, কুড়ুলে গাছ কুপিয়ে আর তাকে খেটে খেতে হবে না।

জহুরীকে ডেকে সে বললে, "ওহে, এই মণিটি আমি বেচব।"

মণিটি দেখে জহুরী তো হতভম্ভ! এ যে সাত রাজার ধন এক মানিক! কাঠুরের কাছে এমন দামী মণি এল কেমন ক'রে? নিশ্চয়ই চুরি করেছে! চোরাই মাল কিনে পাছে মুশ্‌কিলে পড়ে, সেই ভয়ে জহুরী তখনি চুপি চুপি শহর-কোটালের কাছে খবর পাঠালে। কোটাল এসে তখনি কাঠুরের হাত পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, তাকে একেবারে রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

রাজাও মণি দেখে বললেন, "যে রত্ন আমার ভাণ্ডারে নেই, তুই কাঠুরে হয়ে তা পেলি কোথায়?"

কাঠুরে তখন কাঁদতে কাঁদতে জমিদার রত্নাকরের কথা থেকে শুরু ক'রে, মণি পাওয়া পর্যন্ত সব কথা খুলে বললে।

রাজা বললেন, "আচ্ছা, জমিদার রত্নাকরকে ডেকে নিয়ে আয় তো রে, সে কি বলে শুনি।"

রাজার হুকুমে তখনি জমিদার রত্নাকরকে সভায় ডেকে আনা হোলো।

রাজা বললেন, "ওহে রত্নাকর, এই কাঠুরে তোমাকে গর্ত থেকে বাঁচিয়েছিল ব'লে তুমি কি একে তোমার মেয়ে আর অর্ধেক জমিদারী দেবে বলেছিলে?"

রত্নাকর হাত জোড় ক'রে, চোখদুটো কপালে তুলে বললে, "মহা-রাজ, এ যে ডাহা মিছে কথা! এই কাঠুরেটাকে এর আগে আমি কখনো চোখেও দেখিনি।"

রাজা রেগে টং হ'য়ে কাঠুরেকে বললেন, "তবে রে হতভাগা চোর! আমার সঙ্গে মিছে কথা? জহ্লাদ!"

জহ্লাদকে খাঁড়া কাঁধে ক'রে আসতে দেখে কাঠুরে ভয়ে মাটির ওপরে আছড়ে প'ড়ে বললে, "মহারাজ, আমি সত্যি কথাই বলছি!"

রত্নাকর বললে, "মহারাজ, এর কথা যে সত্যি, তার সাক্ষী কোথায়?"

হঠাৎ সভাসুদ্ধ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি, চ্যাঁচামেচি করতে লাগল! তারপরেই দেখা গেল, হেলতে-দুলতে এক মস্ত বাঘ এসে সভার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়াল,—তার পিঠে এক রূপী বাঁদর,—আর বাঁদরের গলা জড়িয়ে মাথার ওপরে কাছির মত একটা মোটা গোখ্‌রো সাপ!

রত্নাকরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল! ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে পড়ল।

কাঠুরে যো পেয়ে বললে, "রত্নাকরবাবু, আপনি কি এদের চেনেন না?"

রত্নাকর আমতা আমতা ক'রে বললে, "এগুলো যে সেই গর্তের জন্তু!"

কাঠুরে বললে, "মহারাজ! এরাই আমার সাক্ষী!"

বাঘ তখন এগিয়ে এসে ডাক্‌লে,—"হালুম!"

বাঁদর ডাকলে—"কিচ্‌-মিচ্‌, কিচির-মিচির—কোঁও!"

গোখরো সাপ ডাকলে—"স্-স্-স্-র্-র্-র্—ফোঁস্-স্!"

পাছে তারা পায়ে কামড়ে দেয় সেই ভয়ে রাজা তাড়াতাড়ি পা-দুটো সিংহাসনের ওপরে তুলে ফেলে বললেন, "বাছা কাঠুরে, তোমার সাক্ষীদের বাসায় ফিরে যেতে বল। আমি বুঝেছি, তোমার সব কথাই

সত্যি। রত্নাকর! দেখ, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! যে লোক উপকার ভুলে যায়, আমার রাজ্যে সে আর থাকতে পাবে না। তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, তোমাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে আজকেই শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর, তোমার সব জমিদারী আমি এই কাঠুরেকে দিলুম, তোমার মেয়েকেও কাঠুরেই বিয়ে করবে।"

তারপর? তারপর আর কি, রত্নাকরের পরমাসুন্দরী মেয়েকে বিয়ে ক'রে জমিদারীর আয়ে কাঠুরের মনের সুখে দিন কাটতে লাগল। সুখের দিনে সে কিন্তু তার তিন-বন্ধুকেও ভুলে গেল না—বাঘ, বাঁদর আর সাপকেও আদর ক'রে নিজের বাড়ির ভেতরে এনে রাখলে। তারপর? নোটে-গাছটি মুড়ুলো কিনা জানি না, কিন্তু আমার কথাটি ফুরুলো।

উল্টো-বাজির দেশে

কালকে আমি গিয়েছিলুম উল্টো-বাজির দেশে।
এমন দেশটি আর পাবে না,—সবই সর্বনেশে!
রামের সেথায় নেইকো ধনুক, নেইকো ভীমের গদা,
শ্যামের বাঁশীর নাম শোনেনি হেবো, মোনা, পদা!
সীতা সেথায় যান-নি বনে, রাবণ আজও জ্যান্ত,
হনুমানের নেইকো লাঙুল—লম্ফত্যাগে ক্ষ্যান্ত!
সিংহ থাকে শহরে ভাই—বনের ভেতর মানুষ,
নৌকো ওড়ে আকাশ দিয়ে, জলেই ভাসে ফানুস!
ব্যাঘ্র সেথায় ভক্ত ঘাসের, হাড্ডি চেবায় ছাগল,
পণ্ডিতেরা মুখ্যু সেথায়, পদ্য লেখে পাগল!
প্যাঁচারা ভাই গানের রাজা, কোকিলগুলো বোবা,
পৈতে-টিকি পুড়িয়ে ফেলে হিন্দু বলে 'তোবা'!

হস্তীগুলো বিশ্রী রোগা, ফড়িংগুলো ষণ্ডা,
বাঁদর ব'সে অঙ্ক কষে ছ-কুড়ি দু-গণ্ডা!
নিদ্রাতে ভাই নাক ডাকে না, খেলেই বাড়ে ক্ষুধা,
ঘোটক চালায় মানুষ-গাড়ি,—সাপের মুখে সুধা!
মোছলমানের নেইকো দাড়ি, নিগ্রোরা সব সাদা,
সাহেবগুলো ভূতের মত; বোকারা নয় হাঁদা!
চাকর-দাসী হুকুম চালায়, মনিব বলে হুজুর!
মানুষ দেখে মামদো পালায়, মুখ চুন হয় জুজুর!
প্রজারা সব রাজ্য করে, রাজা জোগায় খাজনা,
হার্মোনিয়াম ফেলে সবাই শোনে ঢাকের বাজনা!
মণ্ডা-মেঠাই খায়নাকো কেউ, খায় চিরেতা-নালতে,
উনুনটাকে জ্বালতে হবে সাত-ঘড়া জল ঢালতে!
মাস্টারেরা ডুকরে কাঁদে, ছাত্র মারে বেত্র,
মরুভূমির বুকেই নাচে সবুজ ধানের ক্ষেত্র!
রবিবারে ইস্কুলেতে কামাই হ'লেই ফাইন,
বাকি ছ-দিন খেলতে পারো,—এমনি ধারাই আইন!
মেয়েরা সব কর্তা সেথায়, পুরুষ ভারি বাধ্য,
মরলে মানুষ হাসতে হবে; জ্যান্তে করে শ্রাদ্ধ!
স্ত্রীলোকেরা আপিস করে গলায় দিয়ে চাদর,
অন্দরেতে পুরুষ যত খোকায় করে আদর!
ছোকরারা সব শান্ত-সুবোধ, বৃদ্ধেরা সব দস্যি,
চুরুট ফোঁকে নাক দিয়ে আর কর্ণে গোঁজে নস্যি!
চোর-ডাকাতে বিচার করে, সাধু পচেন জেলে,
দুষ্টু বাপের কানটি মলে শাসন করে ছেলে!
অন্ধকারে দিন কেটে যায়, সূর্যি আসে রাত্রে,
ভিক্ষুকেরা ভিক্ষে করে পক্ক সোনার পাত্রে!

আকাশ পড়ে পায়ের তলায়, মাথার ওপর মাটি,
সত্যি মানে মিথ্যে এবং নকল মানে খাঁটি।
কি ভয়ানক উল্টো-বাজি!—বলতে আসে কান্না,
শুনলে পরেও মন দ'মে যায়, ক্ষান্ত হলুম—আন্না!

হাঙর-মানুষের চোখের জল

তোতারো এক মস্ত যোদ্ধা। একবার তিনি ঘোড়ায় চড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

নানাদেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন একটি সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হচ্ছেন, হঠাৎ এক মূর্তি দেখে চম্‌কে উঠলেন।

তোতারো দেখলেন, পোলের ধারে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব ব'সে আছে। তার দেহ কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত অবিকল মানুষের মতন, কিন্তু মুখখানা একেবারে হু-বহু হাঙরের মতন ভয়ানক। মুখে বড় বড় বিশ্রী দাড়ি, চোখ দুটো সবুজ হীরের মতন্ জ্বল্‌জ্বলে আর গায়ের রং কাফ্রীর চেয়েও কালো কুচকুচে।

তোতারো প্রথমটা হতভম্ভ হয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কোন কথাই বেরুল না। কিন্তু সেই অদ্ভুত জীবটার চোখ দুটোতে এমন এক দুঃখের ভাব মাখানো ছিল যে, শেষটা তিনি ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি?"

সে বললে, "আমি হচ্ছি হাঙর-মানুষ।"

—"সে আবার কি?"

—"আমরা সমুদ্র-রাজার প্রজা। আমি তার সেনাপতি ছিলুম। আমার নাম সম্বিতো। হঠাৎ একদিন আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি জুটল, নদীর ভেতরে বেড়াবার জন্যে। কিন্তু নদীর ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই একদল জেলে জাল ফেলে আমাকে ডাঙায় তুললে। কিন্তু আমার চেহারা দেখে

জেলেরা 'বাপ্‌রে' ব'লে সেই যে ছুটে পালাল, আর ফিরে এল না। তারপর থেকে আজ তিন দিন আমি অনাহারে এখানে একলাটি প'ড়ে আছি মশাই, দয়া ক'রে আমার প্রাণ বাঁচান।"

সম্বিতোর অবস্থা দেখে তোতারোর মনে ভারি দয়া হ'ল। তিনি তাকে সঙ্গে ক'রে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসার বাগানে একটি পুকুর ছিল, সম্বিতোকে তিনি সেই পুকুরে থাকতে দিলেন—অবশ্য খাবার দিতেও ভুললেন না।

কিছুদিন যায়। তোতারো একদিন এক মেলায় গিয়ে হঠাৎ একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলেন! মেয়েটির মুখ বরফের মতন ধব্‌ধবে সাদা, তার ঠোঁট দুখানি যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতন। আর তার কথা—সে যেন বসন্তকালে পাপিয়ার ঝঙ্কার।

মেয়েটির রূপ দেখে তোতারো একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, তার নাম তামানা—এখনো তার বিয়ে হয়নি। তাকে বিয়ে করবার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে বর আসছে, কিন্তু তামানার কঠোর পণের কথা শুনে সকলকে ধুলো-পায়েই বিদায় হ'তে হচ্ছে!

তামানার প্রতিজ্ঞা, দশ হাজার মানিক দিতে না পারলে সে কারুকেই বিয়ে করবে না!

দশ হাজার মানিক! কথায় বলে, একখানা মানিকই সাত-রাজার ধনের সমান! এমন দশ হাজার মানিক কি কুবেরেরও ভাঁড়ারে আছে? তোতারোর বুক ভেঙে গেল, তিনি বুঝলেন যে তামানাকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তোতারোর মন তবু শান্ত হ'ল না, তামানার কথা ভেবে ভেবে দিন-কে-দিন তিনি রোগা হয়ে পড়তে লাগলেন, শেষটা বিছানা থেকে আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত রইল না।

ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেলেন যে, "ওষুধে কোন ফল হবে না, তামানাকে না পেলে এ ব্যামো সারবার নয়।"

তোতারোর অসুখের খবর পেয়ে সম্বিতো তার পুকুর থেকে ডাঙায় উঠে মনিবকে দেখতে এল।

তোতারো তাকে দেখে বললেন, "হায় সম্বিতো, আমি ম'রে গেলে আর কে তোমাকে খাবার দেবে?"

সম্বিতো তার প্রভুর দশা দেখে হাউ মাউ ক'রে কেঁদে অস্থির!

তোতারো অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন, সম্বিতোর অশ্রু প্রথমে রক্তের মতন রাঙা হয়ে ঘরের মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে, তারপরেই প্রত্যেক ফোঁটাটি হয়ে যাচ্ছে, এক-একখানি জ্বলন্ত মানিক।

এই আশ্চর্য মানিক-অশ্রু দেখবামাত্র তোতারো আনন্দে দিশাহারা হয়ে বললেন, "আর আমি মরব না, আর আমি মরব না! সম্বিতো, তোমার চোখের জলই আবার আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে।"

সম্বিতো কান্না থামিয়ে বললে, "প্রভু, আমার চোখের জল দেখে আপনি হঠাৎ এত খুশি হচ্ছেন কেন?"

তোতারো তখন তাকে সব কথা জানিয়ে বললেন, "সম্বিতো, তুমি চোখের জল ফেললেই যখন মানিক হয় তখন আর ভাবনা কি! আমি দশ হাজার মানিক যৌতুক দিয়ে তামানাকে বিয়ে ক'রে আনব!"

তারপর তোতারো তাড়াতাড়ি ঘরের মেঝের উপরে ছড়ানো মানিক-গুলো গুণে বললেন, "দশ হাজার পূর্ণ হতে এখনো ঢের বাকি! সম্বিতো, কাঁদো—আর একটু কাঁদো।"

সম্বিতো রাগে মুখ ভার ক'রে বললে, "প্রভু, আপনি কি মনে করেন, আমি মেয়েমানুষের মতন যখন-খুশি কাঁদতে পারি? দুঃখ হ'লে আমার বুকের ভেতর থেকে অশ্রু আপনি গড়িয়ে আসে। আপনি সুস্থ হয়েছেন, আর আমার কান্না আসছে না! জীবন হচ্ছে হাসবার জন্যে,—কান্নার জন্যে নয়!"

তোতারো মিনতি ক'রে বললেন, "দশ হাজার মানিক না পেলে আবার আমার অসুখ হবে! কাঁদো সম্বিতো, লক্ষ্মীটি, আর একটু কাঁদো।"

প্রভুর কাতরতা দেখে সম্বিতোর মনে দয়া হ'ল। সে খানিকক্ষণ

ভেবে বললে, "আজ আমি আর কাঁদতে পারব না। কাল আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবেন। সেখানে গেলে আমার দেশের কথা, আমার ঘরের কথা, আমার মা-বোন-মেয়ের কথা মনে পড়বে। তাহ'লে হয়তো আবার আমি কাঁদতে পারব।"

পরদিন তোতারো নিজে সম্বিতোকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

সমুদ্রের পানে তাকিয়ে সম্বিতো চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তার দুই চোখ সত্যই ভ'রে উঠল অশ্রুজলে, দেখতে দেখতে সেই অশ্রু গড়িয়ে মাটির উপরে প'ড়েই জ্বলন্ত মানিক হয়ে উঠতে লাগল।

সম্বিতোর দুঃখের দিকে কিন্তু তোতারোর কিছুমাত্র নজর ছিল না, তিনি আগ্রহভরে প্রত্যেক মানিকখানা তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, "ভাই সম্বিতো, আরো একটু কাঁদো, আরো একটু কাঁদো!"

তারপর সম্বিতোর চোখের জলে ঠিক দশ হাজার মানিক তৈরি হ'ল।

এমন সময়ে আচম্বিতে শোনা গেল এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের তান! তোতারো আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সমুদ্রের নীল-জলের উপরে মেঘ-দিয়ে তৈরি মস্ত একটি রক্ত-কমল জেগে উঠেছে, আর তারই উপরে এক প্রকাণ্ড রত্ন-প্রাসাদ!

সম্বিতো দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বিদায় প্রভু, বিদায়! ঐ দেখুন, সমুদ্র-রাজের প্রাসাদ! আমার দেশের ডাক এসেছে, আর আমি থাকতে পারব না!"—এই ব'লেই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তোতারো তখনি দশ হাজার মানিক নিয়ে তামানার বাড়ির দিকে চললেন।

যথাসময়ে খুব ঘটা ক'রে রূপসী তামানার সঙ্গে তোতারোর বিয়ে হয়ে গেল!

তার অনেক দিন পরেও, তামানার গলায় যখনি সেই মানিকের

মালা দেখতেন, তোতারোর তখনি মনে পড়ত হাঙর-মানুষ সম্বিতোর কথা, তার প্রভুভক্তি ও দেশভক্তির কথা, তার অশ্রুজলের কথা! আর তাকে দেখতে পাবেন না ব'লে তোতারোর চোখ দুটি ছলছলে হ'য়ে আসত।

ভুলুর ভুল

বিজয়া দশমী। সন্ধ্যেবেলা। ঠাকুমার ঘরে ঢুকে দেখি, একটি বাটিতে ক্ষীরের মতন কি-খানিকটা রয়েছে। ঠাকুমা খুব ভালো ক্ষীর করতে পারতেন। মনে বড্ড লোভ হোলো—সামলাতে পারলুম না। ঢক্ ক'রে খানিকটা দিলুম গলায় ঢেলে।

কিন্তু খেয়েই বুঝলুম, এ তো ক্ষীর নয়! তবে? সিদ্ধি! বিজয়া দশমীর জন্যে দুধ-চিনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ভয়ে প্রাণটা উড়ে গেল!

একটু পরেই বুগ্ টিপ্ টিপ্, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল! তার ওপরে আবার বাবার পায়ের শব্দ পেলুম। সিদ্ধি খেয়েছি জানলে বাবা তো আর আমাকে আস্ত রাখবেন না! তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে দিলুম টেনে লম্বা!

আকাশে সেদিন চাঁদা-মামার মুখ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গাঁয়ের পথঘাটগুলো কুয়াশায় একেবারে ঝাপ্সা হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই খালি ধোঁয়া আর ধোঁয়া আর ধোঁয়া! টল্‌তে টল্‌তে ঘুরতে ঘুরতে চলেছি তো চলেছিই—কোথায় যে যাচ্ছি তা কিন্তু মোটেই টের পাচ্ছি না!

হঠাৎ পা বাড়িয়ে আর মাটি পেলুম না, মনে হোলো আমি নীচে প'ড়ে যাচ্ছি! ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝতে না বুঝতেই ঝুপ্ ক'রে অথই জলের ভেতরে গিয়ে পড়লুম! ও বাবা, এ যে একেবারে নদী! নিশ্চয় আমি সাঁকোর ওপর থেকে প'ড়ে গিয়েছি!

একবার তলিয়ে গিয়ে ফের ওপরে উঠতেই দেখি, পাশ দিয়ে একটা গাছের গুড়ি ভেসে চলেছে। দু-হাতে সেটাকে জড়িয়ে ধরলুম।

ওঃ, জলে সেদিন কি টান! কুটোটি পড়লে দুখান হয়ে যায়। ঠিক তীরের মত বোঁ বোঁ ক'রে ভেসে চললুম, কোন্ দিকে, কতক্ষণ ধ'রে তা জানি না—কারণ গাছের গুড়িটা জড়িয়ে ধ'রেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

যখন জ্ঞান হোলো দেখলুম, আমি একটা বালি-চরে গাছের গুড়িটার সঙ্গে কুপোকাৎ হয়ে প'ড়ে আছি। আস্তে আস্তে উঠে ব'সে মাথা চুলকে ভাবতে লাগলুম—এটা কোন্ দেশ, আমাদের গাঁ থেকে কতদূরে?

—"হুম্-হুমা-হুম্-হুম্!"

ও কিসের শব্দ! চমকে চারিদিকে চাইতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না।

—"হুম্-হুমা-হুম্-হুম্!"

তুই আবার কে রে বাবা? ভূত না জানোয়ার? সুমুখেই একটা অন্ধকার ঝোপ—শব্দটা আসছে তার ভেতর থেকেই। প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম।

এমন সময়ে বাজখাঁই গলায় কে আমাকে ডেকে বললে, "বলি, ও ভুলুবাবু, আমাকে চিনতে পারো?"

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে দেখি, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মস্ত-বড় এক হুতুম্‌থুমো! তার চোখদুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে!

হুতুম্‌থুমোকে দেখে আজ কিন্তু আমার একটুও ভয় পেলো না। আমি খালি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, সে মানুষের মত কথা কইছে কেমন ক'রে? আর আমার নামই-বা কি ক'রে জানলে?

হুতুম্‌থুমো তার ধারালো ঠোঁটটা আমার মুখের কাছে নেড়ে বললে, "তারপর—ভুলুবাবু, এখানে কি মনে ক'রে?"

আমি বললুম, "সিদ্ধি খেয়ে জলে প'ড়ে গিয়েছিলুম। ভাসতে

ভাসতে এখানে এসেছি।"

হুতুম্‌থুমো মুখ খিঁচিয়ে বললে, "একরত্তি ছেলে তুমি, গলা টিপলে দুধ বেরোয়, এই বয়সেই নেশা করতে শিখেছ? হুম্‌-হুমা-হুম্‌-হুম্‌! একেবারে গোল্লার দোরে গেছ দেখছি! তারপর? এখন কি করবে? বাড়ি যাবে না?"

আমি রেগে বললুম, "বাড়ি যাব না তো এখানে ব'সে ব'সে তোমার ঠোঁটনাড়া খাব নাকি?"

হুতুম্‌থুমো বললে, "কিন্তু ছোক্‌রা, যাবে কি ক'রে? তুমি যে তেরো নদীর পারে এসে পড়েছ!"

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, "তাহ'লে উপায়?"

হুতুম্‌থুমো ডানা ঝাড়া দিয়ে বললে, "এক উপায় আছে। তুমি যদি আমার পিঠে চ'ড়ে বোসো, তাহ'লে আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে রেখে আসতে পারি।"

আমি বললুম, "বিলক্ষণ! শেষটা তোমার পিঠ থেকে যদি পিছ্‌লে যাই, তাহ'লে মাটিতে প'ড়ে ছাতু হয়ে যাব যে!"

হুতুম্‌থুমো বললে, "আরে না না—রামচন্দ্র! পড়বে কেন, আমার পিঠে চ'ড়ে বেশ বাগিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরো দেখি!"

কি আর করি—যেমন ক'রেই হোক্‌ বাড়িতে যেতেই হবে তো! কাজেই আস্তে আস্তে শুক্‌নো মুখে হুতুম্‌থুমোর পিঠের ওপরেই নাচার হ'য়ে চ'ড়ে বসলুম। হুতুম্‌থুমোও অমনি হুস্‌ ক'রে উড়ে গেল!

হুতুম্‌থুমো ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল,—এঁকে-বেঁকে, ঘুরে ঘুরে! অনেক নিচে ধরাখানা দেখতে পেলুম সত্যিই ঠিক সরার মত! তারপর সব ধোঁয়া ধোঁয়া, আবছায়ার মত! বুঝলুম, আমরা মেঘের রাজ্যে এসে পড়েছি! একবার একটা মেঘের পাহাড়ে মাথাটা আমার ঠক ক'রে ঠুকে গেল! ক্রমে মেঘের রাজ্যও ছাড়িয়ে উঠলুম—সেখানে আকাশ-গঙ্গায় নীল জল থই থই করছে, আর সেই জলে মস্তবড় চাঁদখানা ভাসতে ভাসতে পশ্চিম দিকে চলেছে!

ব্যস্ত হয়ে বললুম, "অ হুতুম্‌থুমো, এ কোথায় যাচ্ছ ভাই?"

—"আপাতত চাঁদের ওপরে!"

—"কেন?"

—"ভারি হাঁপিয়ে পড়েছি, একটু না জিরিয়ে নিলে চলবে না।"

আমি ভয় পেয়ে বললুম, "কিন্তু চাঁদ যে বেজায় গোল, ওর ওপরে গেলে গড়গড়িয়ে প'ড়ে যাব যে!"

হুতুম্‌থুমো চ'টে বললে, "সে-সব দেখবার দরকার আমার নেই! এই চাঁদের কাছে এসেছি, ভালো চাও তো আমার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ো—নৈলে এমনি ঝটাপট ডানাঝাড়া দেব যে, একেবারে ছিটকে পৃথিবীর দিকে নেমে যাবে!"

ইষ্টুপিড হুতুম্‌থুমোর কথায় আমার ভয়ানক রাগ আর ভয় হোলো! কিন্তু যখন বুঝলুম, পৃথিবীতে প'ড়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে মরার চেয়ে এটা তবু মন্দের ভালো, তখন চাঁদের ওপরেই লম্বা এক লাফ মারলুম। বাপরে, চাঁদ কি বরফের মত ঠাণ্ডা, আর চুকচুকে তেলা! সর্বাঙ্গ যেন জ'মে গেল! আমি গড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলুম—তাড়াতাড়ি কি-একটা হাতে ঠেকতেই কপ্‌ ক'রে সেটা আঁকড়ে ধরলুম।

এমন সময়ে শুনলুম, হুতুম্‌থুমো হা-হা ক'রে হেসে বলছে, "ওরে হতভাগা ভুলু, ওরে বদ্‌জাত! মনে পড়ে কি, তোদের চিলের ছাতে আমি যখন বাসা ক'রেছিলুম, তখন তুই একদিন ছাতে উঠে আমার ডিমগুলো সব ভেঙে দিয়েছিলি? আজ আবার নতুন বাসার খোঁজ পেয়ে সেখানেও তুই নষ্টামি করতে গিয়েছিলি—ভাগ্যে আমি হাজির ছিলুম, নইলে তুই আবার আমার সর্বনাশ করতিস্‌! সেইজন্যেই তো বাড়িতে নিয়ে যাবার অছিলায় তোকে আজ আপদের মত এখানে বিদায় ক'রে দিতে এসেছি! এখন চাঁদের ভেতরে প'ড়ে শীতে জ'মে থাক—যেমন কর্ম তেমনি ফল, আমার সঙ্গে চালাকি?"

ইচ্ছে হোলো, পাজি-নচ্ছারের ঘাড়টা ধ'রে দি মট্‌ ক'রে মট্‌কে! কিন্তু পাছে হাত ছাড়লে গড়িয়ে প'ড়ে যাই, সেই ভয়ে তা আর পারলুম

না—হুতুম্‌থুমোও দেখতে দেখতে গোঁত্তা খেয়ে পৃথিবীর দিকে নেমে, সোঁ-সোঁ ক'রে মেঘের মাঝে মিলিয়ে গেল।

কি ধ'রে ঝুলছি তা দেখবার জন্যে চোখ তুলে দেখি—ওমা, এ যে একটা চর্‌কা। এখানে চরকা এল কোত্থেকে?

হঠাৎ খট্‌ ক'রে একটা শব্দ হোলো—চাঁদের গায়ে একটা দরজা অমনি খুলে গেল। তারপর এক আদ্দিকালের বদ্যি-বুড়ী লাঠি ধ'রে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে এল। চর্‌কার পাশে এসে ব'সে, চশমাখানা চোখে দিয়েই সে আমাকে দেখতে পেলে।

চমকে উঠে বুড়ী বললে, "তুই কে রে ছোঁড়া?"

আমি বললুম, "আমি ভুলু।" বুড়ী বললে, "ভুলু? এ যে মানুষের নাম ব'লে মনে হচ্ছে!"

আমি বললুম, "হ্যাঁ গো বুড়ী, আমি মানুষই তো!"

বুড়ী গালে হাত দিয়ে বললে, "মানুষ? চাঁদে মানুষ কেন? আরে গেল যা আবার আমার চরকা-খানা দুহাতে চেপে ধরা হয়েছে! ও বুঝেছি, বুঝেছি, "স্বর্গবাসী" সংবাদপত্রে আমি পড়েছি বটে, পৃথিবীতে গান্ধী ব'লে কে একজন লোক আজকাল সবাইকে চরকা ঘোরাতে বলেছে। তুই বুঝি তাই ভালো চরকা না পেয়ে আমার এই সাধের চরকা-খানি চুরি করতে এসেছিস্‌? বটে, ভারি আবদার যে, ছাড়্‌ ছোঁড়া, আমার চরকা ছাড় বলছি।"

আমি কাকুতি-মিনতি ক'রে বললুম, "না বুড়ী, তাহ'লে প'ড়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে মরব। সত্যি বলছি, আমি তোমার চরকা চুরি করতে আসি-নি!"

বুড়ী মাথা নেড়ে বললে, "মানুষরা ভারি মিথ্যে কথা কয়, তাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না, তুই আমার চরকা ছাড়বি কিনা বল!"

আমি চরকাখানা আরো শক্ত ক'রে ধ'রে বললুম, "না।"

বুড়ী চোখ রাঙিয়ে বললে, "ওমা, কি দস্যি ছেলে গো, কথায় কান পাতে না। ছাখ, এখনো বলছি, ভালো চাস তো চরকা ছাড়্‌!"

তার বক্‌বকানিতে ঝালাপালা হয়ে আমি বললুম, "যা বুড়ী যা, কানের কাছে আর ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করতে হবে না—সরে পড় এই বেলা, নইলে তোর ঐ টিয়াপাখির মত লম্বা নাকটা এক কামড়ে কেটে নেব।"

বুড়ী তার ভাঁটার মত চোখতুটো রাঙিয়ে বললে, "কি, আমাকে তুই-মুই, আমার নাক তুই কামড়ে কেটে নিবি, এত বড় স্পর্ধা! রোস্ তো, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি!" ব'লেই চাঁদের বুড়ী তার লাঠিটা তুলে আমার হাতের ওপরে দুমদাম ঘা-কতক বসিয়ে দিলে!

"ওরে বাবা রে, গেছি রে" ব'লে চেঁচিয়ে আমি চরকাখানা তখনি ছেড়ে দিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে ঝুপ্ ক'রে প'ড়ে গেলুম পৃথিবীর দিকে।

পড়্ছি, পড়্ছি, পড়্ছি—ক্রমাগতই পৃথিবীর দিকে পড়্ছি—

—এ-জন্মের লীলাখেলায় এইখানেই তবে ইস্তফা।

ওকি-ও! চারিদিক আলো ক'রে আমারি মতন আর-একটি কে ও পড়ছে না? হ্যাঁ, তাইতো! এ যে একটি ছোট খোকা!

আমি আশ্চর্য হয়ে ব'লে উঠলুম, "এমন সোন্দর খোকাকে কোন্ পাষণ্ড ফেলে দিলে রে?"

খোকা হাসিতে হীরের আলো ফুটিয়ে বললে, "চাঁদের বুড়ী।"

—"তুমি কার খোকা? তোমার মা কে?"

—"জোছ্না।"

—"তোমার নাম কি?"

"তারা! তোমরা আকাশে যে তারা দেখ, আমি তাই।"

—"তাহ'লে সব তারাই কি তোমারি মতন এক-একটি খোকা?"

—"হ্যাঁ। চাঁদের বুড়ী ভারি তুষ্টু। আমরা তার চরকা নিয়ে খেলা করতে চাই ব'লে, বাগে পেলেই বুড়ী আমাদের ধ'রে ফেলে দেয়।"

—"ভাই তারা-খোকা, তোমার ভয় করছে না?"

—"ভয় আবার কিসের? তোমার বুঝি ভয় করছে? কিচ্ছু ভয় নেই" —এই ব'লে তারা-খোকা তার ছোট ছোট হাত তুখানি দিয়ে আমাকে

জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললুম, "যতই ধরো ভাই, পৃথিবীতে পড়লেই আমাদের হাড়-গোড় সব দাঁতের মাজনের মতন গুঁড়ো হয়ে যাবে।"

তারা-খোকা হেসে বললে, "দূর বোকা! আমরা পৃথিবীতে পড়তে যাব কেন? ঐ ছাখো, সুমুদ্দুর! আমরা ঐখানেই পড়ব!"

শিউরে উঠে আমি বললুম, "তারপর?"

তারা-খোকা বললে, "তারপর আর কি! আমি ঝিনুকের পেটে ঢুকে মুক্তো হয়ে জন্মাব!"

—"আর আমি?"

তারা-খোকা জবাব দেবার আগেই আমরা সুমুদ্দুরের ভেতরে ঝপাং ক'রে পড়লুম—তারা-খোকা যে কোথায় ছট্‌কে গেল তা বুঝতেও পারলুম না—আমি কিন্তু একেবারে পাতালের দিকে তলিয়ে গেলুম!

তারপরেই দেখি দশটা হাতির মত বড় একটা তিমিমাছ হাঁ ক'রে আমাকে গিলে ফেলতে আসছে! "বাবা গো, আমাকে খেলে গো" ব'লে আমি সাঁতরে অন্যদিকে স'রে যেতে গেলুম, কিন্তু তিমিটা হঠাৎ আমার মুখে ল্যাজের এক ঝাপ্‌টা বসিয়ে দিলে। সে কি বড় সিধে ঝাপ্‌টা, মনে হোলো মাথাটা যেন ধড় থেকে পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে ঠিকরে পড়ল ফুটবলের মত!

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, "ওরে ছ্যাঁচ্‌ড়া—ওরে পাজীর পা-ঝাড়া! সিদ্ধি খেয়ে এখানে প'ড়ে ঘুমুনো হচ্ছে, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছ?"

গালের ওপর আবার এক বিষম থাব্‌ড়া—কোথায় গেল তিমিমাছ, আর কোথায় গেল সুমুদ্দুর—চোখের সামনে দেখতে লাগলুম খালি হাজার হাজার সর্ষেফুলের বাগান!

সিদ্ধি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এখন চড় খেয়ে তাড়াতাড়ি জেগে উঠে দেখি, পুকুর-ঘাটে আমি প'ড়ে রয়েছি, আর বাবা চোখ রাঙিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন!

তাহ'লে হুতুমথুম্মো, চাঁদের বুড়ী, তারা-খোকা এ-সব ডাহা মিথ্যে

—শুধু নেশার খেয়াল? আরে ছোঃ, সিদ্ধির নিকুচি করেছে—**এমন** জিনিসও মানুষে খায়?—ভাগ্যিস্, পাগল হয়ে যাই-নি!

আজব দেশ

এক যে আজব দেশ আছে ভাই, মিথ্যে এ নয়, খাঁটি,
ও তার মাথার ওপর আকাশ সদাই, পায়ের তলায় মাটি!
শুনলে তুমি অবাক হবে, নদীতে ঢেউ খেলে,
ক্ষিধের সময় পাবেই ক্ষিধে, মরে না কেউ খেলে!
বর্ষা এলে মেঘগুলো বাপ্, চ্যাচায় গুড়ুগুড়ু,
বনের পাখীর ডানাগুলো কেবল উড়ু-উড়ু!
সমুদ্দুরের জলেতে ঠিক নীল-পেন্সিল গোলা,
জ্যান্তো মানুষ জলে ডোবে, কিন্তু ভাসে সোলা!
পাহাড়গুলো বেড়ায় নাকো, হয়ে থাকে অটল,
নাক দুটোকে ধরলে টিপে, মানুষ তোলে পটল!
অমাবস্যের অন্ধকারে মোটেই যায় না দেখা,
দিনের বেলায় চাঁদ ওঠে না, সূয্যি-মামা একা!
ঘুমের সময় নাকগুলো সব চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে,
মণ্ডা-মেঠাই ফেলে না কেউ, ভুঁড়ির ভেতর রাখে!
মাকে সবাই বলে 'মাতা, বাবাকে কয় 'বাবা',—
অন্ধ-লোকের চোখ ফোটে না, বোবারা হয় হাবা!
মেয়েদের ভাই গজায় না গোঁফ, পুরুষদের নাই খোঁপা,
নাপিত সেথায় চুল ছাঁটে আর কাপড় কাচে ধোপা!
নাকে সেথায় নস্যি দিলে হাঁচবে জোরে হ্যাঁচ্চো!
কুকুর যদি তাড়া লাগায়, বেরাল করে—'ফ্যাঁচ্চো'!

বলব কি ভাই, আজব দেশে সবই উল্টো ব্যাপার,
শীতকালেতে সবাই চড়ায় মোজা, গেঞ্জি, র‍্যাপার!
মুণ্ডু দিয়ে কেউ হাঁটে না, হাঁটে সবাই ঠ্যাঙে,
ছিপ ফেলে লোক মাছই ধরে,—ধরে নাকো ব্যাঙে!
পিছ্‌লে যদি যায় কারু পা, আছাড় খাবে দড়াম—
ভুঁইপটকা ছুঁড়লে খোকা আওয়াজ হবে গড়াম!
বেঁটেরা হয় খাট্টো এবং ঢ্যাঙা মস্ত লম্বা,
মুখ্যু-ছেলে ইস্কুলেতে খায় হে অষ্টরম্ভা!
অঙ্কগুলো শক্ত বড়, যায় না বোঝা কিচ্ছু,
বাঁদর কাঁদে কিচির-মিচির কামড়ে দিলে বিচ্ছু!
কাতুকুতু দিলে হাস্য আসে হো হো হি হি,
হাততালিতে অশ্ব লাগায় বেজায় চোঁ-হো চিঁ-হি!
রাত্রি হ'লে হুতোম হাঁকে হুম্‌হুমাহুম্ হুম্ হে!
দস্যি ছেলের পৃষ্ঠে পড়ে দুম্‌দুমাদুম্ দুম্ হে!
তানসেনেরা গান করে যেই 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা'—
তার সনেতে তান ধরে সেই মাধাই ধোপার গাধা!
আর এক কথা শুনলে সবাই হতভম্ব হবে—
টিকটিকিরা চ্যাঁচায় নাকো হাম্বা হাম্বা রবে!
আজব দেশে এমনিতরো কাণ্ড নানান খানা,
তোমরা যদি মিথ্যে ভাবো, বলব 'তা না না না'!

মুর্গী চাচা

এটি একটি মুর্গীর গল্প। ইংরেজদের এক আদি কবি চসার এই মুর্গীর গল্প শুনিয়েছিলেন বটে, কিন্তু গল্পটি তাঁর নিজস্ব নয়। কারণ, ফরাসী দেশেও এই গল্পটি প্রচলিত আছে। আমরাও গল্পটিকে বাঙ্গালা দেশের উপযোগী ক'রে নিয়ে তোমাদের কাছে বলতে চাই।

হানিফের মা একটি মুর্গী পুষেছিল। তাকে সে চাচা ব'লে ডাকত। চাচা মোরগ হলে কি হয়, তার ধরনধারণ সব ছিল দস্তুর মতন মুরুব্বির মত।

বাস্তবিক, চাচার মতন চমৎকার মুর্গী বড় একটা নজরে পড়ে না। তার পালকের রং ছিল রোদে-ধোয়া চকচকে সোনার মত। তার ঠোঁট ছিল কষ্টিপাথরের চেয়ে কালো। আর তার মাথার উপরকার জমকালো চূড়াটি দেখলেই মনে হত, জ্বলছে যেন টকটকে লাল আগুনের শিখা।

নিজের চেহারার জন্য চাচার জাঁকের সীমা নেই। নিজেকে সে মনে করত পক্ষীরাজ্যের সম্রাট্। সে সর্বদাই থাকত বুক ফুলিয়ে এবং জোরে জোরে পা ফেলত মাটির উপরে।

চাচার সময়-জ্ঞান ছিল এমন, যে-কোন ভালো ঘড়িও হার মানতে বাধ্য। রোজ সকালে যথাকালে সে পৃথিবীকে জানিয়ে দিত, সূর্যোদয় হতে দেরি নেই, আর দেরি নেই।

মেদী পাতার বেড়ার উপরে লাফিয়ে উঠে, দুই রঙীন ডানা ঝট-পটিয়ে নেড়ে এবং গলাটি প্রাণপণে বাড়িয়ে এমন তীক্ষ্ণস্বরে সে করত চিৎকারের পর চিৎকার যে ঘুম পালিয়ে যেত সে পাড়া ছেড়ে।

ক্রমে চাচার মনে হল অতি-দর্পের সঞ্চার। এটা ভালো কথা নয়।

কারণ কে না জানে, অতি দর্প হচ্ছে অধঃপতনের পূর্ব লক্ষণ।

শোনা যায়, চাচা নাকি ইদানীং মনে করত যে, তারই ডাক শুনে অন্ধকার পালিয়ে যায় পৃথিবী থেকে এবং তারই হুকুমে সূর্য ছুটে আসে ভোরের আকাশে।

গাঁয়ের পরে মাঠ, মাঠের পারে গহন বন।

সেই বনে বাস করত এক ভুঁড়ো শেয়াল। চাচাকে দেখলেই তার জিভ দিয়ে ঝরত জল। কিন্তু আজ তিন বছর ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে চাচার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারেনি। শেয়াল অবশেষে স্থির করলে, চাচার অতি-দর্প আরো বাড়িয়ে দিয়ে সে করবে নিজের কার্যোদ্ধার।

চাচা কিন্তু এদিকে মোটেই বোকা ছিল না। সে নিজে থাকত সর্বদাই সতর্ক এবং নিজের বউ-ঝিদের রাখত পরম সাবধানে। সঙ্গে নিজে না থাকলে ছেলেমেয়ে বউদের সে কোথাও যেতে দিত না। পরিবারের কেউ কোনো ভালো খাবার চাইলে সে নিজে গিয়ে ঠোঁটে ক'রে খুঁটে তুলে নিয়ে আসত।

চাচা একদিন খাবারের খোঁজে মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে পোকা-মাকড়ের লোভে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে, হঠাৎ খুব কাছের একটা ঝোপ হঠাৎ একটু দুলে উঠল। চমকেই চাচা দেখতে পেলে ঝোপের ফাঁকে শেয়ালের নাকের ডগা।

চাচা তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষ বিস্তার করল—শূন্যে ওড়বার জন্যে।

শেয়াল তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও চাচা, উড়ো না, উড়ো না। আমি তোমাকে ভক্ষণ করতে আসিনি।"

চাচা পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে বললে, "তাই না-কি ?"

শেয়াল বললে, "হ্যাঁ চাচা। আমি গান বড়ো ভালবাসি কি-না, তাই তোমার গান শুনতে এসেছি।"

চাচা আরো খানিক পিছু হটে গিয়ে বললে, "আমি এখন গান গাইতে চাই না, এখান থেকে সরে পড়তে চাই।"

শেয়াল বললে, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। তিনিও

খাসা গান গাইতেন।”

এইবারে চাচার আত্মদর্প জেগে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, “বাবা কি আমার চেয়েও ভালো গান গাইতে পারতেন?”

শেয়াল বললে, “তোমার বাবার কণ্ঠস্বর ছিল স্বর্গীয়। তুমিও বেশ গাও, তবে আমার মনে হয়, তোমার বাবার গাইবার পদ্ধতিটি ছিল আরো ভালো।”

চাচা কৌতূহলী হয়ে বললে, “কি রকম?”

শেয়াল বললে, “তোমার বাবা আকাশের দিকে চোখ তুলে দুই চোখ মুদে ফেলে গান গাইতেন। আমার বিশ্বাস, ঐভাবে গান গাইলে তুমিও তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।”

শেয়ালের ধাপ্পায় ভুলে চাচা তখনি আকাশমুখো হয়ে দুই চক্ষু মুদে ডাক ছাড়লে—“কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ।”

শেয়াল অমনি এক লাফে এগিয়ে এসে ঘ্যাঁক করে চাচাকে কামড়ে ধরে ছুট মারলে বনের দিকে।

চাচা তখন দেখিয়ে দিলে কাকে বলে গলার জোর। সে এমন বিষম চিৎকার শুরু করলে যে, চারিদিক থেকে দৌড়ে এল সারা গাঁয়ের লোকজন। তারা হৈ চৈ ক'রে ছুটে চলল শেয়ালের পিছনে পিছনে।

মাঠ শেষ হয়-হয়, সামনেই গহন বন।

এত বিপদেও চাচা কিন্তু বুদ্ধি হারায়নি। সে বুঝলে, শেয়াল যদি একবার বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলে আর তার নিস্তার নেই।

ভেবে-চিন্তে সে বললে, “ওহে শেয়াল, তুমি অত বোকা কেন? যারা ছুটে আসছে তাদের ডেকে বলনা, তুমি যখন বনের এত কাছে এসে পড়েছ তখন আর কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না।”

শেয়াল ভাবলে এ পরামর্শ মন্দ নয়, একথা শুনলে লোকগুলো নিশ্চয়ই আর আমাকে তাড়া করবে না।

সে কথা বলবার জন্যে হাঁ করতেই তার মুখ থেকে খ'সে পড়লো

চাচার দেহ।

চাচা অমনি সোঁ করে উড়ে গিয়ে বসল একটা বড় গাছের উঁচু ডালের উপর।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হতভম্ব শেয়াল।

একেই বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

বাঁকা-শ্যামের ব্যায়রাম

রেগে করে গজ্-গজ্,
বাড়ি ওর বজ্-বজ্,
বাঁকা শ্যাম বেঁচে আছে গিলে খালি সাল্সা!
দাও যদি সরবৎ,
মুখ হবে পর্বত,
লাথি মেরে ভেঙে দেবে মেঠায়ের মাল্সা!
দিতে এলে দই-টই,
মানা করে পৈ-পৈ,
আঁৎ তার ছাঁৎ ছাঁৎ খেতে দিলে কুল্পি!
নেই কিছু রস-কস্,
রুখু চুল খস্-খস্,
দাড়ি-গোঁফ চাঁচে বটে, কামাবে না জুল্পি!
প্রাণে নেই সখ-টক্,
কেশে মরে খক্ খক্,
যায়নাকো পুকুরেতে, পাছে হয় মগ্ন!
শুঁক্‌বে না ফুল-টুল,
পুষ্‌বে না বুলবুল,
মুদ্‌বে না চোখ আর দেখ্‌বে না স্বপ্ন!

ফুট-ফুটে জোছনায়,
সাল্‌সা সে রোজ খায়,
আর খায় ছাঁচি-পানে মিঠে-কড়া দোক্তা।
বড় বড় ডাক্তার,
লুটে খায় ট্যাঁক্ তার,
আসে-যায়, বোঝে নাকো এ কেমন রোগ তা।
"হা হা হু হু জান যায়!"
এই ব'লে গান গায়,
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে ডাহা আমপিত্তি।
হাড়ে নেই মাস-টাস্,
বিছানায় হাঁসফাঁস্,
ঠ্যাং ছোঁড়ে খুব জোরে মাথা কুটে নিত্যি।
কবিরাজ রামধন,
শেষে বলে—"শ্যাম, শোন্,—
ভালো যদি হ'তে চাস্, মোর কাছে যাস্ তো।"
গেল শ্যাম ঠুক্ ঠুক্,
দেখে তার মুখ-বুক,
দিল তাকে সাল্‌সা না,—খাবি খেতে আস্ত।
শ্যাম বলে, "জয় জয়!
নেই আর ভয়-টয়!"
চিৎ হয়ে খেল খাবি, বার ক'রে দন্ত।
সেরে গেল রোগ তার,
যত-কিছু ভোগ আর,
কবিরাজ রামধন সোজা লোক নন তো।

বুদ্ধদেবের গল্প

উপদেশ দেবার সময়ে বুদ্ধদেব এই গল্প দু'টি বলেছিলেন।

প্রথম গল্পটির নাম 'দুই ভোঁদড় ও একটি শেয়াল।'

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিল দুটি ভোঁদড়। হঠাৎ দেখা গেল জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছে একটা মস্ত মাছ।

একটা ভোঁদড় তখনি জলে ঝাঁপ খেয়ে মাছের ল্যাজটা কামড়ে ধরলে। কিন্তু মাছটা এমন প্রকাণ্ড যে, ভোঁদড় তাকে টেনে ডাঙায় তুলে আনতে পারলে না।

সে তখন দ্বিতীয় ভোঁদড়কে ডাক দিয়ে বললে, "শীগ্‌গির এস ভায়া। মাছটাকে আমি একলা সামলাতে পারছি না।"

দ্বিতীয় ভোঁদড়ও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তারা দুজনে মিলে মাছটাকে বধ ক'রে ডাঙার উপরে তুলে আনলে।

তারপর দুজনের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া।

প্রথম ভোঁদড় বললে, "এটা আমার মাছ। আমি একে আগে ধরেছি।"

দ্বিতীয় ভোঁদড় বললে, "বাজে কথা রেখে দাও। আমি না এলে মাছটা তো পালিয়ে যেত। এটা আমার মাছ।"

তাদের চ্যাঁচামেচি শুনে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল। কাছে এসে সে সুধোলে, "কি হে, ব্যাপার কি?"

সব কথা তাকে জানিয়ে ভোঁদড়রা বললে, "শেয়াল-ভায়া, তোমাকেই আমাদের উকিল নিযুক্ত করলুম। এখন তুমিই একটা মীমাংসা ক'রে দাও।"

শেয়াল প্রথমে মাছের মাথা এবং তারপর তার ল্যাজ কামড়ে

কেটে ফেললে। বললে, "আমার মতে তোমরা দুজনেই সমান অংশের অধিকারী।"

শেয়াল মাছের মাথাটা দিলে প্রথম ভোঁদড়কে এবং দ্বিতীয় ভোঁদড়কে দিলে মাছের ল্যাজটা। তারপর মাছের ধড়টা নিজে নিয়ে সেখান থেকে মারলে ছুট্।

ভোঁদড়রা চিৎকার করলে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। মাছের আসল অংশটাই নিয়ে তুমি যে পালিয়ে যাচ্ছ।"

শেয়াল বললে, "তা ছাড়া আর কি করব ভায়া ? তোমরা কি জানো না, উকিল রাখলেই ফি দিতে হয়। তোমরা নিজেরাই মীমাংসা করতে পারলে গোটা মাছটা থাকত তোমাদেরই।"

এই কাহিনীটির সার মর্ম হচ্ছে ; সাধ্যমত চেষ্টা করবে উকিলদের এড়িয়ে চলতে।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম, "বাঁদর ও কলাইশুঁটি।"

মহাপ্রতাপশালী কাশীর মহারাজা। তিনি ধন-ধান্যে ভরা প্রকাণ্ড রাজ্যের মালিক। অগুন্তি প্রজা। তাঁর ঐশ্বর্যের নেই সীমা।

কাছেই ছোট্ট একটি রাজ্য, তার ভূমি নয় সুজলা সুফলা এবং অবস্থা-পন্ন লোকও বাস করে না সেখানে।

কাশীর মহারাজা স্থির করলেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই তুচ্ছ দেশটি দখল করবেন।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আপনার সম্পদের তুলনা নেই। কি ছার ঐ দেশ, ওটা দখল করবার জন্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ লোকক্ষয় ক'রে লাভ কি ?"

মহারাজা বললেন, "আমার লাভ-লোকসান নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করুন।"

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে মহারাজা করলেন যুদ্ধযাত্রা। তারপর খানিক দূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল এক মজার দৃশ্য।

জনকয় সৈন্য কলাইশুঁটি সিদ্ধ করেছিল। পথের ধারে ছিল একটা গাছ এবং সেই গাছে ছিল একটি বাঁদর। হঠাৎ গাছ ছেড়ে মাটিতে

লাফিয়ে প'ড়ে সে কতকগুলো কলাইশুঁটি চুরি ক'রে আবার লাফ মেরে গাছে উঠল এবং খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

তার হাত ফস্‌কে প'ড়ে গেল একটা কলাইশুঁটি। বোকা বাঁদরটা লোভী চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের অন্য কলাই-শুঁটিগুলো ফেলে দিয়ে সেই একটিমাত্র কলাইশুঁটি আবার হস্তগত করবার জন্যে গাছ থেকে নেমে এল।

কিন্তু এবারে তার মনের বাসনা সফল হ'ল না। একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে মার্ মার্ ক'রে তেড়ে এল। আত্মরক্ষার জন্যে সমস্ত কলাইশুঁটি ত্যাগ ক'রে বাঁদরকে আবার গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় নিতে হ'ল। সেইখানে ব'সে এমন দুঃখিতভাবে সে বারংবার মাটির দিকে তাকাতে লাগল, যেন মস্ত এক রাজ্য তার হাতছাড়া হয়েছে।

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, দেখলেন ?"

মহারাজা বললেন, "হ্যাঁ মন্ত্রী, দেখলুম। বাঁদরটা এমন নির্বোধ যে, একটা কলাইশুঁটির লোভে সব কলাইশুঁটি হারালো।"

মন্ত্রী বললেন, "একটুখানির জন্যে অনেকখানি হারানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মহারাজ, তুচ্ছ এক দেশ জয় করতে গিয়ে আপনিও কত সৈন্য হারাতে পারেন, সেটা একবার ভেবে দেখেছেন কি ?"

মহারাজা বললেন, "সৈন্যগণ, আবার কাশীতে ফিরে চল। আমি আর যুদ্ধযাত্রা করব না।"

কাহিনীটির সারমর্ম হচ্ছে : বেশি-কিছু লাভের লোভে যেন তুমি হাতে যা আছে তাও হারিয়ে ফেল না।

হাবুবাবুর মনের কথা

আবার এস দুগ্‌গা-ঠাকুর, কৈলাসের ঐ কোন হ'তে,
নতুন কাপড়, নতুন জুতো জুটবে তোমার দৌলতে।
দুগ্‌গা-ঠাকুর! একটি কথা আমায় তুমি দাও ব'লে,
থাক্‌তে এমন বাপের বাড়ি, আবার কেন যাও চ'লে?
শ্বশুরবাড়ি শ্মশান তোমার, বরটি তোমার আস্ত সং,
ট্যাক্সি-মোটর চোখের বালি, চড়্‌তে ষাঁড়ে ব্যস্ত হন।
ভাং খাবে আর টানবে গাঁজা, রুক্ষ জটায় গোখরো সাপ,
শ্যাঙাত যত দৈত্য-দানা, ভূতের ছানা—বাপ্‌রে বাপ্‌!
নেই সেখানে যাত্রা এমন, লাফ মারেনা বীর হনু,
ভীমার্জুনের নেইকো গদা, হুহুঙ্কার আর তীর-ধনু,
বরফ পড়ে রাত্রি-দিনই, শীতের চোটে প্রাণ কাঁপায়,
সর্দি হাঁচির অত্যাচারে সূয্যি-চাঁদের ট্যাঁকাই দায়!
রসগোল্লা কোথায় পাবে, নেই সে দেশে বাগবাজার,
শিব ভিখারী,—দেয় না এনে মটুক তাগা চন্দ্রহার!
শ্মশানেতে হাট বসে না—শক্ত জোটা মালসাটাও,
গণেশদাদার অসুখ হ'লে কৈলাসে কি সালসা পাও?
ডাল-ভাতে-ভাত তাও জোটে কি? পাওনা বোধ হয় অম্বলও?
এমন দেশেও দেবতা থাকে! আরে ছো ছো রাম বলো!
আছ হেথায় রাজভোগে আর অঙ্গে রাণীর সাজ পরো,
এ-সব কি মা ছাড়তে আছে?—তার চেয়ে এক কাজ করো।
শ্বশুর-বাড়ি আর যেও না, শিবের কথা যাও ভুলে,
সারা-বছর পুজোর ছুটি পাই তাহলে ইস্কুলে।
হিস্ট্রি-গ্রামার-ব্যাকরণের ভক্ত হবে উইপোকা,
বন্ধ হবে মাস্টারদের বেত-নাড়া আর তাল-ঠোকা।

মা-বাবা আর খেলতে দেখে বকবে নাকো কান ধ'রে,
আমরা খালি যাত্রা দেখে হাস্‌ব হো হো প্রাণ ভ'রে!
ঠাকুর, তোমার হোক সুমতি, আর যেওনা পায় পড়ি!
আমার কথা শুনলে পাবে রোজই পাঁঠার চচ্চড়ি!

একটার বদলে ছুটো

(প্রাচীন জার্মান রূপকথা)

এক

হের ক্লাসেন বললেন, "দেখ বাপু, আমার কথার আর নড়চড় হবে না। আমি এক কথার মানুষ। অবশ্য, যদি তোমার পিঠের কুঁজটি পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারো, তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে, নইলে নয়। এই ব'লে তিনি বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলেন।

ফ্রিডেল বেচারী মুখখানি চুন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে কাথারিনা এসে হাজির। কাথারিনা হচ্ছে সরাইখানার মালিক হের ক্লাসেনের মেয়ে।

কাথারিনা বললে, হ্যাঁ ফ্রিডেল, তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন, হয়েছে কি ?"

ফ্রিডেল দুঃখিত ভাবে বললে, "কাথারিনা, তোমার বাবাকে আজ বললুম যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তোমার বাবা আমাকে জামাই করতে রাজি নন।"

কাথারিনা ব্যস্ত হয়ে বললে, "সে কি ফ্রিডেল, তোমার পিঠে যে কুঁজ আছে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন ক'রে ?"

ফ্রিডেল একেবারে হতাশ হয়ে বললে, "কাথারিনা, তুমিও আমাকে কুঁজো বলে ঘেন্না কর! তা হ'লে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা!" ব'লেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

কাথারিনা লজ্জিত হয়ে ব্যাকুলভাবে বললে, ফ্রিডেল, ও ফ্রিডেল!

শোনো, শোনো, শোনো—যেও না! আমি হঠাৎ ও-কথা ব'লে ফেলেছি, আমি তোমাকে সত্যিই ঘেন্না করি না! যেও না ফ্রিডেল, তোমার পায়ে পড়ি!" কিন্তু ফ্রিডেল তার কথা শুনতে পেলে না!

দুই

গাঁয়ের একটি বিয়ে-বাড়িতে সে দিন বড় ধুম! খাওয়া-দাওয়ার পর রূপসী মেয়েরা আর পুরুষেরা নাচবার জন্যে সারবন্দী হয়ে অপেক্ষা করছে,—কিন্তু ফ্রিডেল আসে-নি ব'লে নাচ শুরু হচ্ছে না।

সে অঞ্চলে ফ্রিডেলের মতন বেহালা বাজাতে আর কেউ পারত না! আর সে বেহালা না বাজালে নাচতে পারত না মেয়েরাও।

একটু পরেই একজন ব'লে উঠল, "ঐ ফ্রিডেল আসছে!"

কিন্তু আর একজন ভালো ক'রে দেখে বললে, "না, না, ও তো ফ্রিডেল নয়, ওযে কুঁজো হীন্‌য্‌!"

হীন্‌য্‌ও সেই গাঁয়ে থাকে, ফ্রিডেলের মত তার পিঠেও কুঁজ আছে, আর সেও বেহালা বাজায়। তবে পিঠে কুঁজ থাকলেও ফ্রিডেলের চেহারা ছিল সুন্দর ও স্বভাব ছিল শান্ত, কিন্তু হীন্‌য্‌ ছিল একেবারে উল্টো-ধরনের লোক! দেখতেও সে যেমন কুৎসিত, প্রকৃতিও তার তেম্‌নি বিশ্রী। তার বেহালাও কেউ শুনতে চাইত না, কারণ হীন্‌যের বাজনা ঝালা-পালা ক'রে দিত লোকের কানকে!

হীন্‌য্‌ সকলের মাঝখানে এসে মুরুব্বি-আনা চালে মাথা নেড়ে বললে, "এই যে, সকলেই নাচের জন্যে তৈরি দেখছি যে! আচ্ছা, আমিও প্রস্তুত! আমি বাজাই, তোমরা নাচো!" ব'লেই সে বেহালা ও ছড়ি বাগিয়ে ধরলে!

বিয়ে-বাড়ির লোকেরা বললে, "ওহে হীন্‌য্‌, আজ আর তোমাকে বাজাতে হবে না,—তুমি খাও-দাও, ফুর্তি কর! আজকের নাচে বেহালা বাজাবার জন্যে তোমার আগেই আমরা ফ্রিডেলকে ব'লে রেখেছি, সে এখনি আসবে।"

হীন্‌য্‌ রাগে মুখ বেঁকিয়ে বললে, "বটে, বটে, আমার আগেই তোমরা ফ্রিডেলকে ব'লে রেখেছ? কেন, ফ্রিডেলও কি আমারি মতন কুঁজো নয়?"

এমনি সময়ে ফ্রিডেলও এসে হাজির! মেয়েরা সবাই খুশি হয়ে ফ্রিডেলকে ঘিরে দাঁড়াল—হীন্‌যের দিকে কেউ আর ফিরেও তাকালে না।

ফ্রিডেলের সামনে তারা আদর ক'রে খাবারের থালা এনে ধরলে। তারপর তার খাওয়া শেষ হ'লে পর সকলে বললে, "ভাই ফ্রিডেল, এই-বার তুমি বেহালা বাজাও, আর আমরা সবাই নাচি!"

বেহালাখানি টেবিলের নিচে রেখে ফ্রিডেল খেতে ব'সেছিল। এখন বেহালা টেনে বার ক'রে ফ্রিডেল অবাক হয়ে দেখলে তার সমস্ত তারগুলি কে ছিঁড়ে দিয়েছে!

সবাই রেগে বললে, "এ সেই কুঁজো হীন্‌যের কাজ। হতভাগা গেল কোথায়?"

খুঁজতে খুঁজতে হীন্‌য্‌ ধরা প'ড়ে গেল। সে টেবিলের তলাতেই মাথা গুজড়ে লুকিয়ে ব'সেছিল! সবাই তখনি তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বার ক'রে আনলে।

কেউ বললে, "ওকে জেলখানায় পাঠিয়ে দাও!"

কেউ বললে, "ওকে আচ্ছা ক'রে বেত মারো!"

কেউ বললে, "ওকে চ্যাংদোলা ক'রে নদীর ভেতরে ফেলে দাও!"

ফ্রিডেল বললে, "আহা, ওকে ছেড়ে দাও! আমি এখনি বাড়িতে ছুটে গিয়ে নতুন তার নিয়ে আস্‌ছি!"

তিন

বিয়ে-বাড়িতে বাজিয়ে ফ্রিডেল অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাথারিনার জন্যে তার মন কেমন করছিল! হায়, সে যদি না কুঁজো হ'ত, তাহ'লে আজ কাথারিনাকে অনায়াসেই বিয়ে করতে পারত।

ঠিক রাত-বারোটার সময়ে ফ্রিডেল আবার বাড়ির দিকে ফিরলে। পথে-ঘাটে কোথাও জন-মানবের সাড়া নেই—দু-পাশে খালি গাছ-

পালারা অন্ধকারের ভিতরে লুকিয়ে আর্তনাদ করছে।

হঠাৎ দূরে অনেকগুলো আলো দেখে ফ্রিডেল কেমন চমকে উঠল আরো কিছু এগিয়ে সে দেখলে, দিনের বেলায় যেখানে হাট বসে, এই নিষুতি রাত্রে সেখানে চারিদিকে দুলছে আলোর মালা। অত্যন্ত অবাক হয়ে সে পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে আরো দেখলে, সেখানে কারা সব চলা-ফেরা করছে।

ফ্রিডেলের মনে ভারি ভয় হ'ল, কিন্তু বাড়ি ফেরবার আর পথ নেই ব'লে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও রইল না।

হাটের মাঝে রূপোলী ঝালরওয়ালা সামিয়ানা টাঙানো রয়েছে, নিচে সোনালী গালিচা পাতা। চারিধারে সোনার থালা-বাটি সাজানো আর নানারকম আহারের আয়োজন। অনেকগুলি পরমা সুন্দরী মেয়ে সেজে-গুজে ব'সে রয়েছে, তাদের অনেকের মুখ দেখে ফ্রিডেল চিনতেও পারলে।

ফ্রিডেলের বুক একেবারে দ'মে গেল, কারণ যাদের সে চিনতে পারলে তারা এই গায়েরই মেয়ে বটে, কিন্তু তারা কেউ আর বেঁচে নেই!

এমন সময়ে মেয়েরাও তাকে দেখতে পেলে। একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, "এই যে ফ্রিডেল, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ! আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে, তুমি বাজনা শুরু কর, আমরা সবাই মিলে নাচি আর গাই।"

ফ্রিডেল-বেচারী তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কিন্তু উপায়ও নেই, প্রাণের দায়ে সে বেহালা নিয়ে তারের উপরে দিলে ছড়ির টান।

বেহালা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েগুলি উঠে হাত-ধরাধরি ক'রে নাচ-গান আরম্ভ করলে। বেহালার সুর যত দ্রুত হয়, মেয়েগুলির আনন্দও তত বেড়ে ওঠে। ফ্রিডেল যেন স্বপ্নের ঘোরে বাজাতে বাজাতে দেখতে লাগল, মেয়েগুলি বাতাসে ওড়া-ফুলের পাপড়ির মত ঘুরতে ঘুরতে নাচছে, কিন্তু তাদের কারুর পা মাটিতে ঠেকছে না।

হঠাৎ যে মেয়েটি কথা কয়েছিল, সে আবার বললে, "ফ্রিডেল, আমাদের সাধ মিটেছে, তুমি বাজনা থামাও।"

ফ্রিডেল তাড়াতাড়ি বাজনা থামিয়ে সেখান থেকে পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে, "দাঁড়াও ফ্রিডেল, যেও না! তুমি চমৎকার বাজিয়েছ, এস, আমি তোমাকে খুশি ক'রে দি!"

ফ্রিডেল ভয়ে ভয়ে তার কাছে এগিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটির হাতে একটি সোনার দণ্ড ছিল, তাই দিয়ে ফ্রিডেলের পিঠের কুঁজটি স্পর্শ ক'রে সে বললে, "আজ থেকে তোমার পিঠে আর কুঁজ থাকবে না!"

তারপরই সব আলো নিবে গেল—চারিদিক অন্ধকার! ফ্রিডেল বাড়িতে ফিরে এল ঠিক মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে!

কাথারিনার বাপ হের ক্লাসেন সকাল বেলায় সরাইখানায় ব'সে আছেন, এমন সময়ে একটি সুশ্রী যুবক এসে তাঁকে নমস্কার করলে।

হের ক্লাসেন হতভম্ব হয়ে যুবকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "কি আশ্চর্য! ছোক্‌রা, তোমার পিঠে যদি কুঁজ থাকত, তাহ'লে আমি তোমাকে ফ্রিডেল ব'লেই ভাবতুম! কিন্তু তোমার পিঠে যখন কুঁজ নেই, তখন তুমি কে?"

ফ্রিডেল হেসে বললে, "আমি ফ্রিডেল। আমার পিঠে এখন আর কুঁজ নেই, এখন আপনি নিজের কথামত কাজ করুন—আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন!"

হের ক্লাসেন মাথা নেড়ে বললেন, "তুমি কখনোই ফ্রিডেল নও! পিঠের কুঁজ কখনো আপনা-আপনি খ'সে পড়ে না।"

ফ্রিডেল তখন গেল-রাতের কথা একে একে সব খুলে বললে। সমস্ত শুনে হের ক্লাসেন বললেন, অবাক কারখানা! আমিও অনেকবার কানা-ঘুষো শুনেছি বটে যে, হাটে রাত-বারোটার পর ভুতুড়ে আসর ব'সে, কিন্তু সে-সব গল্প আমি বরাবরই গাঁজাখুরি ব'লে ভাবতুম। যাক্, তোমার পিঠে যখন আর কুঁজ নেই, তখন তোমাকে জামাই করতে আমারও আর কোন আপত্তি নেই।"

তারপর একদিন খুব ধুমধাম ক'রে ফ্রিডেলের সঙ্গে কাথারিনার বিবাহ হয়ে গেল!

চার

কুঁজো হীন্‌য্‌ যখন ফ্রিডেলের সৌভাগ্যের কথা শুনলে, তখন রাগে আর হিংসায় তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

বিয়ের রাতে ফ্রিডেল তাকে নাচের বাজনা বাজাবার জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল, হীন্‌য্‌ কিন্তু সেখানে না গিয়ে, রাত-বারোটার সময়ে বেহালা বগলে নিয়ে হাটের দিকে যাত্রা করলে।

হাটের কাছে গিয়ে হীন্‌য্‌ও দেখলে, সাজানো-গুছানো আসরের মধ্যে পরমা সুন্দরী মেয়েরা ব'সে আছে, চারিধারে আলোর মালা দুলছে!

হীন্‌য্‌কে দেখেই মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এস, এস, আমাদের নাচের সময় হয়েছে, তুমি বেহালা ধর!"

হীন্‌য্‌ ঝাঁকে ডগমগ হয়ে নাচের তালে বেহালা বাজাতে শুরু করলে! কিন্তু মেয়েদের মধ্যে চেনা মুখ দেখে সে ফ্রিডেলের মতন চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, বাজাতে বাজাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এই যে, জমিদারদের ছোট বৌ যে! আরে আরে, ও-পাড়ার পুরুত-বৌ নাকি? বলি কেমন আছ? ওহো, তোমাকেও যে চিনি,—আমাদের বুড়ো-ডাক্তারের নাতনি, না?"—কিন্তু হীন্‌য্‌ যেই এক-একজনের নাম ধ'রে ডাকে, অমনি সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়! দেখতে দেখতে দলের অধিকাংশ মেয়েই মিলিয়ে গেল! তার উপরে হীন্‌যের কর্কশ আর বেতালা বাজনার সঙ্গে নাচতে না পেরে বাকি সকলেও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল! তারপর ধীরে ধীরে আলোগুলো ম্লান হয়ে আসতে লাগল।

একটি মেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "বাজনা বন্ধ কর!"

হীন্‌য্‌ বাজনা থামিয়ে বললে, "ওঃ, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে, এখন আমাকে খুশি কর!"

মেয়েটি বললে, "তোমাকে খুশি করব?"

হীন্‌য্‌ বললে, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তোমরা ফ্রিডেলকে খুশি করেছ, আমিও বখসিস চাই!"

মেয়েটি বললে, "তুমি এখানে ফ্রিডেলের মতন হঠাৎ এসে পড় নি, লোভে প'ড়ে এসেছ। তোমার বেতালা বেহালার জন্যে আমাদের নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমাদের দলের মেয়েরা পালিয়ে গেছে। এই নাও তোমার যোগ্য পুরস্কার।"—এই ব'লে মেয়েটি হীন্‌য্‌-এর বুকে হাতের স্বর্ণদণ্ড ছুঁইয়ে দিলে,—অম্‌নি ফ্রিডেলের সেই খ'সে-পড়া কুঁজটি তার বুকের উপরে এমন কায়েমি হয়ে ব'সে গেল যে, দেখলে মনে হয় যেন সেটি তার জন্মাবধিই সেইখানে ঐ ভাবেই আছে।...

পরদিন সকালে উঠে নিজের বুকে হাত দিয়ে হীন্‌য্‌ দেখলে যে, কালকের রাতের ব্যাপারটা মোটেই দুঃস্বপ্ন নয়, কারণ তার বুকের উপরে সত্যই একটা মস্ত কুঁজ গজিয়ে উঠেছে এবং বাকি জীবনটা তাকে একটার বদলে দুটো কুঁজের ভার বহন ক'রে বেড়াতে হবে।

বংশীধারীর বাঁশী

অমর ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের একটি বিখ্যাত গাথা আছে, তার নাম The Pied Piper of Hamelin—এবারে সেই গল্পটি তোমাদের শোনাব।

হ্যামেলিন হচ্ছে জার্মানীর একটি পুরাতন শহর। তার তলা দিয়ে বয়ে যায় ওয়েসার নদী।

জায়গাটি ভারি চমৎকার। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন ওখান-কার বাসিন্দারা পড়েছিল বড় বিপদে।

ইঁদুর আর ইঁদুর আর ইঁদুর! শহরের ঘরে ঘরে ইঁদুরের বিষম উপদ্রব। তারা দলে দলে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে, বিড়ালদের বধ করে, দোলনায় ঘুমন্ত শিশুদের কামড়ে দেয়, গৃহস্থদের খাবার খেয়ে ফেলে, মানুষদের টুপির ভিতরে ঢুকে বাসা বাঁধে—এমন কি তাদের কিচকিচিনিতে গল্প করতে ব'সে মেয়েরা পরস্পরের কথা পর্যন্ত শুনতে পায় না।

বাসিন্দারা আর সহ্য করতে পারলে না। তারা ক্ষেপে উঠে বললে, "আমাদের কর্পোরেশনের নিকুচি করেছে! কাউন্সিলাররা আমাদের টাকায় দিনে দিনে কেবল ভুঁড়ির বহরই বাড়িয়ে তুলছে! আমরা আর তাদের মানব না। হয় তারা ইঁদুর তাড়াবার ব্যবস্থা করুক, নয় আমরা তাদেরই তাড়াবার ব্যবস্থা করব!"

মহা ফাঁপরে পড়ে মেয়র এক সভা আহ্বান ক'রে কাউন্সিলারদের ডেকে বললেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, অনেক মাথা চুলকেও আমি কোনই উপায় আবিষ্কার করতে পারছি না—আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি!"

সভাগৃহের দরজায় বাহির থেকে করাঘাতের শব্দ হ'ল।

মেয়র বললেন, "কে ওখানে? ভেতরে এস।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এক আশ্চর্য চেহারা! তার মুখে গোঁফ দাড়ি নেই, চোখদুটো কুৎকুতে আর ঠোঁটে মাখানো হাসি।

সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কে রে বাবা?

সে হেসে বললে, "আমার নাম বংশীধারী। আকাশে যারা ওড়ে, জলে যারা সাঁতরায়, আর ডাঙায় যারা দৌড়য়, এমন সব জীবকে বশ করবার যাদু আমি জানি। যে সব জীব মানুষের শত্রু, বিশেষ ক'রে তাদেরই আমি জব্দ করতে পারি। এই শহর থেকে সমস্ত ইঁদুর যদি আমি তাড়িয়ে দি, তাহ'লে তোমরা আমাকে হাজার টাকা বখসিস দিতে রাজি আছ?"

মেয়র আর কাউন্সিলাররা একবাক্যে ব'লে উঠলেন, "মাত্র এক হাজার কেন, আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজি।"

ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে হাসতে বংশীধারী রাস্তায় বেরিয়ে গেল, তারপর নিজের বাঁশীটি বার ক'রে দিলে তিন ফুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দূরে জেগে উঠল, যেন বিপুল এক সেনাদলের চীৎকার!

তারপরেই দেখা গেল, চারিধার ছেয়ে ছুটে আসছে ইঁদুর আর ইঁদুর আর ইঁদুর! কালো ইঁদুর, ধলো ইঁদুর, রোগা ইঁদুর, মোটা ইঁদুর, বুড়ো ইঁদুর, ছোঁড়া ইঁদুর, মা ইঁদুর, বাবা ইঁদুর, ভাই ইঁদুর, বোন ইঁদুর কাতারে

কাতারে হাজারে হাজারে, ল্যাজ উঁচিয়ে গোঁফ ফুলিয়ে!

বাঁশী বাজাতে বাজাতে বংশীধারী এগিয়ে যায়, ইঁদুররাও ছোটে তার পিছু পিছু। এ পথ সে পথ দিয়ে বংশীধারী শেষটা ওয়েসার নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল, আর মন্ত্রমুগ্ধ ইঁদুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে, কেউ আর ডাঙায় উঠতে পারলে না।

বংশীধারী তখন ফিরে বললে, "এইবারে আমি হাজার টাকা চাই।"

মেয়র চোখ মট্‌কে বললেন, "স্বচক্ষে দেখলুম ইঁদুরগুলো নদীর জলে ডুবে মরল! আর যখন তারা বাঁচবে না, তখন খামোকা তোমাকে হাজার টাকা দেব, আমরা এমন বোকা নই! বাপু, গোটা পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, এই নিয়ে খুশি হ'য়ে স'রে পড়।"

বংশীধারী বললে, "হাজার টাকা দেবে না? কিন্তু আবার যদি আমি বাঁশী বাজাই তাহ'লে উল্টো বিপত্তি হবে কিন্তু!"

মেয়র চ'টে বললেন, "কী, ছোট মুখে বড় কথা! বাজা তোর বাঁশী, আমরা থোড়াই কেয়ার করি।"

বংশীধারী আবার তার বাঁশিতে দিলে তিন ফুঁ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তিনটি এমন মধুর স্বরতরঙ্গ, যা শুনে পৃথিবী যেন মুগ্ধ হয়ে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে উঠল ছোট ছোট কত পায়ের শব্দ, ছোট ছোট কত হাতের তালি আর ছোট ছোট কত মুখের হাস্যকলরোল! দেখা গেল কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে ছুটে আসছে এ শহরের যত খোকা আর খুকী—গালে তাদের গোলাপী রং, মাথায় তাদের কোঁকড়া-চুল, চোখে তাদের খুশির আলো, দাঁতে তাদের মুক্তার পাঁতি। নাচতে নাচতে ছুটে চলল তারা বংশীধারীর পিছু পিছু।

মেয়র হতভম্ব, কাউন্সিলাররা স্তম্ভিত—সবাই যেন নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! খোকা-খুকীদের বাধা দেবে কি, কেউ একখানা হাত পর্যন্ত নাড়তে পারলে না।

সামনে এক আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। সকলে বুঝলে, এইবারে বংশীধারী আর খোকা-খুকীদের গতিরোধ হবে!

কিন্তু না, হঠাৎ পাহাড়ের একটা জায়গা গেল ফটকের মতন খুলে। বংশীধারী ও শিশুরা ভিতরে ঢুকতেই ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল, পাহাড়ের গায়ে কোন দাগ পর্যন্ত রইল না।

হ্যামেলিন শহরে উঠল হাহাকার। যেখানে ফুলের মত শিশুরা নেই, সে ঠাঁই তো মরুভূমি!

ব্রাউনিংয়ের গল্প তোমরা শুনলে। এটি গল্প বটে, কিন্তু আজও জার্মানীর হ্যামেলিন শহরে গেলে তোমরা দেখতে পাবে, এই ঘটনার নায়ক **Pied Piper** বা বর্ণবিচিত্র বংশীধারীর বাড়ি। ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে ঐ বাড়িখানি নির্মাণ করা হয়েছিল।

শীত

আদ্দি-কালের বদ্দি-বুড়ি, বৃদ্ধ শীতের ধাই!
ছেলে তোমার হিম-সাগরে মারছে কেবল ঘাই!
সাঁতার-খেলার হিমের ছিটে,
হ্যায় ভিজিয়ে পৃথিবীটে,
হিমালয়ের গর্তে শুয়ে তুলছ তুমি হাই,
শীত-ব্যাটাকেও নাওনা ডেকে,—নইলে মারা যাই!

দাঁত-ঠক্‌ঠক্, বুক শির্ শির্, কন্‌কনানি খুব!
দখিন হাওয়া আজ বিবাগী, কোকিলগুলো চুপ!
চাঁদা-মামার মুখখানা চুন,
সর্দি লেগে হয় বুঝি খুন,
প্রাণের কাঁদন শিশির হয়ে ঝরছে রে টুপ্ টুপ্,
আজ কুয়াশার ফানুস-ঢাকা পূর্ণিমার ঐ রূপ!

বুড়ো শীতের ফোগলা মুখে বরফ-গোলা হাঁপ্,
ঝাপটা মেরে দুনিয়াটাকে করলে বুঝি গাপ্!
কোথেকে যে জুটল অবুঝ,
শুকিয়ে দিলে বনের সবুজ,
ফুলের সাথে হয়নাকো আর মৌমাছির আলাপ,
শিকার-রাতের স্বপন ছাখে গর্তে ঢুকে সাপ!

বদ্দি বুড়ী ঢুলছে তবু, ঐ তো বুড়ীর দোষ!
লক্ষ বছর নিদ্রা দিয়েও মিটল না আফ্সোশ!
ঠাণ্ডাতে বুক যায় কালিয়ে,
পথ থেকে সব আয় পালিয়ে,
আংরাটাতে কয়লা দিয়ে, চারপাশে তার বোস্!
বন্ধ ক'রে জান্‌লা-দুয়ার, আনরে বালাপোশ!

নতুন সিনেমার ছবি

রোজ আমি যেখানে ব'সে লিখি, তার বাঁ-দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার নীলাভ জল-রেখা বিপুল এক ধনুকের মতন বেঁকে 'বালি-ব্রিজে'র তলা দিয়ে চ'লে গিয়েছে দূরে দূরান্তরে এবং ডান দিকে মুখ ফেরালে দেখি, নীলাকাশের আলো-মাখা ছোট্ট একটি ছাদ।

ঐ ছাদের উপরে একটি বাগান রচনা করেছিলুম, রোজ সেখানে ফুটত পাঁচ-ছয় শো নানা জাতের নানা রঙের ফুল। বন্ধুদের চোখে-মুখে বাগানটি জাগিয়ে তুলত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। একটুখানি ছাদের উপরে এত রকম গাছ, এত রঙের ফুল?

সে বাগান আর নেই—আছে তার ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত কড়া-জান, এমন গুটিকয় ফুলগাছ আজও একেবারে মরতে রাজি হয়নি।

বাকি টবগুলো ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আসর পেতেছে বুনো আগাছার এলোমেলো জঙ্গল। একটা মস্তবড় লোহার টবের ভিতরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নিমগাছ। প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে মাথা তুলে হাওয়ায় দুলতে দুলতে সে এই জঙ্গল-সভায় করে সভাপতিত্ব।

আজ সকালে শীতের কাঁচা রোদ এসে ছাদকে যখন ধুয়ে দিচ্ছে সোনার জলে, তখন তোমাদের জন্যে কলম নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ পোড়ো ছাদের কার্নিস থেকে ভেসে এল বিষম কলরব। উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেধেছে দুই শালিকের তুমুল লড়াই। তারা প্রথমে ঘন ঘন মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঠিক যেন পরস্পরকে সেলাম করে, তারপর টপাটপ লাফ মারতে মারতে ও একে ঠুকরে বা আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে কী প্যাঁচ ক'ষে তারা পরস্পরের পা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে থাকে এবং থেকে থেকে পরস্পরকে ঠুকরে দেয়।

একটা মেয়ে-শালিক অনবরত চিৎকার করছে, মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচিলে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে কোনদিক থেকে নতুন কোন বিপদ আসবার সম্ভাবনা আছে কি না, মাঝে মাঝে আবার দুই যোদ্ধার কাছে নেমে এসে শালিক-ভাষায় যা বলছে তার অর্থ হবে বোধ হয় এই ঃ "নাঃ, পুরুষদের নিয়ে আর পারি না বাপু। খালি মারামারি, খালি ঝগড়াঝাঁটি। এ কী মুশকিলে পড়লুম গো।"

এদিকে এই লড়াইয়ের খবর র'টে গিয়েছে দিকে দিকে। ঘটনাস্থলে নানান দর্শক এসে জুটতে লাগল। ছাদের উপরে ছায়া ফেলে চক্র দিয়ে হেঁট মুখে ঘুরতে লাগল চার-পাঁচটা শঙ্খচিল ও গোদা চিল। পাঁচ-সাতটা কাক কা-কা করতে করতে ছাদের পাঁচিলে এসে ব'সে পড়ল। তাদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি দেখলে সন্দেহ হয় তারা যেন শালিক-যোদ্ধাদের উপরে গুণ্ডামী করতে চায়—যদিও তারা অতখানি আর অগ্রসর হ'ল না, কেন তা জানি না।

গঙ্গাতীরে খোড়ো-নৌকার উপর থেকে খবর পেয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক ফচকে চড়াই পাখি। তারা যোদ্ধাদের চারিপাশে নেচে নেচে

বেড়ায় আর যেন কিচির-মিচির ক'রে বলতে থাকে—"নারদ, নারদ, বাহবা-কি-বাহবা!" তিনটে পায়রা লোহার রেলিংয়ের উপর ভীত স্তম্ভিতের মতন ব'সে দেখছে এই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

একটা কাঠবিড়ালীও শিস দিতে দিতে ছুটে এল। তার আগ্রহ আবার সব চেয়ে বেশি। সে সুড় সুড় ক'রে যোদ্ধাদের খুব কাছে এগিয়ে গেল। অমনি মাদী শালিকটা চট ক'রে তা'র সামনে এসে বললে—কোঁ-কটর-কটর, কটর-কটর, কোঁ-কটর-কটর! অর্থাৎ—"হট যাও, নইলে মারলুম এই ঠোকর।"

কাঠবিড়ালী ল্যাজ তুলে লোহার টবের উপরে লাফ মারলে, তার-পর চটপট নিমগাছটার মগডালে উঠে কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ ক'রে বলতে লাগল—"আয়না দেখি পোড়ারমুখী! আয়না দেখি শালিক-ছুঁড়ী!"

শালিখ-বউ কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না।

পনেরো মিনিট কাটল, তবু লড়াই থামবার নাম নেই। দুই যোদ্ধা বেজায় হাঁপাচ্ছে, তাদের গা থেকে পালক খ'সে পড়ছে। দু-চার ফোঁটা রক্তও ঝরল—তবু তারা কেউ পিছপাও হ'তে রাজি নয়। যুদ্ধের কারণ নিশ্চয়ই গুরুতর।

লেখা ভুলে নিশ্চল অবাক হয়ে লড়াই দেখছি। আমি একটা মনুষ্য-জাতীয় ভয়াবহ জীব যে এত কাছে ব'সে আছি, ওরা প্রত্যেকেই যেন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তারপরই বুঝলুম, না, আমার সম্বন্ধে ওরা রীতিমত সজাগ। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে দেখে আমি যেই সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়ালুম, অমনি এই নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রীরা ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে যে যেদিকে পারলে স'রে পড়ল।

ছাদ আবার স্তব্ধ। আগাছার জঙ্গলে ফুটে আছে সাদার সঙ্গে বেগুনী রং-মিশানো ছোট ছোট নামহীন ফুল। একটা একরত্তি হলদে প্রজাপতি তাদের কাছে গেল মধু আহরণের চেষ্টায়। কিন্তু তারপরেই নিজের ভুল বুঝে একদিকে উড়ে গেল ক্ষুদে পাখনা নাড়তে নাড়তে—

রোদ-সায়রে ভাসন্ত পরীশিশুদের খেলাঘরের পাল-তোলা নৌকার মত।

আমি দেখলুম যে-জগৎ আমাদের নয় সেখানকার এক চলচ্ছবি। এমন ছবি তোমরা সিনেমা-প্রাসাদে গেলেও দেখতে পাবে না। অথচ প্রকৃতির চিত্র-জগতে আমাদের আশেপাশেই এমন কত ছবির বাজার নিত্যই খোলা থাকে। আমাদের দেখবার মতন চোখ আর বোঝবার মতন মন নেই ব'লেই এমন সব বিচিত্র ছবির রস আমরা উপভোগ করতে পারি না।

দাদুর গল্প

হুগোর নাম তোমরা শুনেছ তো? ভারতের যেমন কালিদাস, ইংরেজদের যেমন সেক্সপিয়ার, ফরাসীদের তেমনি ভিক্টর হুগো।

হুগোর ছিল একটি নাতি, আর একটি নাতনী। তাদের নিয়ে দাদা-মশাইয়ের দিন কাটে ভারি আমোদে।

নাতনী একদিন কচি কচি ছোট হাত দুখানি দিয়ে হুগোর গলা জড়িয়ে ধ'রে হুকুম দিলে, 'দাদু, একটা গল্প বল।'

দাদু বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কি গল্প বলা যায় বাছা?"

নাতনী বললে, "ইস্, তুমি অত বড় বড় বই লিখেছ, আর একটা ছোট্ট গল্প বলতে পারো না?"

দুদিক থেকে নাতি আর নাতনী বায়না নিয়ে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরলে আরো জোরে। দাদু তখন দায় ঠেকে গল্প শুরু করলেন: এটি হচ্ছে দুষ্টু রাজা আর শিষ্ট মাছির কাহিনী। এক সময়ে এক দেশে এক রাজা ছিলেন—ভারি দুষ্টু রাজা। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই খবর পেলে একটি মাছি। তোমরা যে-সব মাছি দেখ এ মাছিটি তেমন অভদ্র ছিল না। সে মনে মনে দুষ্টু রাজাকে জব্দ করবে বলে স্থির করলে। রাত্রে রাজা পরম আরামে নরম বিছানায়

শুয়ে আছেন, হঠাৎ পট্ করে তাঁর গায়ে স্ঁচের মতন কি বিঁধল। রাজা যাতনায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে রে?" জবাব শোনা গেল,—"আমি একটি মাছি। তোমাকে সায়েস্তা করতে চাই।"—"কী! একটা মাছি? রও, তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।"

রাজা এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে লেপ, চাদর, তোষক ঝাড়তে শুরু ক'রে দিলেন কিন্তু একটি খুব সহজ কারণেই মাছি ধরা পড়ল না। সে তখন রাজার একহাত লম্বা দাড়ির অরণ্যের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে। পাপ বিদায় হয়েছে ভেবে রাজা আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি নাক ডাকাবার আগেই মাছি দাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার তাঁকে কট্ করে কামড়ে দিলে। রাজা মহা ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "ওরে ক্ষুদে মাছি, আমি এত বড় রাজা, তুই কিনা আমাকে কামড়াতে চাস্?"

মাছি কোন জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না, ক্রমাগত তাঁকে কামড়াতে লাগল। সারারাত রাজার চোখে ঘুম নেই, সকালে উঠেই তিনি লোকজন ডেকে সারা প্রাসাদ ঝেঁটিয়ে ধুয়ে সাফ করিয়ে ফেললেন। কিন্তু মাছি তখন রাজার জামার ভিতরে। সেদিন ভালো করে ঘুমোবেন বলে রাজা সন্ধ্যা হতেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে যেই চোখ মুদেছেন, মাছি দিলে অমনি কটাস্ করে এক কামড়।

—"কে রে বেটা?"

—"আমি সেই মাছি।"

—"কী চাস্ তুই?"

—"আমি চাই তুমি সৎ হও, প্রজাদের সুখী কর।"

রাজা চিৎকার ক'রে হাঁকলেন, "হে সৈন্যগণ, হে সেনাপতিগণ, হে মন্ত্রিগণ, তোমরা শীঘ্র এসে আমাকে উদ্ধার কর।"

সবাই ছুটে এল, কিন্তু সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও মাছিকে আবিষ্কার করতে পারলে না। মাছি তখন রাজার চুলের ভিতরে। রাজা অন্য ঘরে ঢুকে শুলেন এক নতুন বিছানায়। কিন্তু মাছির কামড়ের পর কামড় খেয়ে সারা রাত কাটল তাঁর অনিদ্রায়। পরদিন প্রভাতে রাজা

দেশের সমস্ত মক্ষিকা-বংশ ধ্বংস করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু তবু তিনি সেই সুচতুর মক্ষিকার কবল থেকে উদ্ধার পেলেন না। রাতের পর রাত যায়, জেগে জেগে রাজা হয়ে উঠলেন উন্মত্তের মত। তিনি বুঝলেন, এভাবে আর কিছুদিন ঘুমোতে না পেলে পটল তোলা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় নেই। নাচার ভাবে রাজা শেষটা বললেন, "ওরে মাছি, আমি হার মানলুম। আমায় কি করতে হবে বল ?"

মাছি বললে, "তোমাকে প্রজাদের সুখী করতে হবে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন ক'রে আমি তাদের সুখী করব ?"

মাছি বললে, "মুকুট খুলে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও।"

দেশ ছেড়ে রাজা মাছির কামড় থেকে উদ্ধার পেলেন। প্রজাদের আনন্দের সীমা সেই। তারা আর নতুন কোন রাজার খপ্পরে পড়তে চাইলে না, দেশে প্রতিষ্ঠিত করলে প্রজাতন্ত্র।

ইঁদুরদের কীর্তি কাহিনী

জার্মানীর বংশীধারী কেমন ক'রে ইঁদুর তাড়িয়েছিল, সেদিন তোমাদের কাছে সে গল্প বলেছি। আজও তোমাদের শোনাব জার্মান দেশের আর একদল ইঁদুরের কীর্তি-কাহিনী। এ গল্পটি বলেছেন ইংরেজ কবি Robert Southey তাঁর "Bishop Hatto" নামক কবিতায়।

হ্যাটো হচ্ছেন বিশপ, অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ; কিন্তু তিনি যে-সে ধর্মাধ্যক্ষ নন, অনেকটা আমাদের দেশের মোহান্তরই মত। তিনি বড় বড় প্রাসাদ, জমিজমা ও প্রচুর ধনরত্নের মালিক। তাঁর মস্ত মস্ত গোলাবাড়ির ভিতরে জমা করা আছে পর্বতপ্রমাণ শস্যের স্তূপ।

সেবার দেশে হল বিষম দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে গরীবদের কী অবস্থা হয়, এই সেদিনে বাঙ্গালা দেশেই তোমরা সেটা স্বচক্ষে দর্শন

করেছে, সুতরাং এখানে ও-সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবার দরকার নেই। কাজেই অনাহারে মরো মরো হয়ে দলে দলে লোক যে বিশপ হ্যাটোর দ্বারদেশে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়বে, এটা কিছু বিচিত্র কথা নয়।

গরীবরা উপবাস-শীর্ণ হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "ওগো প্রভু, ওগো গরীবের মা-বাপ, তোমার আছে ভাণ্ডার-ভরা শস্যের স্তূপ। তারই কিছু কিছু বিলিয়ে দিয়ে তুমি আমাদের মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা কর—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

দিনের পর যত দিন যায়, গরীবদের কান্না ও আকুল প্রার্থনা তত গগনভেদী হয়ে ওঠে। বিশপ হ্যাটো বুঝলেন, অভাগাদের মুখ আর বন্ধ না করলে উপায় নেই।

তিনি প্রচার করে দিলেন, "এ অঞ্চলে যত গরীব-দুঃখী আছে, সবাইকে আমি গোলা-বাড়িতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করছি। আমি তাদের দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করব।"

চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া! দয়ালু বিশপ যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। দলে দলে, হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে ছুটে এল অনাহারী গরীবেরা। দেখতে দেখতে গোলা-বাড়ির ভিতরে আর তিলধারণের ঠাঁই রইল না।

বিশপ হ্যাটো হুকুম দিলেন, "দ্বারবান! আগে গোলাবাড়ির দরজা বন্ধ ক'র ; তারপর ওর চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দাও।"

দ্বারবানরা প্রভুর আদেশ পালন করলে। দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল আগুনের রক্তশিখা, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জেগে উঠল আর্তদের মর্মভেদী ক্রন্দন!

হ্যাটো হেসে বললেন, "বাহবা, কি চমৎকার দৃশ্য! দেশের ধনীরা এইবারে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, কারণ কাঙালদের কবল থেকে আমি তাদের উদ্ধার করলুম। গরীবরা হচ্ছে ইঁদুরের মত, কেবল শস্য ধ্বংস করতেই তাদের জন্ম।"

প্রাসাদে ফিরে এসে হ্যাটো নির্বিকার মনে ভালো ভালো খাবার

খেতে বসলেন। তারপর পরম আরামে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই তাঁর শেষ ঘুম।

পরদিনের প্রভাত। হ্যাটো বৈঠকখানায় এসে ব'সেই দেখতে পেলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তাঁর প্রকাণ্ড প্রতিকৃতির সমস্তটাই ইঁদুররা কুরে কুরে খেয়ে গেছে—বাকি আছে কেবল ছবির ফ্রেম। হঠাৎ যেন মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখেই হ্যাটো উঠলেন শিউরে!

এমন সময়ে এক ভৃত্য ছুটে এসে বললে, "হুজুর, হুজুর! গোলা-বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, ইঁদুররা আপনার সমস্ত শস্য খেয়ে ফেলেছে।"

আর একজন ভৃত্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "হুজুর, হুজুর! শীগ্‌গির পালান—শীগ্‌গির! হাজার হাজার ইঁদুর আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! এত ইঁদুর জন্মে আমি চক্ষে দেখিনি! হয়তো কাল আমরা যা করেছি, এ হচ্ছে সেই পাপের শাস্তি।"

হ্যাটো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কুছ পরোয়া নেহি! রাইন নদীর ওপারে আমার যে পাঁচিল-ঘেরা প্রাসাদ আছে, আমি সেই-খানে গিয়ে আশ্রয় নেব। তুচ্ছ ইঁদুররা অত বড় নদী পেরিয়ে আর অত উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।"

হ্যাটো পালিয়ে গেলেন নদী পারের প্রাসাদে। তারপর বন্ধ করে দিলেন সমস্ত দরজা, জানালা ও ছিদ্র।

রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ মুদেছেন, হঠাৎ সে কী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! চমকে চেয়ে দেখেন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলছে দুটো অগ্নিচক্ষু!

তারপরই বুঝলেন, ওটা তাঁর পোষা বিড়াল। কিন্তু কি দেখে সে অমন ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে?

হ্যাটো আলো জ্বেলেই আঁতকে উঠলেন। ঘর ভ'রে গেছে ইঁদুরে ইঁদুরে—সে যে কত হাজার ইঁদুর, গুণে বলা অসম্ভব। এত ইঁদুর কেউ কখনো দেখেনি।

হ্যাটো আতঙ্কে জড়সড় হয়ে মাটির উপরে ব'সে পড়ে মালা জপতে জপতে বললেন, "ভগবান রক্ষা কর! ভগবান রক্ষা কর!"

কিন্তু নদী পেরিয়ে, পাঁচিল ডিঙিয়ে, দরজা-জানালা ফুটো ক'রে সেই লক্ষ লক্ষ ইঁদুর এখানে ছুটে এসেছে ভগবানেরই আদেশ বহন ক'রে। হ্যাটো গরীবদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ইঁদুরদের—ওদের বুকে আশ্রয় নিয়েছে সেই গরীবদেরই ক্ষুধার্ত-আত্মা।

এত ইঁদুর এসেছে—কিন্তু এখনো ঘরের ভিতরে আসছে দলে দলে আরো ইঁদুর! জানালায় ইঁদুর, দরজায় ইঁদুর, ছাদ থেকে নামছে ইঁদুর, মেঝে ফুঁড়ে বেরুচ্ছে ইঁদুর। তারপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশপ হ্যাটোর দেহের উপর।

পরদিন সকালে পাওয়া গেল কেবল হ্যাটোর মাংসহীন নগ্ন কঙ্কাল!

বাঁদরের মেটুলি-চচ্চড়ি

(জাপানী রূপকথা)

সমুদ্রের ধারে তোমরা জেলি-মাছ দেখেছ তো? জেলিরা থস্‌থসে পিণ্ডের মতন দেখতে ব'লে এই মাছের এমন নাম হয়েছে। তাদের দেহে এখন পা নেই, হাড়ও নেই, উপরে ঝিনুকের মত শক্ত খোলাও নেই। এমন দশা তাদের কেন হ'ল, আজ তোমাদের কাছে সেই গল্পই করব।

জাপানের সমুদ্রের তলায় এক সাগর-রাজ বাস করতেন, তাঁর নাম রিন-জন; এ অনেক হাজার বছর আগেকার কথা।

রাজা রিন-জনের মনে সুখ নেই, তাঁর পরমা সুন্দরী রাণীর বড় অসুখ। বড় বড় ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিন্তু রাণীর অসুখ আর সারে না।

শেষে একদিন কাঁদতে কাঁদতে রাণী বললেন, "ওগো, আমার অসুখ সারবার এক উপায় আছে।"

রাজা ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "কি উপায় রাণী, কি উপায়?"

রাণী বললেন, "যদি আমি জ্যান্ত বাঁদরের পেট থেকে মেটুলি বার

ক'রে নিয়ে চচ্চড়ী বানিয়ে খেতে পাই, তাহ'লে এখুনি আমার রোগ সেরে যায়!"

রাজা খানিক ভেবে জেলি-মাছকে ডাক দিলেন।

জেলি-মাছ এসে তার খোলার ভেতর থেকে মুখ বার ক'রে বললে, "কি আজ্ঞা হয়, মহারাজ?"

রাজা বললেন, "দেখ, তোমার পা আছে, তুমি ডাঙায় উঠে চলা-ফেরা করতে পারবে। তুমি শীগ্‌গির সমুদ্রের ওপরে গিয়ে একটা জ্যান্ত বাঁদরকে ভুলিয়ে নিয়ে এস, তার মেটুলির চচ্চড়ি না খেলে আমার রাণীর রোগ সারবে না।"

এত-বড় একটা কাজের ভার পেয়ে জেলি-মাছ ভারি খুশি। সে তখনি সাঁতার দিয়ে এক দ্বীপে গিয়ে উঠল। তারপর খানিক এদিক-ওদিক পায়চারি করতেই দেখলে, গাছের ডাল ধ'রে একটা বাঁদর আরাম ক'রে দোল খাচ্ছে!

জেলি-মাছ ডেকে বললে, "ওহে বাঁদর ভায়া, কি খারাপ দেশেই তোমরা আছ—আরে ছ্যা!"

বাঁদর বললে, "তোমাদের সমুদ্র আমাদের ডাঙার চেয়ে ভালো নাকি?"

জেলি-মাছ বললে, "নিশ্চয়, সে কথা আবার বলতে হবে? আমাদের দেশে কত মণি-মুক্তোর ছড়াছড়ি, গাছে গাছে কত মিষ্টি ফল। বিশ্বাস না হয়, আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, তুমি আমার পিঠে চ'ড়ে বোসো, তোমাকে এখনি আমাদের দেশ দেখিয়ে আনব!"

মিষ্টি ফলের লোভে বাঁদর তখনি রাজি হয়ে জেলি-মাছের পিঠে চ'ড়ে বসল।

তারা যখন প্রায় রাজা রিন-জনের প্রাসাদের কাছে এসেছে, জেলি-মাছ তখন জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা ভাই বাঁদর, তুমি তোমার মেটুলি সঙ্গে ক'রে এনেছ তো?"

বাঁদর একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললে, "এমন বেয়াড়া কথা তুমি জানতে চাও কেন বল দেখি?"

বোকা জেলি-মাছ বললে, "আমাদের রাণী যে জ্যান্ত বাঁদরের মেটুলি-চচ্চড়ি খেতে চান!"

বাঁদর দু-চোখ ছানাবড়ার মত ক'রে বললে, "অ্যাঁ, সে কি? এ-কথা তুমি আগে আমাকে বল-নি কেন?"

জেলি-মাছ বললে, "ভায়া, তাহ'লে তুমি হয়তো আমার সঙ্গে আর আসতে না!"

বাঁদর বললে, "তুমি বড়ই ভুল করেছ দেখছি! আসল কথা কি জানো, আমার অনেক মেটুলি আছে বটে, কিন্তু সে-সব আমার বাসায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি! আগে জানলে তোমাদের রাণীর মুখ চেয়ে অন্তত একটা মেটুলিও আমি নিশ্চয় সঙ্গে আনতুম!

জেলি মাছ বললে, "তবে চল, আবার ফিরে যাই!"

জেলি-মাছ সাঁতার দিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠল। চোখের পলক না পড়তে বাঁদর হুপ ক'রে এক লাফে গাছে চ'ড়ে মুখ খিঁচিয়ে বললে, "ওরে হাঁদা-গঙ্গারাম, মেটুলি আছে আমার পেটের ভেতর, আর তাই খাবেন তোমাদের রাণী চচ্চড়ী ক'রে? একি মামার বাড়ির আবদার? যাও—ভাগো হিঁয়াসে!"

জেলি-মাছ হতাশ হয়ে সমুদ্রের তলায় রাজার কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলে।

রাজা মহা ক্ষাপ্পা হয়ে হুকুম দিলেন, "ওরে, কে আছিস রে, এই বোকাচন্দ্রের গতর চূর্ণ ক'রে দে তো রে!"

জেলি-মাছ এমন মার খেলে যে, তার খোলা আর হাড়গোড় সমস্ত গুঁড়ো হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই তার এই অবস্থা।

নীল সায়রের অচিনপুরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝড়

ঢং!

বড় ঘড়িতে বাজল সাড়ে-সাতটা। এই হ'ল বিমল ও কুমারের চা-পানের সময়। রামহরি চায়ের 'ট্রে' হাতে ক'রে ঘরে ঢুকেই দেখলে, তারা দুজনে একখানা খবরের কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, আগ্রহ ভরে।

এই খবরের কাগজ ও এই আগ্রহ রামহরির মোটেই ভালো লাগল না। কারণ সে জানে, রীতিমত একটা জবর খবর না থাকলে বিমল ও কুমার খবরের কাগজের উপরে অমন ক'রে ঝুঁকে পড়ে না। এবং তাদের কাছে জবর খবর মানে সাংঘাতিক বিপদের খবর। এই খবর প'ড়েই হয়তো ওরা বলে বসবে, "ওঠ রামহরি! বাঁধো তল্পিতল্পা! আজকেই আমরা কলকাতা ছাড়ব!" কতবার যে এমনি ব্যাপার হয়েছে, তার আর হিসাব নেই।

অতএব রামহরি ঐ খবরের-কাগজগুলোকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। তার মতে, ওগুলো হচ্ছে মানুষের শত্রু ও বিপদের অগ্রদূত।

রামহরি চায়ের ট্রে-খানা সশব্দে টেবিলের উপরে রাখলে—কিন্তু তবু ওরা কাগজ থেকে মুখ তুললে না।

রামহরি বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "কি, চা-টা খাবে, না আজ কাগজ প'ড়েই পেট ভরবে?"

বিমল ফিরে ব'সে বললে, "কি ব্যাপার রামহরি, সকাল-বেলায় তোমার গলাটা এমন বেসুরো বলছে কেন?"

—"বলি, খবরের কাগজ পড়বে, না চা খাবে?"

কুমার হেসে বললে, "খবরের কাগজের ওপরে তোমার অত রাগ কেন ?"

—"রাগ হবে না ? ঐ হতচ্ছাড়া কাগজগুলোই তো তোমাদের যত ছিষ্টিছাড়া খবর দেয়, তোমরা পাগলের মত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাও !"

বিমল হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "নাঃ—রামহরি আমাদের বড্ড বেশি চিনে ফেলেছে, কুমার !"

—"না, তোমাদের ছেলেবেলা থেকে দেখছি, তোমাদের চিনব কেন ? ও-সব কাগজ-টাগজ পড়া ছেড়ে দাও !"

—"হ্যাঁ, রামহরি, এইবার সত্যিসত্যিই কিছুকালের জন্য আমরা কাগজ-টাগজ পড়া একেবারে ছেড়ে দেব !"

রামহরি ভারি খুশি হয়ে বললে, "তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক ! আমি তা'হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

—"বাঁচবে কি মরবে জানি না রামহরি, তবে আমরা যে ইচ্ছা করলেও আর কাগজ পড়তে পারব না, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ এবারে যে-দেশে যাচ্ছি সেখানে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না।"

রামহরির মুখে এল অন্ধকার ঘনিয়ে। বললে, "তার মানে ?"

—"আমরা যে শীগ্‌গিরই সমুদ্রযাত্রায় বেরুব।"

"ওরে বাবা, সুমুদ্দরে ? এবারে আবার কোন্ চুলোয় ? পাতালে নয়তো ?"

—"হ'তে পারে। তবে, আপাতত আগে যাব সাহেবদের দেশে—অর্থাৎ বিলাতে। সেখান থেকে একখানা গোটা জাহাজ রিজার্ভ ক'রে যাব আফ্রিকা আর আমেরিকার মাঝখানে, আটলান্টিক মহাসাগরের এমন কোন দ্বীপে, যার নাম কেউ জানে না।"

—"সঙ্গে যাচ্ছে কে কে ?"

—"আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল, বাঘা আর তুমি—অর্থাৎ আমাদের পুরো দল। এবারের ব্যাপার গুরুতর, তাই দু-ডজন শিখ, গুর্খা

আর পাঠানকেও ভাড়া করতে হবে।”

রামহরি গম্ভীর মুখে বললে, “বেশ, তোমরা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু এবার আর আমি তোমাদের সঙ্গে নেই”—ব'লেই সে হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল চায়ের 'ট্রে' টেনে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, “রামহরি নাকি এবারে আমাদের সঙ্গে যাবে না! কিন্তু যাত্রার দিন দেখা যাবে সেইই হন্ হন্ ক'রে আমাদের আগে আগে যাচ্ছে!······যাক্, নাও কুমার চা নাও! চা খেতে খেতে কাগজখানা আর একবার গোড়া থেকে পড় তো শুনি! বার বার শুনে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে ফেলতে হবে।”

কুমার খবরের কাগজখানা আবার তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল।

“আটলান্টিক মহাসাগরে এক বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বলেন, এই বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীতে আর নতুন বিস্ময়ের ঠাঁই নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। ধরণী বিপুলা, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-রহস্যের কতটুকু ধরা পড়িয়াছে? প্রতি যুগেই সভ্যতা মনে করিয়াছে, জ্ঞানের চরম সীমা তাহার হস্তগত, তাহার পক্ষে আর নতুন শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগেই তাহার সে-গর্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গ্রীকরা নাকি সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাহারা ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু আজিকার কলেজের ছাত্ররাও প্লেটো ও সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর। গ্রীক সভ্যতা বিলুপ্ত হইল, পৃথিবীকে বিজয়-চিৎকারে পরিপূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইল রোমীয় সভ্যতা! তাহার বিশ্বাস ছিল ভূমণ্ডলকে দেখিতে পায় সে নিজের নখ-দর্পণে! কিন্তু, রোমানদের অঙ্কিত পুরাতন মানচিত্রে আধুনিক পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের পরেও এই সেদিন পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এবং আরো কত বড় বড় দ্বীপের অস্তিত্ব পর্যন্ত কাহারও জানা ছিল না। অন্যান্য গ্রহের কথা ছাড়িয়া

দি, আজও পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত নব নব দেশ নাই, এমন কথা কেহ কি জোর করিয়া বলিতে পারে? দক্ষিণ আমেরিকায় ও আফ্রিকায় এখনো এমন একাধিক দুর্গম দেশ ও দুরারোহ পর্বত আছে, এ যুগের কোন সভ্য মানুষ সেখানে পদার্পণ করে নাই। ঐ সব স্থানে অতীতের কত গভীর রহস্য নিদ্রিত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো কত নতুন জাতি, কত অজানা জীব সেখানে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র এক সমাজ বা বসতি গড়িয়া বসবাস করিতেছে, আমরা তাহাদের কোন সংবাদই রাখি না।

অতঃপর আগে যে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছি তাহার কথাই বলিব।

সম্প্রতি এস্ এস্ বোহিমিয়া নামক একখানি জাহাজ ইউরোপ হইতে আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছিল।

কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে আচম্বিতে এক ভীষণ ঝড় উঠিল। এই স্মরণীয় দৈব-দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের কাগজে গত সপ্তাহেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং সকলেই এখন জানেন যে, ও-রকম ভূমি-কম্পের সঙ্গে ঝড় আটলান্টিক মহাসাগরে গত এক শতাব্দীর মধ্যে কেহ দেখে নাই। উক্ত দৈব-দুর্বিপাকে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী বহু দ্বীপে ও তীরবর্তী বহু দেশে অগণ্য লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় হইয়াছে। কোন কোন ছোট ছোট দ্বীপের চিহ্ন পর্যন্ত সমুদ্রের উপর হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহু বাণিজ্যপোত ও যাত্রীপোত অদ্যাবধি কোন বন্দরে ফিরিয়া আসে নাই এবং হয়তো আর আসিবেও না।

'বোহিমিয়া'ও পড়িয়াছিল এই সর্বগ্রাসী প্রলয়ঝটিকার মুখেই। কিন্তু ঝটিকা দয়া করিয়া যাহাদের গ্রহণ করে নাই, 'বোহিমিয়া' সৌভাগ্যবশত তাহাদেরই দলভুক্ত হইতে পারিয়াছে। গত আঠারোই তারিখে সে ক্ষত-বিক্ষত দেহে আবার স্বদেশের বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং তাহার যাত্রীরা বহন করিয়া আনিয়াছে এক বিস্ময়কর কাহিনী। জনৈক যাত্রী যে বর্ণনা দিয়াছে আমরা এখানে তাহাই প্রকাশ করিলাম।

অপার সাগরে ঝটিকা জাগিয়া 'বোহিমিয়া'র অবস্থা করিয়া তুলিয়া-

ছিল ভয়াবহ! ঝড়ের ঝাপটে প্রথমেই তাহার ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ বিরাট আকার ধারণ করিয়া উন্মত্ত আনন্দে জাহাজের ডেকের উপর ক্রমাগত ভাঙিয়া পড়িতে থাকে,—সেই তরঙ্গের আঘাতে দুইজন আরোহী জাহাজের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। জাহাজের চারিদিকে বহুক্ষণ পর্যন্ত উত্তাল তরঙ্গের প্রাচীর ছাড়া আর কোন দৃশ্যই দেখা যায় নাই। প্রলয়-ঝটিকার হুহুঙ্কার এবং মহাসাগরের গর্জন সেই অসীমতার সাম্রাজ্যকে ধ্বনিময় ও ভয়ানক করিয়া তোলে। আকাশ-ব্যাপী নিবিড় অন্ধকার অশ্রান্ত বিদ্যুৎবিকাশে অগ্নিময় হইয়া উঠে। প্রকাশ, এত ঘন ঘন বিদ্যুতের সমারোহ এবং বজ্রের কোলাহল নাকি কেউ কখনো দেখেও নাই শোনেও নাই। এই মহা হুলুস্থুলুর মধ্যে, এই শত শত শব্দ-দানবের প্রবল আস্ফালনের মধ্যে, প্রাকৃতিক বিপ্লবের এই সর্বনাশা আয়োজনের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট গতিশক্তি হারাইয়া 'বোহিমিয়া' একান্ত অসহায়ভাবে বিশাল সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোতে এবং ক্রুদ্ধ ঝটিকার দুর্নিবার টানে দিগ্বিদিক ভুলিয়া কোথায় ছুটিতে থাকে, তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই ছিল না। জাহাজের 'ইলেকট্রিসিটি' যোগান দিবার যন্ত্রও বিগড়াইয়া যায়। ভিতরে বাহিরে অন্ধকার, আকাশে ঝড়, সমুদ্রে বন্যা ও তাণ্ডবের বিপ্লব, জাহাজের কামরায় কামরায় শিশু ও নারীদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি, কাপ্তেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নাবিকেরা ভীতি-ব্যাকুল,—এই কল্পনাতীত দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া 'বোহিমিয়া' ভাসিয়া আর ভাসিয়া চলিয়াছে—কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তির তাড়নায়—কোন্ অদৃশ্য নিয়তির নিষ্ঠুর আকর্ষণে! প্রতিমুহূর্তে তার নরক-যন্ত্রণাময় অনন্ত মুহূর্তের মত—পাতালের অতলতা কখন্ তাকে গ্রাস করে, সকলে তখন যেন কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে ঝড় যখন শান্ত হইয়া আসিল, ভগবানের অনুগ্রহে 'বোহিমিয়া' তখনও ভাসিয়া রহিল। এ যাত্রা রক্ষা পাইল বুঝিয়া ধর্মভীরু যাত্রীরা প্রার্থনা করিতে বসিল।

কিন্তু জাহাজ এখন কোথায়? তখন শেষ-রাত্রি, চন্দ্রহীন শূন্যতা

চতুর্দিকে আঁধার-প্রপাতের বাঁধ খুলিয়া দিয়াছে। জাহাজের ভিতরেও আলোর আশীর্বাদ নাই। কাপ্তেন ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আটলান্টিক মহাসাগর তখনও যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করিতেছে, তাহার বিদ্রোহী তরঙ্গদল তখনও মৃত্যুসঙ্গীতের ছন্দে রুদ্রতাল বাজাইয়া ছুটিয়া যাইতেছে, জাহাজ তখনও তাহাদের কবলে অসহায় ক্রীড়নক!

অনেকক্ষণ পরে কাপ্তেন সবিস্ময়ে দেখলেন বহুদূরে অনেকগুলো আলোকশিখা জমাট অন্ধকার-পটে যেন স্বর্ণরেখা টানিয়া দিতেছে!

'বোহিমিয়া' সেইদিকেই অগ্রসর হইতেছিল।

আলোক-শিখাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। দূরবীনের সাহায্যে কাপ্তেন দেখিলেন, সেগুলো মশালের আলো এবং তাহারা রাত্রিচর আলেয়ার মত এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করিতেছে।

কাপ্তেন বুঝিলেন, 'বোহিমিয়া' স্রোতের টানে কোন দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং দ্বীপের বাসিন্দারা মশাল জ্বালিয়া যে-কারণেই হউক সমুদ্র-তীরে বিচরণ করিতেছে। সাগরতীরবর্তী দ্বীপের বাসিন্দারা

ঝড়ের পরে প্রায়ই এইরকম বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করে, বিপদগ্রস্ত জাহাজ বা নরনারীদের সাহায্য করিবার শুভ-ইচ্ছায়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ আলোগুলো অদৃশ্য হইয়া গেল। নিকটেই কোন দ্বীপ আছে জানিয়া কাপ্তেন ভগবানকে বারংবার ধন্যবাদ দিলেন।

তাহার পর পূর্ব আকাশে কুমারী উষা যখন তার লাল-চেলির ঝলমলে আঁচল উড়াইয়া দিল, সাগরবাসী রূপসী নীলিমা যখন শান্ত স্বরে প্রভাতী স্তব পাঠ করিতে লাগিল, সকলের চোখের সামনে তখন ভাসিয়া উঠিল—স্বপ্নরঙ্গমঞ্চের অর্ধস্ফুট দৃশ্যপটের মত এক অভিনব দ্বীপের ছবি।

সে দ্বীপটি বড় নয়—আকারে হয়তো চার পাঁচ মাইলের বেশি হইবে না। কিন্তু তাহাকে সাধারণ দ্বীপের পর্যায়ে ফেলা যায় না। সে দ্বীপকে একটি পাহাড় বলাই উচিত।

তাহার ঢালু গা ধীরে ধীরে উপর-দিকে উঠিয়া গিয়াছে। নিচের দিকটা কম-ঢালু, সেখান দিয়া অনায়াসে চলা-ফেরা করা যায়, কিন্তু তাহার শিখর দিকটা শূন্যে উঠিয়াছে প্রায় সমান খাড়া ভাবে। সাগরগর্ভ হইতে তাহার শিখরের উচ্চতা দেড় হাজার ফুটের কম হইবে না।

দূরবীন দিয়া কাপ্তেন দেখিলেন, সেই পাহাড়-দ্বীপের কোথাও কোন গাছপালা—এমন-কি সবুজের আভাসটুকু পর্যন্ত নাই। আর-একটি অভাবিত আশ্চর্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, দ্বীপের গায়ে নানাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে মস্ত মস্ত প্রস্তর-মূর্তি,—এক-একটি মূর্তি এত প্রকাণ্ড যে, উচ্চতায় দেড়শত বা দুইশত ফুটের কম নয়। পাহাড়ের গা হইতে সেই বিচিত্র মূর্তিগুলিকে কাটিয়া-খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন প্রাচীন মিশরী ভাস্করের গড়া মূর্তি।

কিন্তু গতকল্য যাহারা এই গিরি-দ্বীপে মশাল জ্বালিয়া চলা-ফেরা করিতেছিল, তাহাদের কাহাকেও আজ সকালে দেখা গেল না। এই দ্বীপের পাথুরে গায়ে যেমন শ্যামলতাও নাই, তেমনি কোন জীবের বা মানুষের বসতির চিহ্নমাত্রও নাই। এমন-কি, সেখানে একটা পাখি পর্যন্ত

উড়িতেছে না।

তিনি বহুকাল কাপ্তেনি করিতেছেন, আটলান্টিক মহাসাগরের প্রত্যেক তরঙ্গটি তাঁহার নিকটে সুপরিচিত, নাবিক-ব্যবসায়ে তিনি চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু এই দ্বীপটিকে কখনও দেখেন নাই, বা তাহার অস্তিত্বের কথা কাহারও মুখে শ্রবণও করেন নাই।......অথবা এই দ্বীপের কথা শুনিয়াও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার এমন ভ্রম কি হইতে পারে? দ্বীপের খুব কাছে আসিয়া নোঙর ফেলিয়া কাপ্তেন তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ছুটিয়া গেলেন। 'চার্ট' বাহির করিয়া অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু তাহাতে এই শৈলদ্বীপের নাম-গন্ধও পাইলেন না। তবে এখানে এই দ্বীপটি কোথা হইতে আসিল?

অনেক ভাবিয়াও এই প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া কাপ্তেন আবার বাহিরে আসিলেন। এবং তাহার পর জন-আষ্টেক নাবিককে বোটে চড়িয়া দ্বীপটি পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন।

নাবিকরা বোট লইয়া চলিয়া গেল। দ্বীপের তলায় বোট বাঁধিয়া নাবিকরা উপরে গিয়া উঠিল—জাহাজ হইতে সেটাও স্পষ্ট দেখা গেল; তারপর তাহারা সকলের চোখের আড়ালে গিয়া পাহাড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল।

দুই ঘণ্টার ভিতরে নাবিকদের ফিরিয়া আসিবার কথা। কিন্তু তিন—চার—পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু কাহারও দেখা নাই! কাপ্তেন চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! আরও দুই ঘণ্টা গেল! বেলা ছয়টায় নাবিকেরা গিয়াছে, এখন বেলা একটা—তাহারা কোথায় গেল?

এবারে কাপ্তেন নিজেই সদলবলে নতুন বোটে নামিলেন। এবারে সকলেই সশস্ত্র। কারণ কাপ্তেনের সন্দেহ হইল, দ্বীপের ভিতরে গিয়া নাবিকেরা হয়তো বিপদে পড়িয়াছে। কল্য রাত্রে যাহাদের হাতে মশাল ছিল তাহারা কাহারা? বোম্বেটে নয় তো, হয়তো এই নির্জন দ্বীপে আসিয়া তাহারা গোপনে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে!

দ্বিতীয় দল দ্বীপে গিয়া উঠিল। মহাসাগরের অশ্রান্ত গম্ভীর কোলা-

হলের মাঝখানে সেই অজ্ঞাত দ্বীপ বিজন ও একান্ত স্তব্ধ সমাধির মত দাঁড়াইয়া আছে। অতিকায় প্রস্তরমূর্তিগুলো পর্বতেরই অংশবিশেষের মত অচল হইয়া আছে, তাহাদের দৃষ্টিহীন চক্ষুগুলো অনন্ত সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। মানুষ-ভাস্কর তাহাদের গড়া মূর্তির মুখের ভাবে ফুটায় মানুষেরই মৌখিক ভাবের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই দানব-মূর্তিগুলোর মুখের ভাব কি কঠিন!

কোন মূর্তির মুখেই মানুষী দয়া মায়া স্নেহ প্রেমের কোমল ও মধুর ভাবের এতটুকু চিহ্ন নাই। তাহাদের দেখিলে প্রাণে ভয় জাগে, হৃদয় স্তম্ভিত হয়! প্রত্যেকেরই অমানুষিক মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে হিংস্র কঠোরতার তীব্র আভাস! বেশ বুঝা যায়, যাহারা এই সকল মূর্তি গড়িয়াছে তাহারা দয়া-মায়ার সঙ্গে পরিচিত নয়। তাহারা অতুলনীয় শিল্পী বটে, কিন্তু প্রচণ্ড নিষ্ঠুর!

কাপ্তেন সারাদিন ধরিয়া সেই দ্বীপের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া যতদূর উপরে উঠা যায়, উঠিলেন। তাহার পরেই খাড়া শিখরের মূলদেশ। সরীসৃপ ভিন্ন কোন দ্বিপদ বা চতুষ্পদ ভূচর জীবের পক্ষেই সেই শিখরের উপরে উঠা সম্ভবপর নয়। প্রায় হাজার ফুট উপর হইতে কাপ্তেন ও তাঁহার সঙ্গীরা চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও নাবিকদের দেখা নাই। তাহাদের সচেতন করিবার জন্য বারংবার বন্দুক ছোঁড়া হইল, সে শব্দে নীরবতার ঘুম ভাঙিয়া গেল, কিন্তু নাবিকদের কোনই সাড়া নাই।

সন্ধ্যার সময়ে কাপ্তেন সঙ্গীদের সহিত শ্রান্ত দেহে হতাশ মনে জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন আবার দ্বীপে গিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু হইল। সেদিনও সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু হারা-নাবিকদের সন্ধান মিলিল না।

এই দুই দিনের অন্বেষণে আরো কোন কোন অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

ঝড়ের রাত্রে দ্বীপে মশাল লইয়া যাহারা চলা-ফেরা করিয়াছিল,

তাহারা কোথায় গেল ?

আলো লইয়া পৃথিবীর একমাত্র জীব চলা-ফেরা করিতে পারে এবং সেই জীব হইতেছে মনুষ্য। কিন্তু দ্বীপে মানুষের বসতির কোন চিহ্নই নাই। তবে কি সেগুলো আলেয়ার আলো? কিন্তু আলেয়ার জন্ম হয় জলাভূমিতে, এই পাষাণের শুষ্ক রাজ্যে আলেয়ার কল্পনাও উদ্ভট, মরুর বুকে আলোকলতার মতই অসম্ভব।

মানুষ যেখানে থাকে, সেখানে জলও থাকে। কিন্তু সারা দ্বীপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ঝরনা, নদী বা জলাশয় আবিষ্কার করা যায় নাই।

কিন্তু যাহারা মশাল জ্বালিয়াছিল, তাহারা তো মানুষ? যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহারা কোথাও কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আছে, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে, কি পান করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? জল কোথায়? নদী বা নির্ঝর তো ধন-রত্নের মত লুকাইয়া রাখা যায় না। অন্তত তাহার শব্দও শোনা যায়। এবং এই পাহাড়-দ্বীপে কৃত্রিম উপায়ে জলাশয় খনন করাও অসম্ভব। সমুদ্রের লোনা জলেও জীবের প্রাণ বাঁচে না। তবে?

দ্বীপে যাহারা এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি বহু বৎসর ধরিয়া গড়িয়াছে, তাহারাও তো মানুষ? তাহারা কোথা হইতে জলপান করিত?

আর এমন সব বিচিত্র মূর্তি, ইহাদের পিছনে রহিয়াছে বিরাট এক সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু সমগ্র দ্বীপে কোথায় সেই সভ্যতার চিহ্ন? এতবড় একটা সভ্যতা তো কোন গুপ্ত-সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে লুকাইয়া রাখা যায় না। এবং 'চার্টে' পাওয়া যায় না, এমন একটা দ্বীপ সুপরিচিত আটলান্টিক মহাসাগরে কোথা হইতে আসিল, সেটাও একটা মস্ত সমস্যা।

জাহাজের আট-আটজন নাবিক কি কর্পূরের মতন উবিয়া গেল?

'বোহিমিয়া'র প্রত্যেক আরোহীর বিশ্বাস, এ-সমস্তই ভৌতিক কাণ্ড।

তৃতীয় দিনেও কাপ্তেন আবার দ্বীপে গিয়া নাবিকদের খুঁজিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূতের ভয়ে কেহই আর তাঁহার সঙ্গে যাইতে রাজী হয় নাই। কাজেই জাহাজের ইঞ্জিন মেরামত করিয়া

তাঁহাকে আবার দেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ ও কেনারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে এই নূতন গিরি-দ্বীপের অবস্থান।

কিন্তু এই দ্বীপের বিচিত্র রহস্যের কিনারা করিবে কে?

কুমার পড়া শেষ ক'রে কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে দিলে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিমল বললে, "কুমার, জীবনে অনেক রহস্যেরই গোড়া খুঁজে বার করেছি আমরা। এবারেও এ-রহস্যের কিনারা আমরা করতে পারব, কি বল?

কুমার বললে, "ও-সব কিনারা-টিনারা আমি বুঝি না! সফলই হই আর বিফলই হই, জীবনে আবার একটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া গেল, এইটুকুতেই আমি তুষ্ট!"

বিমল সজোরে টেবিল চাপ্ড়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "ঠিক বলেছ! হাতে হাত দাও!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্ল্যাক্ স্নেক

কলকাতা থেকে বোম্বে এবং বোম্বে থেকে ভারতসাগরে!

দেখতে দেখতে বোম্বাই শহর ছোট হয়ে আসছে এবং বড় বড় প্রাসাদগুলোর চূড়ো নিয়ে বোম্বাই যত দূরে স'রে যাচ্ছে, তার দুই দিকে ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে জেগে উঠেছে ভারতবর্ষের তরুশ্যামল বিপুল তটরেখা!

ক্রমে সে-রেখাও ক্ষীণতর হয়ে এল এবং তার শেষ-চিহ্নকে গ্রাস ক'রে ফেললে মহাসাগরের অনন্ত ক্ষুধা! তারপর থেকে সমানে চলতে লাগল নীলকমলের রংমাখানো অসীমতার নৃত্যচাঞ্চল্য—নীল আকাশ

আর নীল জল ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত রূপ চোখের আড়ালে গেল একেবারে হারিয়ে।

ডেকের উপরে জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, "কুমার, ভারতকে এই প্রথম ছেড়ে যাচ্ছি না, কিন্তু তবু কেন জানি না, যতবারই ভারতকে ছেড়ে যাই ততবারই মনে হয়, আমার সমস্ত জীবনকে যেন ভারতের সোনার মত সুন্দর ধুলোয় ফেলে রেখে, আত্মার অশ্রু-ভেজা মৃতদেহ নিয়ে কোন্ অন্ধকারে যাত্রা করছি।"

কুমার নিষ্পলক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত তটরেখার উদ্দেশে তাকিয়ে ভারি ভারি গলায় বললে, "ভাই, স্বদেশের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া কখনো হয়তো পুরানো হয় না। যে-ভারতের শিয়রে নির্ভীক প্রহরীর মত অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে তুষারমুকুট অমর হিমাচল, যে-ভারতের চরণতলে ভৃত্যের মত ছুটোছুটি করছে অনন্ত পাদোদক নিয়ে রত্নাকর সমুদ্র, যে-ভারতের পবিত্র মাটি, জল, তাপ, বাতাস আর আকাশ আজ যুগ-যুগান্তর ধ'রে আমাদের দেহ গ'ড়ে আসছে লক্ষ লক্ষ রূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার আদি-পুরোহিত, যে অপূর্ব মহিমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজ আমরা ভারতবাসী ব'লে গর্বে সব জাতির উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, আমাদের এমন গৌরবের দেশ ছেড়ে যেতে যার মন কেমন করে না, নিশ্চয়ই সে ভারতের ছেলে নয়।"

বিমল বললে, "যাঁরা ভারতের ছেলে নয় তারাও তো ভারতকে ভুলতে পারে না, কুমার! অতীতের পর্দা ঠেলে তাকিয়ে দেখ। ভারতকে শত্রুর মত আক্রমণ করতে এল যুগে যুগে শক, হুন, তাতার আর মোগল, কিন্তু আর ফিরে গেল না। কেউ গেল ভারতের মহামানবের সাগরের অতলে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে, কেউ ডাকলে পরম শ্রদ্ধায় ভারতকেই স্বদেশ ব'লে। অমন যে আপন সভ্যতায় গর্বিত গ্রীকগণ, তাদেরও অসংখ্য লোক আলেকজাণ্ডারের দল ছেড়ে স্বদেশ ভুলে উত্তর ভারতেই বংশানুক্রমে বাসা বেঁধে রয়ে গেল! আমাদের এই ভারতকে স্বদেশের মত ভালো না বেসে কেউ যে থাকতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস

করি না।"

বিমল যা ভেবেছিল, তাই। বুড়ো রামহরির পুরানো অভ্যাসই হচ্ছে মুখে "না" বলা, কিন্তু কাজের সময়ে দেখা যায়, তারই পা চলছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!

প্রৌঢ় বিনয়বাবু নিজের কেতাব আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে ঘরের চার-দেওয়ালের মাঝখানেই বন্দী থাকতে ভালোবাসেন, কিন্তু বিমল ও কুমার সারা পৃথিবীতে ছুটাছুটি করতে বেরুবার সময়ে তাঁকে ডাক দিলে তিনিও দলে যোগ না দিয়ে পারেন না! আর তিনি এলে কমলও যে আসবে, এটাও তো জানা কথা!

আর ঐ বিখ্যাত দিশী কুকুর, বাঘের মতন মস্ত বাঘা! ঠিক ভাবে পালন করলে বাংলার নিজস্ব কুকুরও যে কত তেজী, কত বলী আর কত সাহসী হয়, বিমল ও কুমারের নানা অভিযানে বহুবারই বাঘা সেটা প্রমাণিত করেছে। এবারেও আবার নতুন বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পাবে ভেবে সে তার উৎসাহী ল্যাজের ঘন ঘন আন্দোলন আর বন্ধ করতে পারছে না।

এবারে দলের সঙ্গে চলেছে বারোজন শিখ, ছয়জন গুর্খা, আর ছয়-জন পাঠান। এরা সকলেই আগে ফৌজে ছিল। অনেকেই ভারতের সীমান্তে বা মহাযুদ্ধে ফ্রান্সে ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে লড়াই করে এসেছে। পাকা ও অভিজ্ঞ বলেই তারা তাদের নিযুক্ত করেছে এবং সকলকে বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতেও ত্রুটি করা হয় নি। এতগুলি সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে নতুন অভিযানে যাবার জন্যে সরকারি আদেশও গ্রহণ করা হয়েছে।

জাহাজ এখন এডেন বন্দরের দিকে চলেছে। তারপর ইউরোপের নানা দেশের নানা বন্দরে 'বুড়ী ছুঁয়ে' ফরাসীদেশের মার্সেয়্য-এ গিয়ে থামবে। সেখানে নেমে সকলে যাবে রেলপথে পারি নগরে।...আধুনিক আর্ট ও সাহিত্যের পীঠস্থান পারি নগরীকে ভালো করে দেখবার জন্যে

বিমল ও কুমারের মনে অনেকদিন থেকেই একটা লোভ ছিল। এই সুযোগে তারা সেই লোভ মিটিয়ে নিতে চায়।

পথের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। কারণ আমরা ভ্রমণকাহিনী লিখছি না।

পারি শহরে গিয়ে প্রথম যেদিন তারা হোটেলে বাসা নিলে, সেই-দিনই খবরের কাগজে এক দুঃসংবাদ পেলে। খবরটি হচ্ছে এই ঃ

মিঃ টমাস মর্টন গত উনিশে নভেম্বর রাত্রে রহস্যময় ও অদ্ভুতভাবে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পড়েছেন। এখনো বিস্তৃত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি, তবে এইটুকু জানা গিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর কারণ 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র দংশন। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, সম্প্রতি যে এস. এস. বোহিমিয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগরের নতুন দ্বীপের সংবাদ এনে সভ্য জগতে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, মিঃ টমাস মর্টন ছিলেন তারই কাপ্তেন।

বিমল দুঃখিত কণ্ঠে বললে, "কুমার, ভেবেছিলুম প্রথমে লণ্ডনে নেমেই আগে মিঃ মর্টনের দ্বারস্থ হব। তাঁকে আমাদের সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ করব। কারণ ঐ দ্বীপে যেতে গেলে পথ দেখাবার জন্যে বোহি-মিয়ার কোন পদস্থ কর্মচারীর সাহায্য না নিলে আমাদের চলবে না, আর এ-ব্যাপারে মিঃ মর্টনের চেয়ে বেশি সাহায্য অন্য কেউ করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের প্রথম আশায় ছাই পড়ল।"

কুমার বললে, "ভগবানের মার, উপায় কি ? আমাদের এখন বোহি-মিয়ার অন্য কোন কর্মচারীকে খুঁজে বার করতে হবে।"

"কাজেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু বিমল, হতভাগ্য মিঃ মর্টনের মৃত্যুর ব্যাপারে যে একটা অসম্ভব সত্য রয়েছে, সেটা তোমরা লক্ষ্য করেছ কি?"

—'কি-রকম!' —ব'লেই বিমল খবরের কাগজখানা আবার তুলে নিলে। তারপর যেন আপন মনেই বিড়্ বিড়্ ক'রে বললে "ব্ল্যাক্ স্নেক— অর্থাৎ কেউটে সাপ!"

বিনয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। ব্ল্যাক্ স্নেক্। আমরা যাকে বলি কেউটে সাপ। ব্ল্যাক্ স্নেক পাওয়া যায় কেবল ভারতে, আর

আফ্রিকায়। ইংলণ্ডে অ্যাডার ছাড়া আর কোনরকম বিষধর সাপ নেই।"

কুমার বললে, "এই ডিসেম্বর মাসের দুর্জয় বিলিতী শীতে ইংলণ্ডে এ্যাডার সাপও নিশ্চয় বাসার বাইরে বেরোয় না। ভারতের কেউটে সাপও এখানে এলে এখন নির্জীব হয়ে থাকতে বাধ্য।"

বিনয়বাবু বললেন, "যথার্থ অনুমান করেছ। এমন অসম্ভব সত্যকে মানি কেমন ক'রে? এ-খবরে নিশ্চয় কোন গলদ আছে।"

বিমল গম্ভীরভাবে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মর্টনের মৃত্যুসংবাদের মধ্যে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে বটে।

তিন দিন পরে তারা ফরাসীদের বিখ্যাত শিল্পশালা দেখে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে শুনলে রাস্তা দিয়ে একটা কাগজ-ওয়ালা ছোক্‌রা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটছে—'লণ্ডনে আবার ব্ল্যাক্ স্নেক্, লণ্ডনে আবার ব্ল্যাক্ স্নেক্!'

কমল তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে একখানা কাগজ কিনে আন্‌লে।

পথের ধারেই ছিল একটা রেস্তোরাঁ। বিমল সকলকে নিয়ে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর, এক কোণের একটি টেবিল বেছে নিয়ে ব'সে বিনয়বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বললে, "আপনি ফরাসী ভাষা জানেন, কাগজখানা অনুগ্রহ ক'রে আমাদের প'ড়ে শোনান। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আজকেও এতে এমন কোন খবর আছে যা আমাদের জানা উচিত।"

বিনয়বাবু কাগজের মধ্যে খুঁজে একটি জায়গা বার ক'রে পড়তে লাগলেন:

লণ্ডনে আবার ব্ল্যাক্ স্নেক!

লণ্ডন কি ভারত ও আফ্রিকার জঙ্গলে পরিণত হ'তে চলল? লণ্ডনে ব্ল্যাক স্নেকের আবির্ভাব কি স্বপ্নেরও অগোচর নয়?

তিনদিন আগে আমরা হঠাৎ-বিখ্যাত এস. এস. বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টনের ব্ল্যাক্ স্নেকের দংশনে মৃত্যুর খবর দিয়েছি। কাল

রাত্রে ঐ জাহাজেরই দ্বিতীয় অফিসার মিঃ চার্লস্ মরিস আবার হঠাৎ মারা পড়েছেন। এবং তাঁরও মৃত্যুর কারণ ঐ ভয়াবহ ব্ল্যাক্ স্নেক।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহরই কারণ নেই। ইংলণ্ডে সর্প-বিষ সম্বন্ধে সর্ব-প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, মিঃ মরিসের মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। লাশের কণ্ঠদেশে সর্প-দংশনের স্পষ্ট দাগ আছে। শবদেহ ব্যবচ্ছেদের পরে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়াছে যে, ব্ল্যাক্ স্নেকের বিষেই হতভাগ্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

এবং এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে মিঃ মরিসের শয্যার তলায় একটি মৃত ব্ল্যাক্ স্নেকও পাওয়া গিয়াছে। এ-জাতের ব্ল্যাক্ স্নেক নাকি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাপটার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। খুব সম্ভব মিঃ মরিস মৃত্যুর আগে নিজেই ঐ সাপটাকে হত্যা করেছিলেন।

পুলিশ এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করছে ঃ

ক ॥ লণ্ডনে কেমন ক'রে ব্ল্যাক্ স্নেকের আগমন হ'ল ?

খ ॥ এস. এস. বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টনের বাসা থেকে দ্বিতীয় অফিসার মিঃ চার্লস্ মরিসের বাসার দূরত্ব সাত মাইল। মিঃ মর্টনকে যে-সাপটা কামড়েছিল, লণ্ডনের মত শহরের সাত মাইল পার হয়ে তার পক্ষে মিঃ মরিস্‌কে দংশন করা সম্ভবপর নয়। তবে কি ধরতে হবে যে লণ্ডনে একাধিক ব্ল্যাক্ স্নেকের আবির্ভাব হয়েছে? কেমন ক'রে তারা এল ? কেন এল ?

গ ॥ অধিকতর আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই ঃ মিঃ মর্টন ও মিঃ মরিস দুজনেই এস. এস. বোহিমিয়ার লোক। ব্ল্যাক্ স্নেক কি বেছে বেছে বোহিমিয়ার লোকদেরই দংশন করছে, না দৈবক্রমে এমন অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে ?

সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, বোহিমিয়ার আটজন নাবিক নিরুদ্দেশ হবার পর যে দ্বিতীয় নৌকাখানা শৈলদ্বীপে গিয়েছিল, তার মধ্যে কেবল তিনজন লোক পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের তলদেশে গিয়ে উঠেছিলেন।

বাকি সবাই অত উঁচুতে উঠতে রাজি হন নি। পূর্বোক্ত তিনজন হচ্ছেন কাপ্তেন মিঃ মর্টন, দ্বিতীয় অফিসার মিঃ মরিস ও তৃতীয় অফিসার মিঃ জর্জ ম্যাক্লিয়ড্। এখন তিনজনের মধ্যে কেবল মিঃ ম্যাক্লিয়ডই জীবিত আছেন।

বোহিমিয়ার প্রত্যেক যাত্রীর—বিশেষত যাঁরা ঐ শৈলদ্বীপে গিয়ে নেমেছিলেন তাঁদের—মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের ধারণা তাঁরা ঐ দ্বীপ থেকে কোন অজ্ঞাত অভিশাপ বহন ক'রে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু আমরা এই অদ্ভুত রহস্যের কোনই হদিস পাচ্ছি না। কোথায় আট্লান্টিক মহাসাগরের নব-আবিষ্কৃত এক অসম্ভব বিজন দ্বীপ, কোথায় আধুনিক সভ্যতার লীলাস্থল লণ্ডন নগর, আর কোথায় সুদূর এশিয়ার ভারতবাসী ব্ল্যাক্ স্নেক! এই তিনের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করতে পারে, পৃথিবীতে এমন মস্তিষ্ক বোধ হয় নেই। লণ্ডনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় বড় ডিটেক্টিভদের মাথাও গুলিয়ে গিয়েছে।

প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যে যে কার্য ও কারণের সম্পর্ক থাকে, এখানে তার একান্ত অভাব।

মিঃ মর্টন ও মিঃ মরিস—তুজনেই রাত্রিবেলায় শয্যায় শায়িত বা নিদ্রিত অবস্থায় সর্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সাপ বিনা কারণে কেন তাদের আক্রমণ করলে? যদি ধ'রে নেওয়া যায়, এর মধ্যে এমন কোন তুষ্ট ব্যক্তির হাত আছে, যে সাপ লেলিয়ে দিয়েছিল, তাহ'লেও প্রশ্ন ওঠে—কেন লেলিয়ে দিয়েছিল? ঐ তুই ব্যক্তির মৃত্যুতে তার কি লাভ? অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, মৃত ব্যক্তিদের কারুর কোন শত্রু নেই।

রহস্যময় শৈলদ্বীপ, রহস্যময় আটজন নাবিকের অন্তর্ধান, রহস্যময় এই কাপ্তেন ও দ্বিতীয় অফিসারের মৃত্যু এবং সবচেয়ে রহস্যময় হচ্ছে লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় ব্ল্যাক্ স্নেকের আবির্ভাব। এডগার অ্যালেনপো, গে-বোরিও এবং কন্যান্ ডইলের উপন্যাসেও এমন যুক্তিহীন বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাগজ-পড়া শেষ ক'রে বিনয়বাবু বললেন, "ব্যাপারটা ছিল এক-রকম, হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর-একরকম। আমরা যাচ্ছিলুম কোন্ নতুন দ্বীপের রহস্য আবিষ্কার করতে, কিন্তু এখন যে সমস্ত ব্যাপারটা গোয়েন্দা-কাহিনীর মত হয়ে উঠছে।"

কুমার বললে, "আমার বিশ্বাস, আসল ব্যাপার ঠিকই আছে, এই নতুন ঘটনাগুলো তার শাখা-প্রশাখা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বিমল বললে, "আমারও তাই মত। কিন্তু বিনয়বাবু, আজকের কাগজে আর একটা নতুন তথ্য পাওয়া গেল। শৈলদ্বীপের পাহাড়ে, সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন কেবল তিনজন লোক। তাঁদের মধ্যে বেঁচে আছেন খালি মিঃ জর্জ ম্যাক্লিয়ড্। আমাদের এখন সর্বাগ্রে তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে, কারণ আপাতত দ্বীপের কথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।"

—"কিন্তু কেউটে সাপের কামড়ে বোহিমিয়ার এই যে দু-জন লোকের মৃত্যু, এ-সম্বন্ধে তোমার কি মত ?"

বিমল ওয়েটারকে ডেকে খাবারের 'অর্ডার' দিয়ে বললে, "আপাতত আমি শুধু বিস্মিত হয়েছি। মিঃ ম্যাক্লিয়ডের সঙ্গে দেখা না ক'রে ও-সব বিষয় নিয়ে ভেবে-চিন্তে কোনই লাভ নেই।"

কুমার বললে, "কিন্তু, ঘটনা ক্রমেই যে-রকম গুরুতর হয়ে উঠেছে, আমাদের বোধ হয় আর প্যারিতে ব'সে থাকা উচিত নয়।"

বিমল প্রবল পরাক্রমে 'ওয়েটারে'র আনা খাবারের একখানা ডিস্ আক্রমণ ক'রে বললে, "এস কুমার, এস কমল, আসুন বিনয়বাবু। পেটে যখন আগুন জ্বলে তখন ডিসের খাবার ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া উচিত নয়।... আমাদের স্বদেশের কেউটে সাপ কেন বিলাতে বেড়াতে এসেছে, সেটা জানবার জন্যে আমরা কালকেই লণ্ডনে যাত্রা করব।"

বিমলরা সদলবলে যখন লণ্ডনে এসে হাজির হ'ল তখন দিনের বেলাতেও কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার এবং ঝুর্ ঝুর্ ক'রে ঝরছে বরফের

গুঁড়ো। পথে পথে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে যে জনতা-প্রবাহ ছুটছে, তাদের কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টি নেই। যেন তারা কুয়াশা ও তুষারেরই নিজস্ব জীব!

শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বিনয়বাবু ওভারকোটের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, "বিমল-ভায়া, বুঝতে পারছ কি, আমাদের ভারতীয় 'নেটিভ' আত্মার ভিতরে এখন খাঁটি বিলিতী জন-বুলের আত্মা ধীরে ধীরে ঢুকছে? অনেক ভারতবাসী আজকাল এইটে অনুভব করার পর দেশে গিয়ে নিজেদের আর 'নেটিভ' ব'লে মনে করে না।"

কুমার দাঁতের ঠক্‌ঠকানি কোনরকমে বন্ধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললে, "আত্মার উপরে যারা বিলিতী তুষারপাত সহ্য করে, যম তাদের গ্রহণ করুক! যে দেশের উপরে সূর্য আর চন্দ্রের দয়া এত কম, আমি তাকে ভাল দেশ ব'লে মনে করি না! বেঁচে থাক্ ভারতের নীলাকাশ, সোনালী রোদ, রূপোলী জ্যোৎস্না আর মলয় হাওয়া, তাদের ছেড়ে এখানে এসে কে থাকতে চায়?"

এমন কি বাঘার ল্যাজ পর্যন্ত থেকে থেকে কুঁকড়ে না প'ড়ে পারছে না।

সেদিন সকলে মিলে হোটেলের 'ফায়ার-প্লেসে'র সামনে ব'সে ব'সে বিলাতী শীতের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করলে!

পরদিনেও সূর্যের দেখা নেই, উল্টে গোদের উপরে বিষ-ফোঁড়ার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারই ভিতরে বিমল, কুমার ও বিনয়বাবু রেন-কোট চড়িয়ে এস. এস. বোহিমিয়ার লণ্ডনের আপিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

বিনয়বাবু বললেন, "স্বদেশ কি মিষ্টি! এমন দেশ ছেড়ে ভারতে যেতেও সায়েবদের নাকি মন কেমন করে!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, সাহারার অগ্নিকুণ্ডকেও বেদুইনরা স্বর্গ ব'লেই ভাবে।"

এমনি সব কথা কইতে কইতে সকলে গন্তব্যস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে খবর পাওয়া গেল যে, মিঃ জর্জ ম্যাক্লিয়ডের ঠিকানা হচ্ছে,—নং হোয়াইটহল কোর্ট।

তারা একখানা ট্যাক্সি নিলে। তারপর চারিদিকের বৃষ্টিস্নাত কুয়াশার প্রাচীর ঠেলে ঠেলে ট্যাক্সি হোয়াইটহল কোর্টের এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমলরা গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে বাড়ির নম্বর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গেল।

কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একখানা বাড়ির সামনে অনেক লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক লোকের মুখেই ভয়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে এবং ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

পথের মাঝখানে একখানা বড় মোটরগাড়ি, তার উপরে ব'সে আছে দুজন কনস্টেবল। ভিড়ের ভিতরেও কয়েকজন কনস্টেবল রয়েছে, তারা বেশি-কৌতূহলী লোকদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

জনতার অধিকাংশ লোকই কিছুই জানে না, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রেও বিমলরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

বিনয়বাবু বললেন, "জনতার ধর্ম সব দেশেই সমান, পথের লোক ভিড় দেখলে ভিড় আরও বাড়িয়েই তোলে! বিমল, কিছু জানতে চাও তো ঐ কনস্টেবলদের কাছে যাবার চেষ্টা কর।"

বিমল উত্তেজিত জনতার ভিতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে অনেক কষ্টে অগ্রসর হ'ল। বাড়ির নম্বর দেখে বুঝলে, তারা সেই নম্বরই খুঁজছে। একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলে, "মি জর্জ ম্যাক্লিয়ড্ কি এই বাড়িতে থাকেন?"

—"হ্যাঁ! কিন্তু কাল রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর শুধোলে, "কি ক'রে তাঁর মৃত্যু হ'ল?"

কনস্টেবল তার দিকে সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আপনি

কি ভারতবাসী ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে শুনুন। আপনাদেরই দেশের ব্ল্যাক্ স্নেক এসে মিঃ ম্যাক্লিয়ডকে দংশন করেছে। ভারতবর্ষ তার ব্ল্যাক্ স্নেককে নিয়ে নরকে গমন করুক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোমেজের প্রবেশ

তিনদিন পরের কথা। ঘড়ি দেখে বলা যায় এখন বৈকালী চা পানের সময় ; কিন্তু লণ্ডনের অন্ধকার-মাখা আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, এদেশে ঘড়ি তার কর্তব্যপালন করে না।

একখানা নিচু ও বড় 'চেস্টারফিল্ডে'র উপরে ব'সে বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার চা ও স্যাণ্ড্উইচের সদ্ব্যবহার করছিল। কমল শীতে কাবু হয়ে 'রাগ' মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে আছে চা ও স্যাণ্ড্উইচ দেখেও সে গরম বিছানা ছাড়তে রাজি হয় নি।

বিনয়বাবু একবার উঠলেন। 'ফ্রেঞ্চ-উইণ্ডোর' ভিতর দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে হতাশভাবে বললেন, "লণ্ডনে এসে পর্যন্ত সূর্যদেবের মুখ দেখলুম না, বিলিতী চন্দ্রকিরণ কি-রকম তাও জানলুম না, অথচ বিলিতী কবিতায় চন্দ্র-সূর্যের গুণগান পড়া যায় কত! কবিরা সব দেশেই মিথ্যা-বাদী বটে, কিন্তু বিলিতী কবিরা এ-বিষয়ে দস্তুরমত টেক্কা মেরেছেন।"

কুমার তৃতীয় 'স্যাণ্ডউইচ' খানা ধ্বংস ক'রে বললে, "যে দেশে যার অভাব, তারই কদর হয় বেশি।"

বিনয়বাবু আবার আসন গ্রহণ ক'রে বললেন, "কিন্তু বিমল এখনো ফিরে এল না! সেই কোন্ সকালে সে বেরিয়েছে, সন্ধ্যা হ'তে চলল,

এখনো তার দেখা নেই !"

কুমার নিশ্চিন্ত ভাবে চতুর্থ 'স্যাণ্ডউইচে' মস্ত এক কামড় বসিয়ে বললে, "বিমল যখন ফেরে নি তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে তার যাত্রা সফল হয়েছে। হবে না কেন ? কলকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব যে-রকম উচ্চপ্রশংসা ক'রে তাকে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, তা প'ড়ে এখানকার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তারা নিশ্চয়ই বিমলকে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত হবেন।"

বলতে বলতে কুমার আবার পঞ্চম 'স্যাণ্ডউইচে'র দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু বিনয়বাবু বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, "থামো কুমার, থামো ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখনো 'ডিনারে'র সময় হয় নি !" অনেকে মনে করে বেশি খাওয়া বাহাদুরি, কিন্তু আমি মনে করি বেশি খাওয়া অসভ্যতা ! সামনে যতক্ষণ খাবার থাকবে ততক্ষণই মুখ চলবে, এটা হচ্ছে পশুত্বের লক্ষণ !

কুমার অপ্রস্তুত স্বরে বললে, "কি করব বিনয়বাবু, বরফমাখা বিলিতী শীত যে আমার জঠরে রাক্ষুসে ক্ষিধে এনে দিয়েছে !"

বিনয়বাবু ডাকলেন, "আয়রে বাঘা আয় !"

পশমী জামা গায়ে দিয়ে বাঘা তখন খাটের তলার সবচেয়ে অন্ধকার কোনে কুঁকড়ে পিছনের পায়ের তলায় মুখ গুঁজে দিব্য আরামে ঘুম দিচ্ছিল। হঠাৎ কেন তার ডাক পড়ল বুঝতে না পেরে বাঘা মুখ তুলে অত্যন্ত নারাজের মত বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কুমারের লোভী চোখের সামনে ডিসের উপরে তখনো দুখানা 'স্যাণ্ডউইচ' অক্ষত অবস্থায় আক্রান্ত হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই-দুখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "বাঘা, আমার হাতে কি, দেখছিস ?"

বাঘা দেখতে ভুল করলে না। শীতের চেয়ে খাবার বড় বুঝে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা ডন্ দিলে, এবং তারপর দুই-লাফে একেবারে বিনয়বাবুর কাছে এসে হাজির হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে

কুমারের মুখের গ্রাস বাঘার মুখের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমার জুল্‌-জুল্‌ ক'রে খানিকক্ষণ বাঘার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "নিরেট খাবার যখন অদৃশ্য হ'ল, তখন তরল জিনিসই উদরস্থ করা যাক্"—এই ব'লে সে পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢালতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার, আমাদের সঙ্গে সেই দ্বীপে যাবার জন্যে, পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রোজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তবু তো 'বোহিমিয়া'র কোন নাবিক-ই আজ পর্যন্ত দেখা দিলে না।"

কুমার বললে, "তার জন্যে দায়ী ঐ তিনটি লোকের মৃত্যু। 'বোহিমিয়া'র প্রত্যেক নাবিক-ই এখন ব্ল্যাক্ স্নেকের ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।"

এমন সময়ে দরজার পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে বিমল।

কুমার ব'লে উঠল, "এই যে বিমল! এতক্ষণ কোথায় ছিলে, কি করছিলে?"

বিমল তার ওভার-কোটটা খুলতে খুলতে বললে, "কী করছিলুম? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-ইনস্পেক্টার ব্রাউনের সঙ্গে শার্লক হোম্‌সের ভূমিকা অভিনয় করছিলুম।"

—"তোমার হাসি-হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছে অভিনয়ে তুমি সফল হয়েছ!"

—"খানিকটা হয়েছি বৈকি। সেই 'অমাবস্যার রাতে'র ব্যাপারেই তো তুমি জানো, গোয়েন্দাগিরিতেও আমি খুব-বেশি কাঁচা নই।...... কিন্তু আপাতত তুমি হোটেলের চাকরকে ডাকো। ঘটনা-প্রবাহে প'ড়ে সকাল থেকে দাঁতে কিছু কাটবার সময় পাই নি, উদরে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা হৈ হৈ করছে! চা, গরম 'টোস্ট' আর 'আসপারাগোস ওমলেটের' অর্ডার দাও!"

কুমার ভয়ে ভয়ে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "কেবলই কি তোমার জন্যে ভাই? না, আমাদের জন্যেও ছিটেফোঁটা কিছু আসবে?"

বিনয়বাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমাদের মানে? আমি আর কিছু

চাই না,—আমি তোমার মত রাক্ষস নই!"

কুমার নির্লজ্জের মত বললে, "আমিও রাক্ষসত্বের দাবি করি না, তবু আরো কিছু খেতে চাই!"

বিনয়বাবু বললেন, "খাও,খাও—যত পারো খাও। তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে গপ ক'রে গিলে ফেললেও আমি আর টুঁ শব্দ করব না!"

কুমার হাসতে হাসতে খাবারের 'অর্ডার' দিয়ে এল।

বিমল একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে শুয়ে প'ড়ে বললে, "বিনয়বাবু, এই ব্ল্যাক্ স্নেকের ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। গোড়া থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, এই তিনটে ঘটনার মধ্যে কতকগুলো অসম্ভব বিশেষত্ব আছে। এক: তিনজন মৃত ব্যক্তিই এস. এস. বোহিমিয়ার লোক। দুই: যে তিন ব্যক্তি সেই অজানা দ্বীপের পাহাড়ে সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন, মারা পড়েছেন কেবল তাঁরাই। তিন: ভারতের কেউটে সাপ বিলাতে। চার: ইংলণ্ডের প্রচণ্ড শীতেও কেউটে সাপের দৌরাত্ম্য। পাঁচ: যাঁরা মারা প'ড়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ি পরস্পরের কাছ থেকে অনেক মাইল তফাতে আছে, অথচ সবাই মরেছেন কেউটের বিষে। সুতরাং এ-সব কীর্তি একটা সাপের নয়। ছয়: কেউটের আবির্ভাব সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই, কারণ মিঃ চার্লস মরিসের শয়ন-গৃহে একটা মৃত সাপও পাওয়া গিয়েছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ঘটনাগুলো এমন অসম্ভব যে, মনে সত্যি-সত্যি কুসংস্কারের উদয় হয়! কোন রহস্যময় হিংস্র অপার্থিব শক্তিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। সেই শক্তি যেন অজানা দ্বীপে মানুষের পদক্ষেপ পছন্দ করে না। যারাই সেখানে গিয়েছে, সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ অদৃশ্য শক্তির অভিশাপ বহন ক'রে ফিরে এসেছে!"

বিমল একখানা 'টোস্ট' ভাঙতে ভাঙতে বললে, "আমি কিন্তু গোড়া থেকেই কোন অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করি নি।"

—"তবে কি তুমি এগুলোকে দৈব-দুর্ঘটনা ব'লে মনে কর?"

কুমার বললে, "দৈব-দুর্ঘটনার মধ্যে এমন একটা ধারা থাকে না।

এখানে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে যেন কোন কুচক্রীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করছে।"

বিমল বলল, "ঠিক বলেছ। আমিও ঐ সূত্র ধ'রেই সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়েছি। ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টার ব্রাউনের সঙ্গে আমি আজ তিনটে মৃত দেহই পরীক্ষা করেছি, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোক-জনের সঙ্গে কথা কয়েছি, এমন-কি যে ডাক্তার শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাঁর মতামত নিতেও ভুলি নি।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ?"

—"হ্যাঁ। এর মধ্যে কোন অদৃশ্য শক্তির অভিশাপও নেই, এগুলো দৈব-দুর্ঘটনাও নয়!"

—"তবে?"

—"শুনুন, একে একে বলি। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রত্যেক মৃতব্যক্তির দেহে সাপের বিষ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের দেহে সর্পদংশনের স্পষ্ট চিহ্ন আছে। কিন্তু মিঃ চার্লস মরিসের বাড়িতে গিয়ে আমি এক বিচিত্র আবিষ্কার করেছি। ওঁরই খাটের তলায় একটা ক্ষতবিক্ষত মৃত কেউটে সাপ পাওয়া গিয়েছিল। ডিকেটটিভ ব্রাউনের মতে, মিঃ মরিস নিজে মরবার আগে সাপটাকে হত্যা করেছিলেন। অসঙ্গত এ মত নয়। কিন্তু আমার প্রশ্নে প্রকাশ পেল যে, ক্ষত-বিক্ষত সাপটা খাটের তলায় ম'রে পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘরের কোথাও একফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া যায় নি। সাপের দেহের রক্ত কোথায় গেল? ডিটেক্‌টিভ ব্রাউন আমার এই আবিষ্কারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখনি মৃত সাপটাকে শবব্যবচ্ছেদাগারে মিঃ মরিসের লাশের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। লাসের গলায় সাপের দাঁতের দাগ ছিল। মরা সাপের দাঁতের সঙ্গে সেই দাগ মিলিয়ে দেখা গেল, মিঃ মরিস মোটেই সাপটার কামড়ে মারা পড়েন নি, তাঁকে অন্য কোন সাপ কামড়েছে।...এখন বুঝে দেখুন বিনয়বাবু, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমতঃ মিঃ মরিসের ঘরে কি তবে একসঙ্গে দুটো

কেউটে সাপ ঢুকেছিল? একটা তাঁকে কামড়ে পালিয়েছে, আর একটাকে তিনি নিজেই হত্যা করেছেন? কিন্তু লণ্ডনে একসঙ্গে ছুটো কেউটের উদয় একেবারেই আজগুবি ব্যাপার। উপরন্তু, মিঃ মরিস সাপ-টাকে মারলে ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই তার রক্ত পাওয়া যেত। দ্বিতীয়তঃ, সাপটাকে তাহ'লে নিশ্চয়ই কেউ আগে বাইরে কোথাও বধ ক'রে ঘটনাস্থলে তার দেহটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল! কেন? পুলিশের মনে ভ্রম বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে। তাহ'লেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই তিন তিনটে হত্যার মূলে আছে এক বা একাধিক মানুষ। আমার এই অভাবিত আবিষ্কারে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডে মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওখানকার প্রধান কর্তা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, 'ধন্য আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি! আমাদের শিক্ষিত ডিটেক্‌টিভরা এতদিন গোলক-ধাঁধায় পথ হাৎড়ে বেড়াচ্ছিল, আপনিই তাদের পথ বাৎলে দিলেন। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে কোন সুচতুর মানুষই কেউটে সাপের সাহায্যে এই তিনটে নরহত্যা করেছে!'—এখন বলুন বিনয়বাবু, আমার অনুসন্ধান সফল হয়েছে কিনা?"

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "আমিও বলি, ধন্য বিমল। বাঙালীর মস্তিষ্ক যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকেও মুগ্ধ করবে, এটা আমি কখনো কল্পনা করতে পারি নি।"

বিমল ভুরু কুঁচকে বললে, "কল্পনা করতে পারেন নি! কেন? সামান্য ঐ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, বাঙালীর মস্তিষ্ক যে বারবার বিশ্বকেও অভিভূত করেছে! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, ধর্মে বিবেকানন্দ আধুনিক পৃথিবীতে বাঙালীর নাম যে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন! এই সেদিনও বাংলার আঠারো বছরের মেয়ে তরু দত্ত বিলিতী সাহিত্যেও চিরস্মরণীয় কিরণ বিতরণ ক'রে গেছেন! আগেকার কথা না-হয় আর তুললুম না। তবে শ্রীচৈতন্যের মতন ধর্মবীর পৃথিবীর যে কোন দেশকে অমর করতে পারতেন! এমন কি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বুদ্ধদেবকে নিয়েও আমরা গর্ব করতে পারি, কারণ বুদ্ধদেবও

জন্মেছিলেন বাংলারই সীমান্তে !"

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "বিমল, তুমি শান্ত হও,—আমি অপরাধ স্বীকার করছি ! হ্যাঁ, আমিও মানি, বাঙালী হয়ে জন্মেছি বলে আমরা সারা পৃথিবীতে গর্ব করতে পারি !"

বিমল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে চা পান করতে লাগল। তারপর বললে, "বিনয়বাবু, আমি আর একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি।"

—"কি ?"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টেই দেখেছেন তো, বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টন সেই অজানা দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে রাজি ছিলেন না ! জাহাজের লোকেরাই তাঁকে দেশে ফিরতে বাধ্য করেছিল ? মর্টন সাহেবের পুরাতন ভৃত্যকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, তিনি নাকি আবার সেই দ্বীপে যাবার বন্দোবস্ত করছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে যেতেন মিঃ চার্লস মরিস আর মিঃ জর্জ ম্যাক্‌লিয়ড।"

—"কেন ?"

—"সেইটেই তো হচ্ছে প্রশ্ন। ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে কেবল সেই আটজন নিরুদ্দেশ নাবিকের খোঁজ করা, আমার তা মনে হয় না। আরো দেখা যাচ্ছে, কেবল যে তিনজন লোক দ্বীপের সব-চেয়ে-উঁচু শৈলশিখরে গিয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয়বার দ্বীপে যাচ্ছিলেন তাঁরাই। এর মানে কি ?"

কুমার বললে, "আরো একটা প্রশ্ন আছে। কেউটের কামড়ে মৃত্যুও হয়েছে কেবল ঐ তিনজন লোকের। এরই বা অর্থ কি ? বিমল প্রমাণিত করেছে যে, এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মানুষের হাত আছে। কিন্তু সে মানুষ কে ? বোহিমিয়ার যে-তিনজন কর্মচারী আবার দ্বীপে যাবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের হত্যা ক'রে তার কি স্বার্থসিদ্ধি হবে ?"

বিমল বললে, "কুমার তুমি বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছ। আজ হাইড পার্কে ব'সে, পুরো দু'ঘণ্টা ধ'রে আমিও এই-সব প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজবার চেষ্টা করেছি। গোয়েন্দার কাজ সত্য তথ্য নিয়ে বটে, কিন্তু সব কাজের মত গোয়েন্দাগিরির ভিতরেও কল্পনা-শক্তির দরকার আছে

যথেষ্ট।……ধর, তুমি আমি আর বিনয়বাবু বোহিমিয়ার কাপ্তেন মর্টন, প্রথম 'মেট' মরিস আর দ্বিতীয় 'মেট' ম্যাকলিয়ডের স্থান গ্রহণ করলুম। ঝড়ের পরদিন নিরুদ্দেশ নাবিকদের খুঁজতে খুঁজতে আমরা দ্বীপের সব-চেয়ে উঁচু শৈলশিখরে উঠছি। জাহাজের অন্যান্য লোকেরা নিচে অপেক্ষা করছে। আমরা নাবিকদের কোথাও খুঁজে পাইনি। দ্বীপে কাল রাত্রে যারা আলো জ্বেলেছিল তারাও অদৃশ্য। সুতরাং মনে মনে বেশ বুঝতে পারছি যে, এই দ্বীপের মধ্যে কোন একটা গভীর রহস্য আছে। কারণ পৃথিবী হঠাৎ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে এতগুলো লোককে গিলে ফেলে নি। হয়তো এই দ্বীপে বোম্বেটেদের গোপনীয় রত্নগুহা আছে। হয়তো আমরা তিনজনে তারই কোন প্রমাণ দেখতে পেলুম। তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম, এ-কথা জাহাজের আর কারুর কাছে প্রকাশ করা হবে না পরে কোন সুযোগে দ্বীপে আবার এসে সমস্ত গুহা লুণ্ঠন ক'রে টাকাকড়ি ভাগ ক'রে নিলেই চলবে। এইভাবে আমরা সেদিনের মত ফিরে এলুম। কিন্তু জাহাজের কুসংস্কার-ভীত নাবিক আর যাত্রীদের বিরুদ্ধতায় সে-যাত্রায় আর কোন সুযোগ পাওয়া গেল না। তাই বিলাতে এসে আবার নতুন জাহাজ নিয়ে অদৃশ্য নাবিকদের খুঁজতে যাবার অছিলায় আমরা সেই দ্বীপে যাত্রা করবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে যে উপায়েই হোক্ আর এক ব্যক্তি আমাদের গুপ্তকথা জানতে পারলে। খুব সম্ভব, এ ব্যক্তিও বোহিমিয়া জাহাজের কোন নাবিক বা যাত্রী। হয়তো জাহাজে ব'সে আমরা কোনদিন যখন পরামর্শ করছিলুম, আড়াল থেকে সে কিছু-কিছু শুনতে পেয়েছিল। এখন তার প্রধান কাজ কি হবে? তার পথ থেকে জন্মের মত আমাদের তিনজনকে সরিয়ে দেওয়া নয় কি?"

কুমার খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "বিমল, তুমি মনে মনে যে কল্পনা করেছ, তার ভিতরে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় বটে! তবু বলতে হবে, এ তো কল্পনা।"

বিমল বললে, "কিন্তু স্বাভাবিক কল্পনা। আসল ব্যাপারের সঙ্গে

আমার কল্পনা হয়তো হুবহু মিলবে না, কিন্তু আমার হাতে যদি সময় থাকত তা'হলে নিশ্চয়ই প্রমাণিত করতে পারতুম যে, এই কল্পনার মধ্যে অনেকখানি সত্যই আছে।···কিন্তু আমি গোয়েন্দাগিরি করতে বিলাতে আসিনি, এ-সব ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। হ্যাঁ, ভালো কথা। আজকেও দ্বীপে যাবার জন্যে 'বোহিমিয়া'র কোন নাবিক আমাদের বিজ্ঞাপনের আহ্বানে উত্তর দেয় নি?"

কুমার মাথা নেড়ে জানালে, না।

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, তাহ'লে তোমার মতে, "বোহিমিয়ার কোন লোকই এই সব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী?"

বিমল বললে, "হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। সবই আমার অনুমান। তার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এটাও ঠিক জানবেন যে, সে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না।"

—"কেন?"

—"তার পথ থেকে সব কাঁটা স'রে গেছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন, সেই দ্বীপে যাওয়া। কিন্তু সে দ্বীপে জাহাজ লাগে না। সুতরাং আমাদের জাহাজ সেখানে যাচ্ছে শুনলে সে কখনো এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না।"

এমন সময়ে রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, "খোকাবাবু, একটা সায়েব তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সায়েব বটে, কিন্তু রং খুব ফর্সা নয়!"

—"তাকে এখানে নিয়ে এসো।"

একটু পরেই যে-লোকটি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল, সত্যসত্যই তার গায়ের রং শ্যামল। লোকটি মাথায় লম্বা নয় বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহ অসাধারণ—এত চওড়া লোক অসম্ভব বললেও চলে। দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে অসুরের শক্তি আছে। লোকটির মাথায় একগাছা চুলও নেই, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপরে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ।

ঘরে ঢুকেই সে বললে, "কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে

এসেছি।”

বিমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি কি সেই অজানা দ্বীপে যেতে চান ?”

—“হ্যাঁ।”

—“আপনার নাম ?”

—“বার্তোলোমিও গোমেজ। আমি এস. এস. বোহিমিয়ার কোয়ার্টার মাস্টারের কাজ করতুম।”

বিমল, কুমার ও বিনয়বাবুর দৃষ্টি চম্‌কে উঠল !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনাহূত অতিথি

বোহিমিয়া জাহাজের ‘কোয়ার্টার মাস্টার’ বার্তোলোমিও গোমেজ ! বিমলদের সঙ্গে সেই অজানা দ্বীপে যেতে চায় !

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ এইরকম একটি লোকের জন্যেই বিমলরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে। এবং এইরকম একটি লোক না পেলে তাদের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হবারই কথা !

কিন্তু বিমল যে-সময়ে বলছিল যে, বোহিমিয়ার তিনটি লোকের মৃত্যুর জন্যে ঐ জাহাজেরই কোন লোক দায়ী এবং হত্যাকারী তাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না, ঠিক সেই সময়েই গোমেজের অভাবিত আবির্ভাবে তাদের পক্ষে না চম্‌কে থাকা অসম্ভব ! এমন কি শয্যাশায়ী কমলও ‘রাগে’র ভিতর থেকে মুখ বার ক’রে গোমেজকে একবার ভালো ক’রে দেখে নিলে। সে এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বিমলের মতামত শ্রবণ করছিল।

সে-চম্‌কানি গোমেজের চোখেও পড়ল। সে দুই ভুরু কুঁচকে একে

একে সকলের মুখের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিপাত করলে। তারপর বললে, "আমাকে দেখে আপনারা বিস্মিত হ'লেন নাকি?"

বিমল তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "হ্যাঁ মিঃ গোমেজ, আমরা একটু বিস্মিত হয়েছি বটে! আপনার নামটি হচ্ছে পর্তুগীজ, কিন্তু আপনার গায়ের রং আমাদের চেয়ে ফর্সা নয়! এটা আমরা আশা করিনি।"

তখন গোমেজের বাঁকা ভুরু আবার সোজা হ'ল। সে হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "ওঃ, এইজন্যে? কিন্তু আমারও জন্ম যে ভারতবর্ষেই! আমি আগে গোয়ায় বাস করতুম।"

—"বটে, বটে? তাহ'লে আপনি তো আমাদের ঘরের লোক! আরে, এত কথা কি আমরা জানি? বসুন মিঃ গোমেজ, বসুন! এক পিয়ালা চা পান করবেন কি?"

—"না, ধন্যবাদ! আমার হাতে আজ বেশি সময় নেই। আমি একেবারেই কাজের কথা পাড়তে চাই! আপনারা আট্‌লান্টিক মহাসাগরের সেই নির্জন দ্বীপে যেতে চান কেন?"

—"কোথাও কোন বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পেলে আমরা সেখানে না গিয়ে পারি না। এটা আমাদের অনেকদিনের বদ-অভ্যাস। এই বদ-অভ্যাসের জন্যে আমরা একবার মঙ্গল গ্রহেও না গিয়ে পারি নি।"

—"কি বললেন? কোথায়?"

—"মার্স-এ!"

গোমেজ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললে, "মার্স-এ? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নাকি?"

—"মোটেই নয়। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আমরা সত্যসত্যই মঙ্গল-গ্রহে গিয়েছিলুম। সে কাহিনী পৃথিবীর সব দেশের খবরের কাগজেই বেরিয়েছিল। আপনি কি পড়েন নি?"*

* মৎপ্রণীত "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" উপন্যাসে বিমল ও কুমার প্রভৃতির মঙ্গল-গ্রহে যাত্রার আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

—"না। আমরা নাবিক মানুষ, জলের জগতেই আমাদের দিন কেটে যায়, খবরের কাগজের ধার ধারি না। বিশেষ ১৯১৪ হচ্ছে মহাযুদ্ধের বৎসর, তখন যুদ্ধের হৈ-চৈ নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলুম।"

—"আচ্ছা, আমাদের কাছে পুরানো খবরের কাগজগুলো এখনো আছে, আপনাকে পড়তে দেব অখন।"

—"দেখছি, আপনারা হচ্ছেন আশ্চর্য, অসাধারণ মানুষ!···তাহ'লে আপনাদের বিশ্বাস, ঐ আজানা দ্বীপে কোন বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে?"

গোমেজের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে কুমার বললে, "মিঃ গোমেজ, আপনিও কি বিশ্বাস করেন না যে, সেই দ্বীপে কোন অদ্ভুত রহস্য আছে?"

গোমেজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "অদ্ভুত রহস্য বলতে আপনারা কি বোঝেন, বলতে পারি না। রহস্য মাত্রই অদ্ভুত নয়।"

বিনয়বাবু বললেন, "আটলান্টিকের মাঝখানে হঠাৎ ঐ দ্বীপের আবির্ভাব কি অদ্ভুত নয়?"

—"মোটেই নয়। আটলান্টিকের মাঝখানে এর আগেও ঐ-রকম জলমগ্ন দ্বীপ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। আটলান্টিক ঠাণ্ডা শান্ত সমুদ্র নয়। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন, আটলান্টিকের পেটের ভিতরে এত ওলট-পালট হচ্ছে যে, যখন-তখন সে ছোট ছোট অজানা দ্বীপের জন্ম দিতে পারে।"

—"কিন্তু সেই জনহীন দ্বীপে রাত্রে আলো নিয়ে কারা চলা-ফেরা করছিল?"

—"আমার বিশ্বাস, চোখের ভ্রমেই আমরা আলো দেখেছিলুম।"

—"আপনাদের আটজন নাবিক সেই দ্বীপ থেকে কোথায় অদৃশ্য হ'ল?"

—"কে বলতে পারে যে, তারা কোন গুপ্ত গহ্বরে প'ড়ে যায় নি?"

—"সেই দ্বীপে আপনারা অনেক বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখেন নি?"

—"দেখেছি। দ্বীপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কেবল সেই মূর্তি-গুলোই। তাছাড়া সেখানে দেখবার আর কিছুই নেই। এমন-কি এক-ফোঁটা জল পর্যন্ত নেই! সেখানে দু-চারদিনের বেশি বাস করাও সম্ভব নয়।"

—"মিঃ গোমেজ, তাহ'লে আপনি কি আমাদের সেখানে যেতে মানা করছেন?"

গোমেজ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, না,! যেতে আমি কারুকেই মানা করছি না! তবে আমার কথা হচ্ছে, দ্বীপে গিয়ে আপনারা কোন অদ্ভুত রহস্য দেখবার আশা করবেন না।"

বিমল বললে, "মিঃ গোমেজ, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বলছেন, দ্বীপে কোন রহস্য নেই। তবে মর্টন, মরিস্ আর ম্যাক্-লিয়ড্ সাহেব আবার সেই দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কেন?"

সচকিত কণ্ঠে গোমেজ বললে, "তাই নাকি? কেমন ক'রে জানলেন আপনি?"

—"যেমন ক'রেই হোক্, আমি জেনেছি!"

—"কিন্তু আমি জানি না। হয়তো তাঁরা সেই নিরুদ্দেশ নাবিকদের খোঁজেই আবার সেখানে যাচ্ছিলেন।"

—"হ'তে পারে মিঃ গোমেজ, হয়তো এটাও আপনার জানা নেই যে, পাছে তাঁরা আবার সেই দ্বীপে যান সেই ভয়ে কেউ তাঁদের খুন করেছে!"

গোমেজ চম্‌কে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনি কি বলছেন? সবাই তো জানে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ব্ল্যাক্ স্নেকের কামড়ে!"

—"হ্যাঁ, ভারতীয় ব্ল্যাক্ স্নেক! কিন্তু মিঃ গোমেজ, লণ্ডনে হঠাৎ এত বেশি ব্ল্যাক্ স্নেক কেমন ক'রে এল? যদি ধরা যায়, আপনার মত কোন ভারতবাসী বিলাতে সখ ক'রে ব্ল্যাক্ স্নেক নিয়ে এসেছে, তা'হলে বরং—"

বিমলকে বাধা দিয়ে গোমেজ সামনের কাঁচ-ঢাকা টেবিলের উপরে

জোরে চড় মেরে ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল, "মশাই, আমি সাপুড়ে নই! আমি সঙ্গে ক'রে আনব ভারতের সর্বনেশে ব্ল্যাক্ স্নেক? উঃ, অদ্ভুত কল্পনা!"

বিমল সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "না, না মিঃ গোমেজ! আমি আপনাকে কথার কথা বলছিলুম মাত্র, আপনার উপরে কোনরকম অভদ্র ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়!"

গোমেজ শান্ত হয়ে বললে, "দেখুন, পুলিশ কি-রকম গাধা জানেন তো? অনুগ্রহ করে এ-রকম কথা আর মুখেও আনবেন না। পুলিশ যদি একবার এই কথা শোনে, তা'হলে অকারণেই আমার প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ক'রে ছাড়বে! ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এখন কাজের কথা বলুন! আপনারা কবে সেই দ্বীপে যাত্রা করবেন?"

—"আমরা তো প্রস্তুত। এতদিন কেবল বোহিমিয়ার কোন প্রত্যক্ষ-দর্শী নাবিকের জন্যেই অপেক্ষা ক'রে বসেছিলুম। এখন আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন যে-কোনদিন যেতে পারি!"

—"আমার কাছ থেকে আপনারা কি সাহায্যের প্রত্যাশা করেন?"

—"প্রথমত, আপনি দ্বীপের সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই সব কথা প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের জাহাজের পথপ্রদর্শক হবেন আপনি। তৃতীয়ত, গেল-বারে দ্বীপের যে যে জায়গায় গিয়ে আপনারা নাবিকদের খোঁজ করেছিলেন আপনাকে সেসব জায়গা আবার আমাদের দেখাতে হবে। বিশেষ ক'রে দেখতে চাই আমি দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরটা।"

—"কিন্তু সেখানটা তো আমি নিজেই দেখি নি। সেখানে উঠে-ছিলেন খালি মিঃ মর্টন, মিঃ মরিস্ আর মিঃ ম্যাক্লিয়ড।

—"হুঁ। আর সেইজন্যেই হতভাগ্যদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে! এ কথা পুলিশ জানে না, কিন্তু তাঁদের হত্যাকারী জানে, আর আমিও জানি!"

গোমেজ অবাক বিস্ময়ে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার-

পর ধীরে ধীরে বললে, "আপনার প্রত্যেক কথাই সেই দ্বীপের চেয়েও রহস্যময়।"

বিমল যেন আপন মনেই বললে, "দ্বীপের সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরে গিয়ে উঠলেই সকল রহস্যের কিনারা হবে।"

গোমেজ হাসতে হাসতে বললে, "যদিও আমি সেখানে উঠিনি, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে উঠে আপনি পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না! হতচ্ছাড়া সেই পাহাড়ে দ্বীপ! একটা জীব, একটা গাছ, একগাছা ঘাস পর্যন্ত সেখানে নেই! সমুদ্রের নীল গায়ে হঠাৎ যেন একটা কালো ফোড়ার মত সে গজিয়ে উঠেছে! হাঁ, আর একটা অনুমানও মন থেকে মোছবার চেষ্টা করুন। আমার সঙ্গীদের মৃত্যুর সঙ্গে সেই দ্বীপের বা কোন মানুষ-হত্যাকারীর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, তাঁরা মারা পড়েছেন দৈব-গতিকে, ব্ল্যাক্ স্নেকের দংশনে।"

—"ও কথায় আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিশ্বাস অন্যরকম।"

এমন সময়ে ল্যাজ দুলিয়ে বাঘার প্রবেশ। গম্ভীরভাবে এগিয়ে এসে গোমেজের পদযুগল বার-কয়েক শুঁকে যে কি পরীক্ষা করলে তা কেবল সেই-ই জানে।

গোমেজ বললে, "ভারতের ব্ল্যাক্ স্নেক বিলাতে এসেছে ব'লে সবাই অবাক হচ্ছে, কিন্তু ভারতের দেশী কুকুরের বিলাত-দর্শনটাও কম আশ্চর্য নয়। আচ্ছা তাহ'লে উঠতে হয়। আপনাদের সঙ্গে আমার যাওয়ার কথাটা পাকা হয়ে রইল তো?"

—"নিশ্চয়! কাল সকালে অনুগ্রহ ক'রে এসে নিয়োগ-পত্র নিয়ে যাবেন। আজ আমি বড় শ্রান্ত।"

—"উত্তম। নমস্কার।"

—"নমস্কার!"

গোমেজ প্রস্থান করল। বিমল একখানা ইজি-চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে দুই চোখ মুদলে।

কুমার বললে, "কি হে, তুমি এখনি ঘুমোবে নাকি?"

—"না, এখন আমি ভাব্‌ব।"

—"কি ভাব্‌বে?"

—"অতঃপর আমার কি করা উচিত? আগে এই হত্যা-রহস্যের কিনারা করব, না আগে দ্বীপের দিকে যাত্রা করব?"

কুমার বললে, "হত্যা-রহস্যের কিনারা করার জন্যে রয়েছে বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শত শত ধূর্ত লোক, তা নিয়ে তুমি-আমি ভেবে মরব কেন?"

বিমল বললে, "ভেবে মরব কেন? তুমি কি এখনো বুঝতে পারো নি যে, হত্যারহস্য আর দ্বীপ-রহস্য—এ দুটোই হচ্ছে একখানা ঢালের এ-পিঠে আর ও-পিঠে?"

কুমার একখানা চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে বসতে গেল, বিমল হঠাৎ চোখ খুলে ব্যস্ত স্বরে বললে, "তফাৎ যাও! আজ তোমরা কেউ এদিকে এস না!

কুমার হতভম্বের মত বললে, "এদিকে আসব না? কেন?"

বিমল বিরক্তকণ্ঠে বললে, "কথায় কথায় জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই!...তারপর আরো শোনো। বাঘা আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে এই ঘরেই থাকবে। আজ যা শীত পড়েছে, বাইরে থাকলে পর ওর কষ্ট হবে।"

লণ্ডনের শীতার্ত রাত্রি। পথে জনপ্রাণীর পদশব্দ পর্যন্ত নেই—বাতাসও যেন শ্বাস রুদ্ধ ক'রে আড়ষ্ট হয়ে আছে। চারিদিকে ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ করে যেন তুষারের লাজাঞ্জলি বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার আলোগুলোর চোখ ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে—দপ্ ক'রে যেন নিবে যেতে পারলেই তারা বাঁচে।

গম্ভীর স্তব্ধতার অন্তরাত্মার মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মেরে মেরে "বিগ বেন" ঘড়ি তার প্রচণ্ড কণ্ঠে তিনবার চিৎকার ক'রে উঠল—ঢং! ঢং! ঢং!

হোটেলে বিমলদের ঘরে এখন প্রধান অতিথি হয়েছে নিরন্ধ্র অন্ধকার। কয়েকটি নিশ্চিন্ত নিদ্রিত প্রাণীর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া সেখানেও আর জীবনের কোন লক্ষণই নেই, জীবনের সাড়া দেবার চেষ্টা করছে কেবল একটি জড় পদার্থ। টেবিলের ঘড়িটার কোন ক্লান্তি নেই, নীরবতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে ক্রমাগত ব'লে যাচ্ছে—টিক্ টিক্, টিক্ টিক্, টিক্ টিক্, টিক্ টিক্!

আচম্বিতে আর-একটা শব্দ শোনা গেল। খুব আস্তে আস্তে যেন কোন্ জানলার একটা সার্সি খুলে যাচ্ছে। জানলার কাছে অন্ধকারের ভিতরে যেন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। কেমন একটা খুট্ খুট্ শব্দ হচ্ছে!

সে-শব্দ এত-মৃদু যে কোন ঘুমন্ত মানুষের কানই তা শুনতে পেলে না।

কিন্তু শুনতে পেলে বাঘার কান। হঠাৎ সে গরর গরর ক'রে গর্জে উঠল!

ডানহাতে রিভলবার তুলে বিমল দেখলে, জানলার কাছে সার্সির উপরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট মূর্তি! প্রকাণ্ড ওভারকোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা এবং তার মুখখানাও অদৃশ্য এক কালো মুখোসের আড়ালে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রৌপ্যসর্পমুখ

আকস্মিক বৈদ্যুতিক আলোকের তীব্র প্রবাহে অন্ধ হয়ে মূর্তিটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—ক্ষণিকের জন্যে। পর-মুহূর্তেই জানলার ধার থেকে এক লাফ মেরে সে আলোকরেখার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল তাড়াতাড়ি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার তীক্ষ্ণ চক্ষু বাইরের শীতার্ত অন্ধকারের ভিতর থেকে কোন দ্রষ্টব্যই আবিষ্কার করতে পারলে না।

ততক্ষণে বাঘার ঘন ঘন উচ্চ চিৎকারে ঘরের আর সকলের ঘুম ভেঙে গেছে।

কুমার বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ত্রস্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ব্যাপার কি বিমল?"

বিমল হেসে বললে, "এমন কিছু নয়। সেই 'ব্ল্যাক্ স্নেকের' সাপুড়ে আজ আমাদের সঙ্গে গোপনে আলাপ করতে এসেছিল!"

—"বল কি! কি ক'রে জানলে তুমি?"

—"সে যে আসবে, আমি তা জানতুম। দ্বীপের সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরে যে একটা বৃহৎ গুপ্তরহস্য আছে, এটা আমরা টের পেয়েছি। কাজেই 'ব্ল্যাক্ স্নেকের' অধিকারী যে এখন আমাদের জীবন-প্রদীপের শিখা নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। দুঃখের বিষয় এই যে, তাকে আজ ধরতে পারলুম না।"

বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু তার চেহারা দেখেছ?"

—"দেখেছি বটে, তবে তাকে আবার দেখলে চিন্‌তে পারব না। কারণ সে ঘোমটা দিয়ে এসেছিল।"

—"ঘোমটা দিয়ে?"

—"অর্থাৎ মুখোস পরে। কিন্তু সে তার একটি চিহ্ন পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে।"

—"কি চিহ্ন?"

জানলার সার্সি টেনে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, "সার্সির এইখানে সে হাত রেখেছিল। কাঁচের উপরে তার ডান-হাতের আঙুলের ছাপ আছে। জানেন তো বিনয়বাবু, কোন দুজন লোকের আঙুলের ছাপ একরকম হয় না?"

—"জানি। পুলিশও তাই সমস্ত অপরাধীর আঙুলের ছাপ জমা ক'রে রাখে।"

—"কুমার, খানিকটা 'গ্রে পাউডার' আর আঙুলের ছাপ তোলবার অন্যান্য সরঞ্জাম এনে দাও তো।"

কুমার বললে, "আসামী যখন পলাতক, তখন আঙুলের ছাপ নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে?"

—"অন্তত এ ছাপটা 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে' পাঠিয়ে দিলে জানা যাবে যে, 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র অধিকারী পুরাতন পাপী কিনা! পুরাতন পাপী হ'লে—অর্থাৎ পুলিশের কাছে তার আঙুলের আর-একটা ছাপ পাওয়া গেলে তাকে খুব সহজেই ধ'রে ফেলা যাবে।"

—"কিন্তু আজ এখানে যে এসেছিল, সে যদি অন্য লোক হয়? হয়তো 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই—সে একটা সাধারণ চোর মাত্র!"

—"কুমার, তোমার এ অনুমানও সত্য হ'তে পারে। তবু দেখাই যাক্ না! জিনিসগুলো এনে দিয়ে আপাতত তোমরা আবার লেপ মুড়ি দিয়ে স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা কর-গে যাও।"

পরদিন সকালে বিনয়বাবুকে নিয়ে কুমার ও কমল যখন বেড়াতে বেরুল, বিমল তাদের সঙ্গে গেল না; সে তখন সেই আঙুলের ছাপের ফটোগ্রাফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে তারা আবার হোটেলে ফিরে এসে দেখলে, ঘরের মাঝখানে বড় টেবিলটার ধারে বিমল চুপ ক'রে ব'সে ব'সে কি ভাবছে।

কুমার সুধোলে, "কি হে, আঙুলের ছাপের ফোটো তোলা শেষ হ'ল?"

—"হুঁ। এখানে এসে এই ছবিখানি একবার মিলিয়ে দেখ দেখি।"

কুমার এগিয়ে এসে দেখলে, টেবিলের উপর পাশাপাশি দুখানা ফোটো প'ড়ে রয়েছে। খানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা ক'রে সে বললে,

"এ তো দেখছি একই আঙুলের দু-রকম দুখানা ছবি। একখানা ছবি না-হয় তুমিই তুলেছ, কিন্তু আর একখানা ছবি কোথায় পেলে ? স্কট-ল্যাণ্ড্ ইয়ার্ড থেকে আনলে নাকি ?"

—"না, দুখানা ছবিই আমার তোলা। এখন বল দেখি, এই দুটো ছাপের রেখা অবিকল মিলে যাচ্ছে কিনা ?"

—"হ্যাঁ, অবিকল মিলে যাচ্ছে বটে !"

অত্যন্ত উৎফুল্ল মুখে ছবিখানা পকেটে পুরে বিমল বললে, "কুমার, কাল সকালেই খবরের কাগজে দেখবে, 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র অধিকারী গ্রেপ্তার হয়েছে !"

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে "সে কি হে। তোমার এতটা নিশ্চিত হবার কারণ কি ? আঙুলের ছাপই না-হয় পেয়েছ, কিন্তু ওতে তো আর কারুর নাম লেখা নেই !"

বিমল কান পেতে কি শুনলে, তারপর চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসে বললে, "ও-সব কথা পরে হবে অখন। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে, বোধ হয় মিঃ গোমেজ নিয়োগ-পত্র নিতে আসছেন। আগে তাঁর মামলা শেষ ক'রে ফেলা যাক—কি বল ?"

গোমেজ ঘরের ভিতরে আসতেই বিমল উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "গুড্ মর্নিং মিঃ গোমেজ, গুড্ মর্নিং ! আমরা আপনারই অপেক্ষায় ব'সেছিলুম।"

গোমেজ বললে, "আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু শুনলুম, কাল নাকি আপনাদের ঘরে চোর ঢুকেছিল ?"

—"এখনি এ-খবরটা কে আপনাকে দিলে ?"

—"আপনাদের ভৃত্য !"

—"ও, রামহরি ? হ্যাঁ, কালরাত্রে একটা লোক এই ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল বটে ! কিন্তু আমি জেগে আছি দেখে পালিয়ে গেছে।"

—"বাস্তবিক, আজকাল লণ্ডন শহর বড়ই বিপদ্‌জনক হয়ে উঠেছে। চারিদিকে দিন-রাত চোর-ডাকাত-হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই

বলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশবাহিনীর মত কর্মী দল পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু আমি এ-কথায় বিশ্বাস করি না। শহরের এত-বড় রাস্তার উপরে আপনাদের এই বিখ্যাত হোটেল, অথচ বিলাতী পুলিশ সেখানেও চোরের আনাগোনা বন্ধ করতে পারে না! লজ্জাকর!"

বিনয়বাবু বললেন, "মিঃ গোমেজ, আমিও আপনার মতে সায় দি। দেখুন না, 'ব্ল্যাক স্নেকে'র এই অদ্ভুত রহস্যের কোন কিনারাই এখনো হ'ল না!"

গোমেজ বললে, "কিন্তু ও-জন্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে বেশি দোষ দিই না। ও রহস্যের কিনারা হওয়া অসম্ভব!"

বিমল বললে, "কেন?"

—"জানেন তো, সমুদ্রে আমাদের মতন যারা নাবিকের কাজ করে, তাদের এমন সব সংস্কার থাকে সাধারণের মতে যা কুসংস্কার! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, 'ব্ল্যাক্ স্নেক'-রহস্যের মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি কাজ করছে। অলৌকিক শক্তির সামনে পুলিশ কি করবে?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "কিন্তু এই 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র রহস্যের সঙ্গে যে-শক্তির সম্পর্ক আছে, তাকে আমি অনায়াসেই দমন করতে পারি।"

—"পারেন? কি ক'রে?"

—"আমার এই একটি মাত্র ঘুষির জোরে!"—ব'লেই বিমল আচম্বিতে গোমেজের মুখের উপরে এমন প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলে যে, সে তখনই ঘুরে দড়াম্ ক'রে মাটির উপরে প'ড়ে গেল! পর মুহূর্তেই সে গোমেজের দেহের উপরে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে, "কুমার! কমল! শীগ্‌গির খানিকটা দড়ি আনো!"

বিনয়বাবু হাঁ হাঁ ক'রে উঠে বললেন, "বিমল, বিমল! তুমি কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে? মিঃ গোমেজকে খামোকা ঘুষি মারলে কেন?"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "আরে মশাই, আগে দড়ি এনে গোমেজ-বাবাজীকে আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেলুন, তারপর অন্য কথা!"

কুমার ও কমল যখন দড়ি এনে গোমেজের হাত-পা বাঁধতে নিযুক্ত হ'ল, বিনয়বাবু তখন বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন—"এ বড়ই অন্যায়, এ বড়ই অন্যায়!"

বিমল গোমেজকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কুমার হতভম্বের মত বললে, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

বিমল বললে, "কাল রাত্রে এই গোমেজই মুখোস প'রে আমাদের ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল!"

ততক্ষণে গোমেজের আছন্ন-ভাবটা কেটে গিয়েছে। সে একবার ওঠবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে দাঁত-মুখ খিচিয়ে ব'লে উঠল, "মিথ্যা কথা!"

বিমল বললে, "মিথ্যা কথা নয়। আমার কাছে প্রমাণ আছে।"

—"কী প্রমাণ?"

বিমল হাসিমুখে বললে, "বাপু গোমেজ, মনে আছে, কাল যখন আমি ব'লেছিলুম—'হয়তো তুমিই ভারতীয় 'ব্ল্যাক্ স্নেক'কে বিলাতে নিয়ে এসেছ, তুমি মহা ক্ষাপ্পা হয়ে এই কাঁচ-ঢাকা টেবিলের উপরে চড় বসিয়ে দিয়েছিলে? কাঁচের আর পালিস-করা জিনিসের উপরে চড় মারলেই আঙুলের ছাপ্ পড়ে জানো-তো? আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলুম, লণ্ডনে যে-ব্যক্তি খুশিমত 'ব্ল্যাক্ স্নেক' খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না। এই সন্দেহের কারণ উপস্থিত বন্ধুদের কাছে আগেই বলেছি। বিজ্ঞাপনের ফলে দেখা দিয়েছ তুমি। তাই তোমাকেও আমি সন্দেহ করেছি। কাজেই টেবিলের কাঁচের উপর থেকে তোমার আঙুলের ছাপের ফটো আমি তুলে রেখেছি। এই দেখ, তোমার সেই আঙুলের ছাপের ফটো! তারপর কাল গভীর রাতে এই ঘরে ঢুকতে এসে তুমি আবার বোকার মত জান্‌লার সার্সিতে হাত রেখেছিলে—আর, তোমার মরণ হয়েছে সেইখানেই। কারণ সার্সির উপরেও যে আঙুলের ছাপ পেয়েছি তার ফোটোর সঙ্গে আগেকার ফোটো মিলিয়েই আমি তোমাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি—বুঝলে? বোকারাম, এখনো নিজের দোষ স্বীকার কর।"

বিনয়বাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, “বিমল, তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি!”

কুমার বললে, “গোয়েন্দাগিরিতেও যে বিমলের মাথা এত খেলে, আমিও তা জানতুম না!”

কমল এমন ভাবে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, যেন সে চোখের সামনে কোন মহামানবকে নিরীক্ষণ করছে।

এতক্ষণে গোমেজ নিজেকে সামলে নিলে। শুক্‌নো হাসি হেসে মনের ভাব লুকিয়ে সে সংযত স্বরে বললে, “তোমাদের ও-সব তুচ্ছ প্রমাণের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমি এখন কোন কথা বলতে চাই না। কিন্তু দেখছি, তোমাদের মতে আমিই হচ্ছি ‘ব্ল্যাক্ স্নেকের’ মালিক! অর্থাৎ আমিই তিন-তিনটে মানুষ খুন করেছি?”

বিমল মাথা নেড়ে বললে, “হ্যাঁ, আমার তো তাই বিশ্বাস। অন্তত ঐ তিনটে খুনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।”

—“প্রমাণ? বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে এসেছি, এ প্রমাণ দেখে তো বিচারক আমার ফাঁসির হুকুম দেবেন না! আদালতে এটা প্রমাণ ব’লেই গ্রাহ্য হবে না!”

—“ওহো, গোমেজ! তুমি এখনো ল্যাজে খেলছ? তুমি জেনে নিতে চাও, তোমার বিরুদ্ধে আমরা কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি? আচ্ছা, সে-সব যথাসময়ে জানতে পারবে। এখন প্রথমে আমি তোমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করব। তারপর তোমার বাসা খানা-তল্লাসের ব্যবস্থা ক’রব।”

—“কেন?”

—“সেখানে আরো কতগুলো ‘ব্ল্যাক্ স্নেক’ আছে তা দেখবার জন্যে।”

গোমেজ অট্টহাস্য ক’রে বললে, “ওহে অতি-বুদ্ধিবান বাঙালী বাবু! আমার বাসা থেকে তুমি যদি আধখানা ‘ব্ল্যাক্ স্নেক’ও খুঁজে বার করতে পারো, তা হ’লে আমি হাজার টাকা বাজি হারব!”

বিমল গোমেজের দেহের দিকে এগিয়ে বললে, “কিন্তু তার আগে

আমি তোমার জামার পকেটগুলো হাতড়ে দেখতে চাই।"

—"কেন? তুমি কি মনে কর, আমার জামার পকেটগুলো হচ্ছে 'ব্ল্যাক স্নেকে'র বাসা?"

বিমল কোন জবাব না দিয়ে গোমেজের দেহের দিকে হেঁট হ'ল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গোমেজ হঠাৎ তার বাঁধা পা-দুখানা তুলে বিমলের বুকের উপরে জোড়া-পায়ে বিষম এক লাথি বসিয়ে দিলে! বিমল এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে একেবারে চার পাঁচ হাত দূরে ঠিক্‌রে গিয়ে ভূতলশায়ী হ'ল।

তারপরেই সকলে-সবিস্ময়ে দেখলে, গোমেজের পায়ের বাঁধন কেমন ক'রে খুলে গেল এবং হাত-বাঁধা অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বেগে দরজার দিকে ছুটল!

কিন্তু দরজার কাছে গম্ভীর মুখে ব'সেছিল বাঘা। সে হঠাৎ গোমেজের কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে মস্ত এক লাফ মারলে!

গোমেজ একপাশে সাঁৎ ক'রে স'রে গিয়ে বাঘার লক্ষ্য ব্যর্থ করলে বটে, কিন্তু বাঘা মাটিতে প'ড়েই বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরে তার একখানা পা প্রাণপণে কামড়ে ধরলে এবং কুমার, কমল ও বিনয়বাবু সময় পেয়ে আবার তাকে ধ'রে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে, "শাবাশ গোমেজ! ঘরে আমরা এতগুলো মদ্দ রয়েছি, আর তোমার হাত-পা বাঁধা! তবু তুমি আমাকে কুপোকাত করতে পেরেছো! তোকেও বাহাদুরি দিই বাঘা! তুই না থাকলে তো এতক্ষণে আমাদের মণিহারা ফণীর মত ছুটোছুটি করতে হ'ত! বাঁধো কুমার, গোমেজকে এবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেল!"

গোমেজ রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, "থাকতো যদি হাতদুটো খোলা।"

বিমল বললে, "কিন্তু সে দুঃখ ক'রে আর কোনই লাভ নেই! এখন আর বেশি ছট্‌ফট্ কোরো না! পকেটগুলো দেখাতে তোমার এত আপত্তি কেন? এটা তো দেখছি, রিভলবার। তুমি তাহ'লে সর্বদাই রিভলভার নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও? আইনে এটা যে সাধুতার লক্ষণ নয়,

তা জানো তো ? এটা বোধ হয় ডায়েরি ? হুঁ, পাতায় পাতায় অনেক কথাই লেখা রয়েছে। হয়তো পরে আমাদের কাজে লাগতে পারে— কুমার, ডায়েরিখানা আপাতত তোমার জিম্মায় থাক্‌ ! এটা কি ? কার্ড-বোর্ডের একটা বাক্স ! কিন্তু বাক্সটা এত ভারি কেন ?”

গোমেজের মুখ সাদা হয়ে গেছে—ভয়ে কি যাতনায় বোঝা গেল না ! সে ক্ষীণ স্বরে বললে, “ও কিছু নয় ! ওতে একটা খেলনা ছাড়া আর কিছু নেই !”

বিমল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, “খেলনা ? হুঁ, শয়তানের খেলনা হচ্ছে মানুষের প্রাণ, বিড়ালের খেলনা হচ্ছে ইঁদুর ! তোমারও খেলনা আছে শুনে ভয় হচ্ছে। দেখা যাক এ আবার কি-রকম খেলনা !”

বিমল খুব সাবধানে একটু একটু ক’রে বাক্সের ডালাটা খুললে— কিন্তু তার ভিতর থেকে ভয়াবহ কিছুই বেরুলো না। খানিকটা তুলোর মাঝখানে রয়েছে একটা রূপোর জিনিস। সেটাকে বার ক’রে তুলে ধরলে।

গোমেজ বললে, "আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না, এখন দেখছ তো ওটা একটা খেলনা, আমার এক বন্ধুর মেয়েকে উপহার দেব ব'লে কিনেছি।"

কুমার জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বললে, "রূপো-দিয়ে গড়া একটা সাপের মুখ!"

রূপোয় তৈরি সেই নিখুঁত সর্পমুখের দিকে সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বিমল বললে, "কুমার গোমেজের এই অদ্ভুত খেলনা দেখে সত্যিই আমার ভয় হচ্ছে। এটা জ্যান্ত নয়, মরা সাপও নয়, কিন্তু এমন জিনিস গোমেজের পকেটে কেন? এটা কোন্ অমঙ্গলের নিদর্শন? অনেক ভারত-বাসীর মতন গোমেজও কি সাপ-পুজো করে?"

গোমেজ হঠাৎ হা হা করে বিশ্রী হাসি হেসে ব'লে উঠল, "না, হিন্দুদের মতন আমি সাপ-পুজো করি না—ওটা হচ্ছে খেলনা, আর আমি হচ্ছি ক্রীশ্চান!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সব কাকেরই এক ডাক

বিমল জানলার কাছে গিয়ে বাইরের আলোতে অনেকক্ষণ ধ'রে সেই রূপোর সাপের মুখটা উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করলে। এ-রকম অদ্ভুত জিনিস সে আর কখনো দেখে নি।

এটা গড়েছে কোন অসাধারণ কারিকর। মুখটা অবিকল একটা প্রমাণ কেউটে সাপের মতন দেখতে।

পরীক্ষা শেষ হ'লে পর বিমল ফিরে ডাকলে, "বিনয়বাবু, আপনারা এদিকে আসুন।"

সকলে গেলে পরে বিমল বললে, "এটা কেবল সাপের মুখ নয়, এটা

একটা যন্ত্রও বটে !”

—“যন্ত্র ?”

—“হুঁ । এই দেখুন, কল টিপ্‌লে সাপের মুখটাও হাঁ করে !”

বিমল কল টিপ্‌লে, মুখটাও অমনি জ্যান্তো সাপের মতই ফস্ ক’রে হাঁ করলে !

বিনয়বাবু চমৎকৃত স্বরে বললেন, “ওর মুখের ভিতরে যে দাঁতও রয়েছে !”

—“হ্যাঁ, কাঁচের দাঁত। এমন-কি বিষ-দাঁত পর্যন্ত বাদ যায় নি।··· কুমার, টেবিলের উপর থেকে ঐ ‘পিন-কুশন’টা নিয়ে এস তো।”

কুমার সেটা নিয়ে এল। বিমল সাপের মুখটা ‘পিন্-কুশনে’র উপরে রেখে ‘স্প্রিং’ ছেড়ে দিতেই দাঁত দিয়ে সেই মুখটা ‘কুশন্’ কাম্‌ড়ে ধরলে।

‘স্প্রিং’ টিপে আবার মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিমল ‘পিন্-কুশন্’টা আঙুল বুলিয়ে পরীক্ষা ক’রে বললে, “কুশন্‌টা ভিজে গেছে। তার মানে সাপের মুখ থেকে খানিকটা জলীয় পদার্থ কুশনের উপরে গিয়ে পড়েছে।”

কুমার বললে, “এই জলীয় পদার্থটি কী হ’তে পারে ?”

বিমল ধীরে ধীরে গোমেজের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, “গোমেজের দেহের উপরেই সে পরীক্ষা করা যাক্ !”

গোমেজের বাঁধা হাতের উপরে সাপের মুখ রেখে বিমল ‘স্প্রিং’টা টিপতেই সদা-প্রস্তুত রৌপ্য-সর্প দন্তবিকাশ করলে !

—সঙ্গে সঙ্গে গোমেজের আশ্চর্য ভাবান্তর। সে কোনরকমে হুড়াৎ ক’রে মেঝের উপরে খানিকটা তফাতে স’রে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “রক্ষা কর ! রক্ষা কর !”

বিমল বললে, “কেন গোমেজ ? তোমার মতে এটা তো খেলনা মাত্র।—এর সঙ্গে তোমাকে খেলা করতেই হবে, নইলে কিছুতেই আমি ছাড়ব না।”

বিমল আবার এগিয়ে গেল, গোমেজ তেমনি ক’রে আবার স’রে গেল, —বিষম আতঙ্কে তার দুই চক্ষু ঠিক্‌রে তখন কপালে উঠেছে !

বিমল হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে ব'সে পড়ে বাঁ-হাতে গোমেজকে চেপে ধরে কর্কশ কণ্ঠে বললে, "বল তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? নইলে এই রূপোর সাপের কবল থেকে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাবে না।"

গোমেজ বিবর্ণ মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বিষ আছে! ওর ফাঁপা কাঁচের দাঁতে বিষ আছে।"

"কেউটে সাপের বিষ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেউটে সাপের বিষ। যখন সব ব্যাপারই বুঝতে পেরেছ তখন আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কুমার, 'ব্ল্যাক্-স্নেকে'র রহস্য এখন বুঝতে পারলে কি? এই সাংঘাতিক যন্ত্রটা একেবারে সাপের মুখের আকারে তৈরি করা হয়েছে—এমন কি এই কলের মুখটা কারুকে কামড়ালে ঠিক সাপে কামড়ানোর মতন দাগ পর্যন্ত হয়! এর ফাঁপা বিষ-দাঁতটা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতে বিষ ঢেলে দেয়! এই জন্যেই মর্টন, মরিস্ আর ম্যাক্লিয়ড ইহলোক থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন।"

বিনয়বাবু বিস্ফারিত নেত্রে সর্পমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি ভয়ানক!"

কুমার বললে, "কিন্তু ঘটনাস্থলে একবার একটা সত্যিকার কেউটে সাপও তো পাওয়া গিয়েছে!"

বিমল শুষ্ক হাস্য ক'রে বললে, "হ্যাঁ, মরা সাপ! গোমেজ হয়তো তার নকল সাপের মুখের জন্যে আসল বিষ-দাঁত থেকে বিষ সংগ্রহ করেছিল। তারপর তাকে হত্যা করে ঘটনাস্থলে ফেলে গিয়েছিল, পুলিশের চোখে ধাঁধা দেবার জন্যে! আসল সাপ চোখে দেখলে আর নকল সাপের কথা সন্দেহ করবে না কেউ! কেমন গোমেজ, তাই নয় কি?"

গোমেজ রেগে কটমট ক'রে বিমলের দিকে তাকালে, কিন্তু একটাও কথা কইলে না।

বিমল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গোমেজের পাশে গিয়ে বসল। তারপর বলল, "চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। তোমার বক্তব্য কি, বল।"

গোমেজ বললে, "আমার কোন বক্তব্য নেই। আমি কিছু বলব না।"

—"বলবে না ? তাহ'লে তোমার সাপ তোমাকেই কামড়াবে"

—"তুমি এখন জেনেছ যে, ওর মুখে বিষ আছে। ও সাপ এখন আমাকে কামড়ালে আমাকে হত্যা করার অপরাধে তুমিই ফাঁসি-কাঠে ঝুলবে।"

— "বেশ, তাহলে তোমাকে পুলিশের হাতেই সমর্পণ করব। বিচারে তোমার কি হবে, বুঝতে পারছ তো ?

গোমেজ হা হা ক'রে হেসে বললে, "বিচারে আইনের কূট-তর্কে আমি খালাস পেলেও পেতে পারি। আমি এখনো অপরাধ স্বীকার করি নি। আমার বিরুদ্ধে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। ঐ রূপোর সাপের বিষেই যে তিনটে লোক মারা পড়েছে, এ-কথা কোন আইনই জোর করে বলতে পারবে না।"

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে ব'সে ভাবতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "গোমেজ, তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি যে পাষণ্ড হত্যাকারী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আইনের কূট-তর্কে তুমি খালাস পেলেও আমি বিস্মিত হব না। যদিও তোমার বিরুদ্ধে আমি যে মামলা খাড়া করেছি, তার ফলে তুমি ফাঁসি-কাঠে মরবে ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তাতে আমার লাভ কি ? আমি পুলিশের লোক নই, তোমাকে ধরিয়ে না দিলেও কেউ আমাকে কিছু বলতে পারে না। তবে জেনে-শুনেও তোমার মতন পাপীকে একেবারে ছেড়ে দেওয়াও অপরাধ। অতএব, তোমার সঙ্গে আমি একটা মাঝামাঝি রফা করতে চাই।"

—"কি-রকম রফা শুনি ?"

—"তুমি কারুকে খুন করেছ কি না সেটা জানবার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমরা কেবল এইটুকুই জানতে চাই, মর্টন, মরিস আর ম্যাক্লিয়ড্ সেই অজ্ঞাত দ্বীপে গিয়ে কোন্ রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ? আর তাঁদের সেই আবিষ্কারের কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে ?"

গোমেজ উত্তেজিত স্বরে বললে, "সে দ্বীপে গিয়ে কেউ কোন রহস্যের

সন্ধান পায় নি। কোন আবিষ্কারের কথা আমি জানি না। এ-সব তোমার বাজে কল্পনা!"

—"শোনো গোমেজ! যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও, তাহলে তোমার উপরে আমি এইটুকু দয়া করতে পারি—তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। তারপর এক মিনিট কাল অপেক্ষা করে 'ফোনে' তোমার কথা পুলিশকে জানাব। ইতিমধ্যে তুমি পারো তো যেখানে খুশি অদৃশ্য হয়ে যেও, আমরা কেউ তোমাকে কোন বাধা দেব না।"

—"আমি কিছু জানি না।"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে, "গোমেজ তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাও? আমার আপত্তি নেই। আমি এখনি তোমার কথা পুলিশকে জানাচ্ছি।" এই ব'লে সে টেলিফোনের দিকে অগ্রসর হ'ল।

গোমেজ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর।"

বিমল দাঁড়িয়ে প'ড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমাকে আবার ভোলাবার চেষ্টা করলেই আমি পুলিশ ডাকব, পুলিশ তোমার পেট থেকে কথা বার করবার অনেক উপায়ই জানে।"

—"আমার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েও তুমি যদি আমাকে ছেড়ে না দাও?"

—"আমি ভদ্রলোক। আমার কথায় এখন বিশ্বাস করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই।"

—"বেশ, তাহ'লে আমার অদৃষ্টকেই পরীক্ষা করা যাক্। বাবু, এ-ভাবে আমার কথা কওয়ার সুবিধা হবে না, আমাকে তুলে বসিয়ে দাও।"

কুমার তাকে তুলে বসিয়ে দিলে। গোমেজ বলতে লাগল—

"বাবু, আমার বলবার কথা বেশি নেই। তবে আমি যেটুকু জেনেছি, তা সামান্য হ'লেও তোমরা মাঝে প'ড়ে বাধা না দিলে সেইটেই হয়তো অসামান্য হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু উপায় কি, আমার বরাত নিতান্তই মন্দ!

কেমন ক'রে আমাদের জাহাজ সেই দ্বীপে গিয়ে পড়ল এবং কেন আমরা সেই দ্বীপে গিয়ে নেমেছিলুম, এ-সব কথা খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই পাঠ করেছ। সুতরাং সে-সব কথা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করব না। দ্বীপের সেই অদ্ভুত পাথরের মূর্তিগুলোর কথাও তোমরা জানো, তাদের নিয়েও কিছু বলবার নেই। কারণ আমরাও তাদের ভালো ক'রে দেখবার সময় পাই নি।

সারাক্ষণই আমরা সেই আটজন হারা সঙ্গীকে খুঁজতেই ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু ঐটুকু একটা ন্যাড়া দ্বীপ তন্ন তন্ন ক'রে দেখেও আমরা একজন সঙ্গীকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, একসঙ্গে আট-আটজন মানুষ কেমন ক'রে অদৃশ্য হ'ল।

খুঁজতে বাকি ছিল কেবল পর্বত-দ্বীপের শিখরটা। মিঃ মর্টন, মিঃ মরিস্ ও ম্যাক্লিয়ড্ আমাদের কিছুক্ষণ আগেই শিখরের উপরদিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা তাঁদের অপেক্ষায় খানিকক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

পনেরো মিনিট কাটল, তবু তাঁদের দেখা নেই! তখন আমরাও উপরে উঠতে শুরু করলুম।

সকলের আগে উঠছিলুম আমিই। খানিক পরেই মিঃ মর্টনের গলা শুনতে পেলুম। তিনি সবিস্ময়ে বলছিলেন, "এ কি-রকম বর্শা! এর ডাণ্ডাটা যে সোনার ব'লে মনে হচ্ছে!"

তারপরেই মিঃ মর্টনকে দেখতে পেলুম। মিঃ মরিস্ আর মিঃ ম্যাক-লিয়ডের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর হাতে একটা সুদীর্ঘ বর্শা,—কেবল তার ফলাটা বোধ হয় ব্রোঞ্জের।

তাঁরা তিনজনেই আমাকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন! মিঃ মর্টন তাঁর হাতের বর্শাটা মাটির উপরে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "গোমেজ, তোমাদের আর কষ্ট ক'রে উপরে উঠতে হবে না, নাবিকদের কেউ এখানে নেই। চল, আমরাও নেমে যাই।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার হাতে ওটা কি দেখলুম যে?"

—"একটা ভাঙা পুরানো বর্শা! কবে কে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, কাজে লাগবে না ব'লে আমিও ফেলে দিলুম। চল!"

কিন্তু বর্শাটা যে ভাঙা নয়, সেটা আমি স্পষ্টই দেখেছিলুম, তার সুদীর্ঘ দণ্ড সূর্যের আলোতে পালিশ-করা সোনার মত চক্‌চকিয়ে উঠছিল! কিন্তু মিঃ মর্টন আমাদের উপরওয়ালা, কাজেই তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারলুম না, নিচে নামতে নামতে কৌতূহলী হয়ে ভাবতে লাগলুম, মিঃ মর্টন আমাকে উপরে উঠতে দিলেন না কেন, আর আমার সঙ্গে মিথ্যা কথাই বা কইলেন কেন?

জাহাজে ফিরে এলুম। কিন্তু মনের ভিতরে একটা বিষম কৌতূহল জেগে রইল। বেশ বুঝলুম, ওঁরা একটা এমন কিছু দেখেছেন যা আমার কাছে প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু কেন?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন ক'রেই হোক্ ভিতরের রহস্যটা জানতেই হবে। জাহাজের কারুর কাছেই কিছু ভাঙলুম না, কিন্তু সর্বক্ষণই ওঁদের গতিবিধির উপর রাখলুম জাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

পরদিনের সন্ধ্যাতেই সুযোগ মিলল। দূর থেকে দেখলুম, মিঃ মরিস্ ও মিঃ ম্যাক্‌লিয়ডকে নিয়ে মিঃ মর্টন নিজের কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

এদিকে-ওদিকে কেউ নেই দেখে আমি পা টিপে টিপে কামরার কাছে গিয়ে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শুনলুম মিঃ মরিস্ বলছেন, "ওটা সোনা না হ'তেও পারে!"

মিঃ মর্টন দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমি দিব্য গেলে বলতে পারি, বর্শার ডাণ্ডাটা সোনায় মোড়া না হয়ে যায় না! ঐ একটা ডাণ্ডায় যতটা সোনা আছে তার দাম হবে কয়েক হাজার টাকা।"

মিঃ ম্যাক্‌লিয়ড্ বললেন, "কিন্তু যদিই বা তাই হয়, তবে ঐ সোনার বর্শার সঙ্গে শিখরের সেই আশ্চর্য 'ব্রোঞ্জে'র দরজার আর আমাদের নাবিকদের অদৃশ্য হওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

মিঃ মর্টন বললেন, "আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যা স্থির করেছি শোন:—সেই সর্বোচ্চ শিখরের গায়ে আমরা একটা 'ব্রোঞ্জ্' ধাতুতে

গড়া বিরাট দরজা আবিষ্কার করেছি। সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন? নিশ্চয়ই তার ভিতরে ঘর বা অন্য কোথাও যাবার পথ আছে। সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করলে কারা? নিশ্চয়ই যারা ঝড়ের রাতে আলো জ্বেলে চলাফেরা করছিল তারাই। তারা যে কারা, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না। তবে ঐ স্বর্ণময় বর্শা দেখে অনুমান করা যায়, ওটা হচ্ছে তাদেরই অস্ত্র। খুব সম্ভব, তারা আমাদের আটজন নাবিককে আক্রমণ আর বন্দী করেছে। তারপর আমাদের সবাইকে দল বেঁধে দ্বীপের দিকে যেতে দেখে বন্দীদের নিয়ে তারা ঐ দরজার পিছনে অদৃশ্য হয়েছে। আর যাবার সময় তাড়াতাড়িতে বর্শাটা ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন ভেবে দেখ, সাধারণ বর্শা যাদের সুবর্ণময় তাদের কাছে সোনা কত সস্তা। দ্বীপে যখন পানীয় জল নেই, তখন ওখানে নিশ্চয়ই কেউ বেশিদিন বাস করে না। তবে সোনার বর্শা নিয়ে কারা ওখানে বিচরণ করে? হয়তো তারা অন্য কোন দ্বীপের আদিম বাসিন্দা, ঐ দ্বীপে তাদের প্রাচীন দেবতার ধন-ভাণ্ডার বা গুপ্তধন আছে, মাঝে মাঝে তারা তা পরিদর্শন করতে আসে। শুনেছি, দক্ষিণ আমেরিকার আদিম বাসিন্দারা দেবতাদের বিপুল ধনভাণ্ডার এমনি ক'রেই লুকিয়ে রাখত, আর তাদের কাছেও সোনা-রূপো ছিল এমনি সস্তা। হতভাগা কেলে-ভূত গোমেজটার জন্যে ভালো ক'রে কিছু দেখবার সময় পেলুম না, কিন্তু আমাদের আবার সেখানে যেতেই হবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ঐ দ্বীপে গেলে আমরা ধনকুবের হয়ে ফিরে আসব।"

তারপরেই মরিসের গলা পেলুম—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম কাদের পায়ের শব্দ, কারা যেন আমার দিকেই আসছে। কাজেই আমার আর কিছু শোনা হ'ল না, ধরা পড়বার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম!···বাবু, দ্বীপের আর কোন কথা আমি জানি না, এইবারে আমাকে ছেড়ে দাও।"

গোমেজের কথা শুনে বিমল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল।

তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আচ্ছা গোমেজ, তুমিও বলছ দ্বীপে জল নেই?"

—"না, সে দ্বীপ মরুভূমির চেয়েও শুকনো।"

—"তোমাদের জাহাজ ছাড়া সেখানে আর কোন জাহাজ বা নৌকা দেখেছিলে ?"

—"না।"

—"তাহ'লে মিঃ মর্টনের অনুমান সত্য নয়। অন্য কোন দ্বীপের আদিম বাসিন্দারা সেই দ্বীপে এলে তোমরা তাদের জাহাজ বা নৌকা দেখতে পেতে ?"

গোমেজ একটু ভেবে বললে, "হয়তো আগের রাত্রে ঝড়ে তাদের জাহাজ বা নৌকাগুলো দ্বীপ থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।"

—"হ্যাঁ, তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।"

—"আর কেন, আমাকে মুক্তি দাও।"

—"রোসো, গোমেজ, রোসো। তুমি তো এখনি পাখির মতন উড়ে পালাবে,—তারপর ? আমাদের দ্বীপে যাবার পথ বাতলে দেবে কে ?"

গোমেজ উৎসাহিত হয়ে বললে, "পথ বাতলাবার জন্যে তোমরা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও নাকি ?"

—"পাগল। তোমার মতন মূর্তিমান্ 'ব্ল্যাক্ স্নেক'কে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব? Longitude আর Latitude-সুদ্ধ একখানা নক্সা আমাকে এঁকে দাও।"

গোমেজ হতাশভাবে বললে, "সে সব আমার পকেট-বুকেই তোমরা পাবে।"

কুমারের হাত থেকে গোমেজের পকেট-বুকখানা নিয়ে বিমল আগে সেখানা পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল হ'ল সন্তোষজনক। তখন সে গোমেজের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, "পালাও শয়তান, পালাও। মনে রেখ, এক মিনিট পরেই আমি পুলিশকে তোমার কথা জানাব।"

বিমলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই গোমেজ ঝড়ের মতন বেগে ঘরের বাহিরে চ'লে গেল!

বিমল ঘড়ি ধরে ঠিক এক মিনিট অপেক্ষা করলে। তারপর 'ফোন'

ধ'রে বললে, "হ্যালো, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড? হ্যাঁ, শুনুন! আমি বিমল! মর্টন, মরিস্ আর ম্যাক্লিয়ড্কে খুন করেছে 'বোহিমিয়া'র কোয়ার্টার-মাস্টার বার্তোলোমিও গোমেজ! সে একমিনিট আগে আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েছে! প্রমাণ? হ্যাঁ, সব প্রমাণই আমার কাছে আছে—এখানে এলেই সমস্ত পাবেন। গোমেজের অপরাধ সম্বন্ধে একতিল সন্দেহ নেই, শীঘ্র তাকে ধরবার ব্যবস্থা করুন। কি বললেন? পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই লণ্ডনের পথে পথে পুলিশের জাল বিস্তৃত হবে? ডানা থাকলেও ওড়বার সময় পাবে না? আশ্চর্য আপনাদের তৎপরতা। আচ্ছা, বিদায়।"

ফোন ছেড়েই বিমল ফিরে বললে, 'ব্যাস, এখানকার কাজে ইতি। ডাকো কুমার, ডাকো রামহরিকে। বাঁধো সব জিনিস-পত্তর। আমরা আজকেই জাহাজে চড়ব।'

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, তোমরা হ'চ্ছ একে বয়সে যুবা, তার উপরে বিষম ডান্পিটে। কিন্তু দ্বীপে যাবার আগে আরও কিছু চিন্তা করা উচিত—এই হচ্ছে আমার মত।"

বিমল বললে, "আয়োজন ক'রে সর্বদাই চিন্তা করতে বসলে কাজ করবার কোন ফাঁকই পাওয়া যায় না। যখন চিন্তা করবার সময়, তখন আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি, যার ফলে এত শীঘ্র 'ব্ল্যাক্ স্নেকে'র রূপকথা বাস্তব উপন্যাসে পরিণত হল। এখন এসেছে কাজ করবার সময়—চুলোয় যাক এখন ভাবনা-চিন্তা।"

কুমার বললে, "এখন আমরা হচ্ছি সেই আরব বেদুইনের মত, রবীন্দ্রনাথ যাদের স্বপ্ন দেখেছেন! এখন আমাদের চারিদিকে 'শূন্যতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন', আর আমাদের মানস-তুরঙ্গ তারই উপর দিয়ে পদাঘাতে বালুকার মেঘ উড়িয়ে ছুটে চলেছে সুদূর বিপদের কোলে বিপুল আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।"

কমল করতালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ডাক দাও এখন ভূমিকম্পকে, ধ'রে আনো উন্মত্ত ঝটিকাকে, জাগিয়ে তোলো ভিসুভিয়াস-এর অগ্নি-উৎসবকে।"

বাঘাও লাফ মেরে টেবিলে চ'ড়ে ও ল্যাজ নেড়ে উঁচু মুখে বললে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

বিনয়বাবু ভয়ে ভয়ে রামহরির কাছে গিয়ে বললেন, "সব কাকেরই এক ডাক। এস রামহরি, আমরা ও-ঘরে গিয়ে একটু পরামর্শ করিগে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাহাজ দ্বীপে লাগল

আবার সেই অসীম নীলিমার জগতে। নীলিমার জগৎ—সূর্যালোকের অনন্ত ঐশ্বর্য চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, দিনের বেলার ছায়া এখানে কোথাও ঠাঁই পায় না। যেদিকে তাকানো যায় কেবল চোখে পড়ে দিগন্তে নিলীন নীল আকাশ আর নীল সাগর পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছে গভীর প্রেমে।

এত নীল জল এমন অশ্রান্ত বেগে কোথায় ছুটে যায় এবং ফিরে আসে কেউ তা জানে না। শূন্যে হচ্ছে স্থিরতার রাজ্য, মাটি হচ্ছে স্থিরতার রাজ্য, কিন্তু সমুদ্র কোনদিন স্থির হ'তে শেখেনি, তার একমাত্র মহামন্ত্র হচ্ছে—ছুটে চল, ছুটে চল, ছুটে চল!

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর প্রথম রাত্রি থেকে চাঁদ উঠে আসছে, জ্ঞানোদয়ের প্রথম দিন থেকে মানুষ চাঁদ-ওঠা দেখে আসছে, কিন্তু চাঁদের মুখ কখনো পুরানো বা একঘেঁয়ে মনে হ'ল না। যে সত্যিকার সুন্দর, সে হয় চিরসুন্দর!

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছে। জাহাজের ডেকে চেয়ারের উপরে বিনয়বাবুকে ঘিরে ব'সেছিল বিমল, কুমার ও কমল।

সমুদ্রের অনন্ত জলে জ্যোৎস্না যেন দেয়ালী-খেলা খেলছিল লক্ষ লক্ষ ফুলঝুরি নিয়ে এবং সাগরের ধ্বনিকে মনে হচ্ছিল সেই কৌতুকময়ী

জ্যোৎস্নারই কলহাস্য।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, পৃথিবীর জন্ম থেকেই সমুদ্র এ কী গান ধরেছে, এতদিনেও যা ফুরিয়ে গেল না!"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না কুমার, পৃথিবী যখন জন্মায় তখন সে সমুদ্রের গান শোনে নি।"

বিমল কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু, আপনি হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক, এ-সব বিষয়ে আপনার জ্ঞান অসাধারণ। সদ্যোজাত পৃথিবীর প্রথম গল্প আপনার কাছে শুনতে চাই।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করি, শোন।...কোটি কোটি বৎসর আগেকার কথা। মহাশূন্যে তখন আর কোন গ্রহ উপগ্রহ বা তারকা ছিল না, আমাদের মাথার উপরকার ঐ চাঁদ ছিল না, আমাদের এই জননী পৃথিবীও ছিল না। ছিল কেবল জ্বলন্ত, ঘূর্ণায়মান সুভীষণ সূর্য। তখন সে জ্বলত বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডের মত, তখন তার আকার ছিল আরো বৃহৎ, আর তখন সে ঘুরত আরো-বেশি জোরে— তেমন দ্রুতগতির ধারণাও আমরা করতে পারব না।

খুব জোরে একটা বড় আগুন নিয়ে ঘোরালে দেখবে, চারিদিকে টুক্‌রো টুক্‌রো আগুন ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। সূর্যের ঘুরুনির চোটেও মাঝে মাঝে তার কতক কতক অংশ এই ভাবে শূন্যে ঠিক্‌রে পড়েছে, আর সেই এক-একটা খণ্ডাংশ হয়েছে এক-একটা গ্রহ। আমাদের পৃথিবী হ'চ্ছে তারই একটি।

প্রত্যেক গ্রহও ঘোরে। পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে একদিন দু'ভাগ হয়ে গেল। তারই বড় অংশে অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন আমরা বাস করি, আর ছোট অংশটাকে আমরা আজ চাঁদ ব'লে ডাকি। এই পৃথিবী, আর ঐ চাঁদও আগে এখনকার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ঘুরতে পারত।

সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অনেক লক্ষ বৎসর পর পর্যন্ত পৃথিবীও ছিল জ্বলন্ত। তখন তার মধ্যে কোন জীব বাস করতে পারত না। তখনকার দিন-রাতও ছিল এখনকার চেয়ে ঢের ছোট। সূর্য আর পৃথিবীর ঘূর্ণির

বেগ ক্রমেই ক'মে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে দিন-রাতও ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। সুদূর ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসবে, যখন সূর্যও ঘুরবে না, পৃথিবীও ঘুরবে না—দিনও থাকবে না রাতও থাকবে না।

অতীতের সেই পৃথিবীর কথা কল্পনা কর। আবহাওয়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ঘন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ প্রায়ই সূর্যকে অস্পষ্ট ক'রে তোলে, ঘন ঘন বিশ্বব্যাপী ঝটিকায় চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে যায়, মাটির গা একেবারে আদুড়—সবুজের আঁচ পর্যন্ত ফোটে না, প্রায় দিবারাত্র ধ'রে অশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে।

পৃথিবীর আদিম যুগে সমুদ্রের জন্মই হয় নি, সেই আগুনের মতন গরম পাথুরে পৃথিবীতে জল থাকতে পারত না। জলের বদলে তখন ছিল কেবল বাতাস-মেশানো বাষ্প। খুব গরম কড়ায় খুব অল্প জল ছিটোলে দেখবে, তা তখনি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। শূন্যে তখন যে পুরু মেঘ জ'মে থাকত, তা থেকে তপ্ত বৃষ্টি ঝ'রে পড়ত আগুনের মত গরম পাথুরে পৃথিবীর উপরে, তারপর আবার তা বাষ্প হয়ে শূন্যে উঠে যেত। সেদিনকার পৃথিবীকে অনায়াসেই একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ডরূপে কল্পনা করতে পারো।

ক্রমে পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, তখন গরম আবহাওয়ার বাষ্প পৃথিবীর উপরে নেমে এসে তপ্ত নদীর সৃষ্টি করলে। যেখানে সুবৃহৎ গর্ত ছিল সেখানে জমা হয়ে জলরাশি ধরলে সমুদ্রের আকার। তারপর জল ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে দেখা দিলে জীবনের প্রথম আভাস।

আজ এই জলের ভিতরে বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে অধিকাংশ ডাঙার জীবরাই মারা পড়ে। কিন্তু আদিম কালে জীবনের প্রথম উৎপত্তি হয় এই জলের ভিতরেই বা সমুদ্র-জলসিক্ত স্থানেই। তারপর কত জীব জল ছেড়ে ডাঙার জীব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ ডাঙা থেকে আবার শূন্যে উড়তে শিখেছে, এমন কি কেউ কেউ মাটিকে ছেড়ে পুনর্বার সমুদ্রে ফিরে গিয়েছে, আজ আর তাদের ইতিহাস দেবার সময় হবে না।"

কুমার বললে, "আশ্চর্য এই পৃথিবীর জন্মকাহিনী, উপন্যাসও এমন বিস্ময়কর নয়! আচ্ছা বিনয়বাবু, তাহ'লে কি ভবিষ্যতে পৃথিবী আরো

ঠাণ্ডা হ'লে সমুদ্রের জলও আরো বেড়ে উঠবে?"

বিনয়বাবু বললেন, "তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

এমন ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় গল্পগুজব ক'রে তারা সমুদ্র-যাত্রার একঘেয়েমি নিবারণ করে।

জাহাজে গল্প-বলার ভার নিয়েছিলেন বিনয়বাবু। বিমল প্রভৃতির আবদারে কোন দিন তিনি বলতেন আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের গল্প, কোনদিন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, কোনদিন বা সমুদ্র-তলের রহস্যময় কাহিনী। এই অতল জল-সমুদ্রের উপরে ব'সে বিনয়বাবুর অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিয়ে বিমলরা নিত্য-নবরত্ন আহরণ করেছে।

একদিন বৈকালে 'চার্ট' দেখে বিমল বললে, "আমাদের জাহাজ কেনারী দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে পড়েছে। গোমেজের পকেট-বুকের কথা মানলে বলতে হয়, আমরা কালকেই সেই অজানা দ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি।"

কুমার মহা উৎসাহে বললে, "তা'হলে আজ রাত্রে আমার ভালো ক'রে ঘুম হবে না দেখছি।"

সাগরে জলের অভাব নেই, তবু হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে আকাশ ঘন মেঘ জমিয়ে জলের উপর জল ঢালতে লাগল। রামহরি তাড়াতাড়ি জাহাজের পাচকের কাছে ছুটল খিচুড়ীর ব্যবস্থা করতে। কমল বসল দ্বিতীয়বার চায়ের জল চড়াতে। এবং কুমার আবদার ধরলে, "বিনয়বাবু, আজ আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প নয়, আজ একটা ভূতের গল্প বলুন।"

বিমল বললে, "কিন্তু এই সামুদ্রিক বাদলায় সামুদ্রিক ভূত না হ'লে জমবে না।"

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, "বেশ, তাই সই। আমি একটা ভূতের বিলিতী কাহিনী পড়েছিলুম। সেইটেই সংক্ষেপে তোমাদের বলব—কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের নাম বদলে :—

ধ'রে নাও, গল্পের নায়ক হচ্ছি আমি। এবং জাহাজে চ'ড়ে যাচ্ছি কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী।

জাহাজে উঠে 'বয়'কে বললুম, "আমার মোটঘাট সতেরো নম্বর কামরায় নিয়ে চল। আমি নিচের বিছানায় থাকব।"

বয় চম্‌কে উঠল। বাধো বাধো গলায় বললে, "স-তে-রো নম্বর কামরা?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি চম্‌কে উঠলে কেন?"

—"না হুজুর, চম্‌কে উঠিনি। এই দিকে আসুন।"

সতেরো নম্বর কামরায় গিয়ে ঢুকলুম। এ-সব জাহাজের প্রথম শ্রেণীর কামরা সাধারণত যে-রকম হয়, এটিও তেমনি। উপরে একটি ও নিচে একটি বিছানা। আমি নিচের বিছানা দখল করলুম।

খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভিতরে আর একজন লোক এসে ঢুকল। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, সে আমার সহযাত্রী হবে। অতিরিক্ত লম্বা ও অতিরিক্ত রোগা দেহ, টাক-পড়া মাথা, ঝুলে-পড়া গোঁফ। জাতে ফিরিঙ্গি।

তাকে পছন্দ হ'ল না। যে খুব রোগা আর খুব লম্বা, যার মাথায় টাক-পড়া আর গোঁফ ঝুলে-পড়া, তাকে আমার পছন্দ হয় না। আমি ব'লে একটা মনুষ্য যে এই কামরায় হাজির আছি, সেটা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। টপ্‌ ক'রে লাফ মেরে সে একেবারে উপরের বিছানায় গিয়ে উঠল। স্থির করলুম, এ-রকম লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই ভালো।

সেও বোধহয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আমার মতন নেটিভের সঙ্গে কথাবার্তা কইবে না। কারণ সন্ধ্যার পরে একটিমাত্র বাক্য-ব্যয় না ক'রেই সে 'রাগ্‌' মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমিও দিলুম লেপ মুড়ি। এবং ঘুম আসতেও দেরি লাগল না।

কতক্ষণ পরে জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেন ঘুম ভাঙল তাই ভাবছি, এমন সময়ে উপরের সাহেব দড়াম্‌ ক'রে নিচে লাফিয়ে পড়ল! অন্ধকারে শব্দ শুনে বুঝলুম, সে কামরার দরজা খুলে দ্রুত-পদে বাইরে ছুটে গেল। ঠিক মনে হ'ল, যেন কেউ তাকে তাড়া করেছে।

তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝলুম না। কিন্তু এটা অনুভব

করলুম যে, আমার কামরার মধ্যে দুর্দান্ত শীতের হাওয়া হু-হু ক'রে প্রবেশ করছে! আর, কি-রকম একটা পচা জলের দুর্গন্ধে সমস্ত কামরা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

উঠলুম। ইলেক্‌টিক্ টর্চটা বার ক'রে জ্বেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখলুম, জাহাজের পাশের দিকে কামরায় আলো-হাওয়া আসবার জন্যে যে 'পোর্ট-হোল্' থাকে, সেটা খোলা রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়েই হু-হু ক'রে জোলো-হাওয়া আস্‌ছে!

তখনি পোর্ট-হোল্ বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, আমার উপরকার বিছানার যাত্রীটির নাক ডেকে উঠল সশব্দে!

আশ্চর্য! সশব্দে লাফিয়ে প'ড়ে বাইরে ছুটে গিয়ে আবার কখন্ সে নিঃশব্দে ফিরে এসে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে? লোকটা পাগল-টাগল নয় তো?

আর সেই বদ্ধ, পচা জলের দুর্গন্ধ। সে কি অসহনীয়! এ কামরাটা নিশ্চয়ই খুব-বেশি স্যাঁৎসেতে! কালকেই কাপ্তেনের কাছে অভিযোগ করতে হবে……আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে ঘুম ভাঙবার পরেই সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করলুম যে, খোলা পোর্ট-হোলের ভিতর দিয়ে আবার হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে!

নিশ্চয় ঐ সাহেবটার কাজ! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো।

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কাম্‌রার মধ্যে সেই বদ্ধ, পচা জলের দুর্গন্ধ আর পাওয়া যাচ্ছে না!

আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রভাতের সূর্যালোক আর স্নিগ্ধ বাতাস ভারি মিষ্ট লাগল।

ডেকের উপরে পায়চারি করতে করতে জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁকে আমি অল্পবিস্তর চিনতুম।

ডাক্তার আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সতেরো নম্বর কামরা নিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"কালকের রাত কেমন কাটল ?"

—"মন্দ নয়। কেবল এক পাগল সায়েব কিছু জ্বালাতন করেছে।"

—"কি-রকম ?"

—"সে মাঝরাতে লাফালাফি ক'রে পরের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, ঢুপ্-ঢুপিয়ে বাইরে ছুটে যায়, কিন্তু পরে পা টিপে টিপে এসে কখন্ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে পোর্ট-হোল্ খুলে দেওয়াও তার আর এক বদ্-অভ্যাস !"

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বললেন, "কিন্তু ও-কামরার পোর্ট-হোল্ রাত্রে কেউ বন্ধ ক'রে রাখতে পারে না !"

—"তার মানে !"

—"তার মানে কি, আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি, ঐ কামরায় যারা যাত্রী হয়, তারা প্রায়ই সমুদ্রে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করে !"

—"আপনি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছেন ?"

—"মোটেই নয়। আমার উপদেশ, ও-কামরা ছেড়ে দিয়ে আপনি আমার কামরায় আসুন।"

—"এত সহজে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। আমি কামরা ছাড়বার কোন কারণ দেখছি না।"

—"যা ভালো বোঝেন করুন"—এই ব'লে ডাক্তার চ'লে গেলেন।

একটু পরেই 'বয়' এসে জানালে, কাপ্তেন-সাহেব আমাকে জরুরি সেলাম দিয়েছেন।

কাপ্তেনের কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবু, আপনার কামরার সাহেবের কোন খবর রাখেন ?"

—"কেন বলুন দেখি ?"

—"সারা জাহাজ খুঁজেও তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"পাওয়া যাচ্ছে না ? কাল রাত্রে তিনি একবার বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তারপর আবার তাঁর নাক-ডাকা শুনেছি তো !"

—"আপনি ভুল শুনেছেন! কামরার ভিতরে বা বাইরে তাঁর কোন চিহ্নই নেই!"

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। তারপর বললুম, "শুনছি সতেরো নম্বর কামরার যাত্রীরা নাকি প্রায়ই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে?"

কাপ্তেন থতমত খেয়ে বললেন, "একথা আপনিও শুনেছেন? দোহাই আপনার, যা শুনেছেন তা আর কারুর কাছে বলবেন না, কারণ তাহ'লে এ-জাহাজের সর্বনাশ হবে! আপনি বরং এক কাজ করুন। এ-যাত্রা আমার কামরাতেই আপনার মোটঘাট নিয়ে আসুন। সতেরো নম্বরে আজই আমি তালা লাগিয়ে দিচ্ছি!"

—"অকারণে আমার কামরা আমি ছাড়তে রাজি নই। আপনাদের কুসংস্কার আমি মানি না।"

কাপ্তেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমারও বিশ্বাস, এ-সব কুসংস্কার। আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি নিজে আপনার কামরায় গিয়ে পাহারা দেব। তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

—"না।"

সন্ধ্যার পর কাপ্তেন আমার কামরার মধ্যে এসে ঢুকলেন।

সে-রাত্রে কামরার আলো নেবানো হ'ল না। দরজা বন্ধ ক'রে কাপ্তেন আমার সুটকেশটা টেনে নিয়ে তার উপরে চেপে ব'সে বললেন, "এই আমি জমি নিলুম! এখন আমাকে ঠেলে না সরিয়ে এখান দিয়ে কেউ যেতে আসতে পারবে না। চারিদিক বন্ধ। একটা মাছি কি মশা ঢোকবারও পথ নেই!"

—"কিন্তু আমি শুনেছি, ঐ পোর্ট-হোল্‌টা রাত্রে কেউ নাকি বন্ধ ক'রে রাখতে পারে না!"
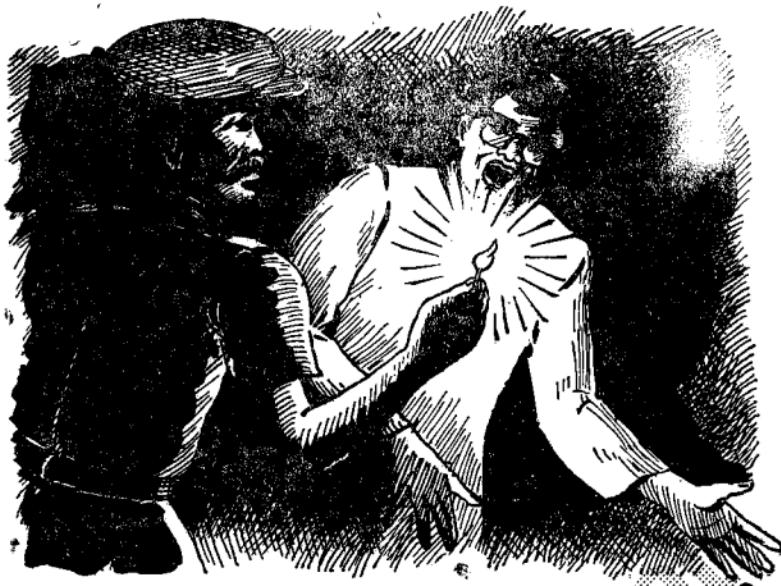
"ঐ তো ওটা ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে!"—বলতে বলতেই কাপ্তেন-এর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল এবং তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে আমিও তাকিয়ে দেখলুম, কামরার পোর্ট-হোলটা ধীরে ধীরে আপনিই খুলে যাচ্ছে!

আমরা দুজনেই লাফ মেরে সেখানে গিয়ে পোর্ট-হোলের আবরণ চেপে ধরলুম—কিন্তু তবু সেটা সজোরে খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামরার আলো নিবে গেল দপ্ ক'রে!

হু হু ক'রে একটা তীক্ষ্ণ বরফ-মাখা বাতাসের ঝাপ্‌টা ভিতরে ছুটে এল এবং তারপরেই নাকে ঢুকল তীব্র, বদ্ধ, পচা জলের বিষম দুর্গন্ধ!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "আলো, আলো!"

কাপ্তেন টপ্ ক'রে দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি জ্বেলে ফেললেন।

বিদ্যুৎবেগে ফিরে উপরের বিছানার দিকে তাকিয়ে সভয়ে দেখলুম, সেখানে একটা মূর্তি সটান্ শুয়ে রয়েছে!

পাগলের মতন একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়লুম,—কিন্তু কিসের উপরে? বহুকাল আগে জলে-ডোবা একটা ভিজে ঠাণ্ডা মৃতদেহ, তার সর্বাঙ্গ মাছের মতন পিচ্ছিল, তার মাথায় লম্বা লম্বা জল-মাখা রুক্ষ চুল এবং তার মৃত চোখদুটোর আড়ষ্ট দৃষ্টি আমার দিকে স্থির! আমি তাকে স্পর্শ করবামাত্র সে উঠে বসল এবং পর-মুহূর্তেই একটা মত্তহস্তী যেন ভীষণ

এক ধাক্কা মেরে আমাকে মেঝের উপর ফেলে দিলে,—তারপরই কাপ্তেনও আর্তনাদ ক'রে আমার উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

মিনিট-দুয়েক পরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখা গেল, উপরের বিছানা খালি, ঘরের ভিতরেও কেউ নেই এবং কামরার দরজা খোলা!

পরদিনেই সতেরো নম্বর কামরার দরজা পেরেক মেরে একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। আমার কথাও ফুরুলো।

রামহরি কখন ফিরে এসে কোনে বসে একমনে গল্প শুনছিল। সে সভয়ে ব'লে উঠল, "ওরে বাবা! সুমুদ্দরে কত লোক ডুবে মরে, সবাই যদি ভূত হয়ে মানুষের বিছানায় শুতে চায়, তাহলে তো আর রক্ষে নেই! আমি বাপু আজ রাত্রে একলা শুতে পারব না!"

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল, এইবারে খিচুড়ীর সন্ধানে যাত্রা করা যাক!"

বিমলের আন্দাজই সত্য হ'ল। পরদিন খুব ভোরেই দেখা গেল, দূরে সমুদ্রের নীলজলের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যে দ্বীপটি তাকে দ্বীপ না ব'লে পাহাড় বলাই ঠিক।

দূরবীনে নজরে পড়ল, নৈবেদ্যের চূড়া-সন্দেশের মত একটি পর্বত যেন সামুদ্রিক নীলিমাকে ফুটো ক'রে মাথা তুলে আকাশের নীলিমাকে 'ধরবার জন্যে উপরদিকে উঠে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সেই পর্বতের অধিকাংশ লুকিয়ে আছে মহাসাগরের সজল বুকের ভিতরে।

তার শিখর-দেশটা একেবারে খাড়া, কিন্তু নিচের দিকটা ঢালু। এবং সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বিরাট প্রস্তর-মূর্তি। অনেক মূর্তির পদতলের উপরে বিপুল জলধির প্রকাণ্ড তরঙ্গদল রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেনদন্তমালা বিকাশ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারংবার!

সমস্ত পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া—বড় বড় গাছপালা তো দূরের কথা, ছোটখাটো ঝোপঝাড়েরও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যেমন সবুজ রঙের

অভাব—তেমনি অভাব জীবন্ত গতির। কোথাও একটিমাত্র পাখিও উড়ছে না।"

বিনয়বাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, "এ হচ্ছে মৃত্যুর দেশ!"

রামহরি বললে, "যারা জলে ডুবে মরে, তারা রোজ রাতে ঘুমোবার জন্যে ঐখানে গিয়ে ওঠে।"

কুমার বললে, "এই মৃত্যুর দেশেই এইবারে আমরা জীবন সঞ্চার করব। যদি এখানে মৃত্যুদূত থাকে, আমাদের বন্দুকের গর্জনে এখনি তার নিদ্রাভঙ্গ হবে।"

বিমল বললে, "যাও কমল, সেপাইদের প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে বল। এইবারে হয়তো তাদের দরকার হবে।"

কমল খবর দিতে ছুটল। খানিক পরেই ডেকের উপরে চারজন ক'রে সার বেঁধে দাঁড়াল শিখ, গুর্খা ও পাঠান সেপাইরা। তাদের চব্বিশটা বন্দুকের বেওনেটের উপরে সূর্যকিরণ চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগল।

বিমল হেসে বললে, "বিনয়বাবু, ওদের আছে চব্বিশটা বন্দুক আর আমাদের কাছে আছে পাঁচটা বন্দুক, চারটে রিভলভার। তবু কি আমরা দ্বীপ জয় করতে পারব না?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অষ্ট নরমুণ্ড

বোটে চড়ে বিমল সঙ্গীদের ও সেপাইদের নিয়ে দ্বীপে গিয়ে উঠল। জাহাজে রইল কেবল নাবিকরা।

কী ভয়াবহ নির্জন দ্বীপ! সূর্যের সোনালী হাসি যেন তার কালো কর্কশ পাথুরে গায়ে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গর্ভের মধ্যে! নানা আকারের বড় বড় পাথরগুলো চারিদিক থেকে

যেন কঠিন ভ্রূকুটি ক'রে ভয় দেখাচ্ছে! যেদিকে তাকানো যায়, ভৌতিক ছমছমে ভাব ও তৃষ্ণাভরা নির্জীব শুষ্কতা!

এরই মধ্যে দিকে দিকে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরের দানব-রক্ষীর মতন প্রস্তর-মূর্তির পর প্রস্তর-মূর্তি! একসঙ্গে এতগুলো এত-উঁচু পাথরের মূর্তি বোধহয় আধুনিক পৃথিবীর কোন মানুষ কখনো চোখে দেখে নি, কারণ তাদের অধিকাংশই কলকাতার অক্টারলনি মনুমেন্টের মতন উঁচু এবং কোন কোনটা তাদেরও ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠেছে। মূর্তি-গুলোর পায়ের কাছে দাঁড়ালে তাদের মুখ আর দেখা যায় না। পাহাড় কেটে প্রত্যেক মূর্তিকে খুদে বার করা হয়েছে!

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মূর্তির আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বিমল বললে, "এই এক-একটা মূর্তি গড়তে শিল্পীদের নিশ্চয়ই পনেরো-বিশ বছরের কম লাগেনি। সব মূর্তি গড়তে হয়তো এক শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছিল! এইটুকু একটা জলশূন্য দ্বীপে এতকাল ধ'রে এত যত্ন আর কষ্ট ক'রে এই মূর্তিগুলো গড়বার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না!"

কুমার বললে, "হয়তো মর্টন সাহেবেরই অনুমান সত্য! হয়তো এটা কোন জাতির দেবতার দ্বীপ! হয়তো যাদের দেবতা তারা এখানে মাঝে মাঝে কেবল ঠাকুর পূজা করতে আসে!"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এ মূর্তিগুলো কোন জাতির দেবতার মূর্তি হ'তে পারে, কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় কথা তোমরা ভুলে যেও না। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের 'চার্ট' সাহেবরা তৈরি ক'রে ফেলেছে। কিন্তু কোন 'চার্টে'ই এই দ্বীপের উল্লেখ নেই। তার অর্থ হচ্ছে, এই দ্বীপটাকে এতদিন কেউ সমুদ্রের উপরে দেখে নি। মূর্তিগুলোর গায়ে তাজা শেওলার চিহ্ন দেখছ? ঐ শেওলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিছুদিন আগেও ওরা জলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে ছিল। এখন ভেবে দেখ, জলের তলায় ডুব মেরে কোন মানুষ-শিল্পীই কি এমন বড় মূর্তি গড়তে পারে?"

রামহরি বললে, "সমুদ্রের জলে যে-সব কারিকর ডুবে মরেছে, এ

মূর্তিগুলো গড়েছে তাদেরই প্রেতাত্মা।”

কমল বললে, “ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে!”

বিমল বললে, “যে দ্বীপ জলের তলায় অদৃশ্য, সেখানে কেউ পূজা করতে আসবেই বা কেন?”

কুমার বললে, “কিন্তু মর্টন সাহেব এখানে কাদের হাতের আলো দেখেছিলেন? কাদের সোনার বর্শা তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন? দ্বীপের শিখরের কাছে সেই ব্রোঞ্জের দরজাই বা কে তৈরি করেছে?”

বিনয়বাবু বললেন, দ্বীপটা ভালো ক'রে দেখবার পর হয়তো আমরা ও-সব প্রশ্নের সদুত্তর পাব। কিন্তু আপাতত দেখছি, কোন মূর্তির কোথাও কোন শিলালিপি বা সাঙ্কেতিক ভাষা খোদাই করাও নেই। ওসব থাকলেও একটা হদিস্ পাওয়া যেত। কিন্তু মূর্তিগুলোর মুখের ভাব দেখেছ? প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ, চীন, আসিরিয়া, বাবিলন আর গ্রীস দেশের ইতিহাস-পূর্ব যুগের শিল্পীরা আপন আপন জাতির মুখের আদর্শ ই মূর্তিতে ফুটিয়েছে। সুতরাং ধরতে হবে এখানকার শিল্পীরাও স্বজাতির মুখের আদর্শ রেখেই এ-সব মূর্তি গড়েছে। কিন্তু সে কোন্ জাতি? আধুনিক কোন দেশেই মানুষের মুখের ভাব এমন ভয়ানক হয় না। এদের মুখের ভাব কি-রকম হিংস্র পশুর মত, যেন এরা দয়া-মায়া কাকে বলে জানে না। বিমল, কুমার! তোমরা প্রাচীন যুগের কিছু কিছু ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছ? প্রাচীন যুগটাই ছিল নির্দয়তার যুগ। বাবিলন, আসিরিয়া আর মিশর প্রভৃতি দেশের ইতিহাসই হ'চ্ছে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। তাদের ঢের পরে জন্মেও রোম দয়ালু হ'তে পারে নি। খ্রীস্টকে সে ক্রুশে বিঁধে হত্যা করেছিল, বিরাট একটা সভ্যতার জন্মভূমি কার্থেজের সমস্ত মানুষকে দেশসুদ্ধ পৃথিবী থেকে লুপ্ত ক'রে দিয়েছিল। সে যুগের নির্দয়তার লক্ষ লক্ষ কাহিনী শুনলে আধুনিক সভ্যতার হৃৎপিণ্ড মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দ্বীপবাসী মূর্তিগুলোর মুখ অধিকতর নৃশংস। তার একমাত্র কারণ এই হ'তে পারে, যে-পাশবিক সভ্যতা এখানকার মূর্তিগুলো সৃষ্টি করেছে, তার জন্ম হয়তো মিশরেরও অনেক হাজার বছর

আগে—সামাজিক বন্ধন, নীতির শাসন ছিল যখন শিথিল, মানুষ ছিল যখন প্রায় হিংস্র জন্তুরই নামান্তর। ভগবান জানেন, আমরা কাদের প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি!"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনার কথাই সত্য বলে মনে হচ্ছে। মূর্তিগুলোর পোশাক দেখুন। এমন সামান্য পোশাক মানুষ সেই যুগেই পরত, যে-যুগে সবে সে কাপড়-চোপড় পরতে শিখেছে।"

এ-সব আলোচনা রামহরির মাথায় ঢুকছিল না, সে বাঘাকে নিয়ে কিছুদূরে এগিয়ে গেল। এক-জায়গায় প্রায় দুশো ফুট উঁচু একটা মূর্তি ছিল,—তার পদতলে একটা পাথরের বেদী, সেটাও উচ্চতায় দশ-বারো ফুটের কম হবে না। বেদীর গা বেয়ে উঠেছে সিঁড়ির মতন কয়েকটা ধাপ।

এ মূর্তিটা আবার একেবারে বীভৎস। চোখদুটো চাকার মতন গোল, নাসারন্ধ্র স্ফীত, জন্তুর মতন দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে এবং দুই ঠোঁটের দুই কোণে ঝুলছে আধাআধি গিলে-ফেলা দুটো মানুষের মূর্তি!

এই মানুষ-খেকো দেবতা ও দানবের মূর্তি দেখে রামহরির পিলে চম্‌কে গেল।

এমন সময়ে বাঘার চীৎকার শুনে রামহরি চোখ নামিয়ে দেখলে, ইতিমধ্যে সে ধাপ দিয়ে বেদীর উপর উঠে পড়েছে এবং সেখানে কি দেখে মহা ঘেউ ঘেউ রব তুলেছে।

ব্যাপার কি দেখবার জন্যে রামহরিও কৌতূহলী হয়ে সেই বেদীর উপরে গিয়ে উঠল এবং তারপরেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানে ব'সে পড়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল—"ওরে বাবা রে, গেছি রে। এ কি কাণ্ড রে।"

চিৎকার শুনে সবাই সেখানে ছুটে এল। বেদীর উপরে উঠে প্রত্যেকেই স্তম্ভিত!

বেদীর উপরে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে কতকগুলো মানুষের মুণ্ডু! মানুষের মাথা কেটে কারা সেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মাংস ও চামড়া পচে হাড় থেকে খসে পড়েনি। সেই পাথুরে

দেশে প্রখর সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে সেগুলো মিশরের মমির মতন দেখতে হয়েছে।

বিমল গুনলে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট।"

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, "এখানে আটজন নাবিকই হারিয়ে গিয়েছিল!"

বিমল দুঃখিত স্বরে বললে, "এগুলো সেই বেচারাদেরই শেষ-চিহ্ন।" কুমার, এই রাক্ষুসে দেবতাদের পায়ের তলায় কারা নরবলি দিয়েছে! তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, এই দ্বীপে এমন সব শত্রু আছে যাদের হাতে পড়লে আমাদেরও এমনি দশাই হবে।"

বিনয়বাবু বললেন, "নরবলি দেয়, এমন সভ্য জাতি আর পৃথিবীতে নেই। বিমল, আমরা কোন অসভ্য জাতিরই কীর্তি দেখছি।"

বিমল নিচে নেমে এল। তারপর সেপাইদের সম্বোধন ক'রে বললে, "ভাই সব! আমরা সব নিষ্ঠুর শত্রুর দেশে এসে পড়েছি। সকলে খুব হুঁশিয়ার থাকো, কেউ দলছাড়া হোয়ো না! এ শত্রু কারুকেই ক্ষমা করবে না, যাকে ধরতে পারবে তাকেই দানব-দেবতার সামনে বলি দেবে, সর্বদাই এই কথা মনে রেখ! এস আমার সঙ্গে!"—ব'লে সে আর একবার সেই ভয়ঙ্কর মুণ্ডগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে,—একদিন যারা জীবন্ত মানুষের কাঁধের উপরে আদরে থেকে এই সুন্দরী ধরণীর সৌন্দর্য দেখত, আতর-ভরা বাতাসের গান শুনত, কত হাসি-খুশির গল্প বলত।

রামহরি তাড়াতাড়ি সেপাইদের মাঝখানে গিয়ে বললে, "বাছারা, তোমরা আমার চারপাশে থাকো, এই বুড়ো-বয়সে আমি আর ভুতুড়ে দেবতার ফলার হতে রাজি নই!"

কমল বললে, "কিন্তু ওদের ধড়গুলো কোথায় গেল?"

বিনয়বাবু বললেন, "কোথায় আর, ভক্তদের পেটের ভিতরে!"

সকলে শিউরে উঠল।

বিমল গোমেজের পকেট-বুকখানা বার ক'রে দেখে বললে, "মর্টন

সাহেবরা পশ্চিম দিক দিয়ে শিখরের দিকে উঠেছিলেন। আমরাও এই দিক দিয়েই উঠব। দেখে মনে হচ্ছে, এই দিক দিয়েই উপরে ওঠা সহজ হবে, কারণ এদিকটা অনেকটা সমতল।"

আগে বিমল ও কুমার, তারপর বিনয়বাবু ও কমল এবং তারপর প্রত্যেক সারে ছুইজন ক'রে সেপাই পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। সকলেরই বন্দুকে টোটা ভরা এবং দৃষ্টি কাকের মতন সতর্ক।

কিন্তু প্রায় বিশ মিনিট ধ'রে উপরে উঠেও তারা সতর্ক থাকবার কোনও কারণ খুঁজে পেলে না। গোরস্থানেও গাছের ছায়া নাচে, পাখির তান শোনা যায়, ঘাসের মখমল-বিছানা পাতা থাকে, কিন্তু এই ছায়া-শূন্যতা, বর্ণহীনতা ও অসাড়তার দেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের দেখা নেই—একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকাও বোধ হয় এখানে ডাকতে সাহস করে না। এ যেন ঈশ্বরের বিশ্বের বাইরেকার রাজ্য, সর্বত্রই যেন একটা অভিশপ্ত হাহাকার স্তম্ভিত হয়ে অনন্তকাল ধ'রে নীরবে বিলাপ করছে। কেবল অনেক নিচে সমুদ্রের গম্ভীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সে যেন অন্য কোন জগতের আর্তনাদ!

কুমার বললে, "পাহাড়ের শিখর তো আর বেশিদূরে নেই, কোথায় সেই সোনার বর্শা আর কোথায় সেই ব্রোঞ্জের দরজা ?"

বিমল বললে, "সোনার বর্শাটা আর দেখবার আশা কোরো না, কারণ খুব সম্ভব সেটা যাদের জিনিস তাদের হাতেই ফিরে গেছে! আমাদের খুঁজতে হবে কেবল সেই দরজাটা।"

কুমার বললে, "আর শ-খানেক ফুট উঠলে আমরা শিখরের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছব। তারপর দেখছ তো ? শিখরের গা একেবারে দেয়ালের মত খাড়া, টিকটিকি না হ'লে আমরা আর ওখান দিয়ে ওপরে উঠতে পারব না।"

বিমল বললে, "তাহ'লে দরজা পাব আরো নিচেই। কারণ মর্টন-সাহেবরা যে এই পথ দিয়েই এসেছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দেখ তার প্রমাণ।"—ব'লেই সে হেঁট হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে

একটা খালি টোটা কুড়িয়ে নিয়ে তুলে ধরলে।

কুমার বললে, "বুঝেছি। সাহেবরা হারানো নাবিকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে বন্দুক ছুঁড়েছিল, এটা তারই নিদর্শন।"

বিমল উৎসাহ-ভরে বললে, "সুতরাং 'আগে চল, আগে চল ভাই'!"

বিনয়বাবু তখন চোখে দূরবীন লাগিয়ে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি বিস্মিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "অনেক দূরে একখানা জাহাজ!"

বিমল দূরবীনটা নিয়ে দেখল, বহু দূরে—সমুদ্র ও আকাশের সীমা-রেখায় একটা কালো ফোঁটার মত একখানা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন,—"লণ্ডনে থাকতে শুনেছিলুম, এ-পথ দিয়ে জাহাজ আনাগোনা করে না, তবে ও-জাহাজখানা এখানে কেন?"

বিমল বললে, "জাহাজখানা এখনো অনেক তফাতে আছে, দেখছেন না এত ভালো দূরবীনেও কতটুকু দেখাচ্ছে? সম্ভবত ওখানা অন্য পথেই চ'লে।...কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই—'আগে চল, আগে চল ভাই'।"

সব আগে চ'লেছিল বাঘা। তাকে এখন দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার সচকিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল।

বিমল চিৎকার ক'রে বললে, "হুঁশিয়ার, সবাই হুঁশিয়ার! বাঘা অকারণে গর্জন করে না।"

তারপরেই দেখা গেল, বাঘা ঝড়ের বেগে নিচের দিকে নেমে আসছে। সে বিমলদের কাছে এসেই আবার ফিরে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

বিমল ও কুমার বন্দুকের মুখ সামনের দিকে নামিয়ে অগ্রসর হ'ল। আচম্বিতে খুব কাছেই উপর থেকে একটা শব্দ এল—যেন প্রকাণ্ড কোন দরজার কপাট দুড়ুম ক'রে বন্ধ হয়ে গেল।

বিমল ও কুমার এবার ফিরে পিছনদিকে তাকালে। দেখলে, সেপাইরা প্রত্যেকেই বন্দুক প্রস্তুত রেখে সারে সারে উপরে উঠে আসছে—তাদের প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে উদ্দীপনার আভাস।

বিমল ও কুমার তখন বেগে শিখরের দিকে উঠতে লাগল।

কিন্তু আর বেশিদূর উঠতে হ'ল না। হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সুমুখেই মস্তবড় একটা বন্ধ দরজা এবং আশেপাশে জনপ্রাণীর সাড়া বা দেখা নেই।

তারা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে দরজাটা দেখতে লাগল। এ-রকম গড়নের দরজা তারা আর কখনো দেখেনি—উচ্চতা বেশি না হ'লেও চওড়ায় তা অসামান্য। খোলা থাকলে তার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি ছয়জন লোক একসঙ্গে বাইরে বেরুতে বা ভিতরে ঢুকতে পারে। এবং তার আগাগোড়াই ব্রোঞ্জ্ ধাতুতে তৈরি।

বিমল এগিয়ে গিয়ে দরজায় সজোরে বারকয়েক ধাক্কা মেরে বললে, "কি ভীষণ কঠিন দরজা! আমার এমন ধাক্কায় একটুও কাঁপল না!"

কুমার বললে, "কারিকরিও অদ্ভুত। দেখছ, দুই পাল্লার মাঝখানে একটা স্থচ গলাবারও ফাঁক নেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "দরজার গায়ে আর তার চারপাশে শেওলার দাগ দেখ! এর মানে হচ্ছে, এই দরজাটাও এতদিন ছিল সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য। এটা এমন মজবুত আর ছিদ্রহীন ক'রে গড়া হয়েছে যে, সমুদ্রের শক্তিও এর কাছে হার মানে!"

কমল হতাশ ভাবে বললে, "এখন উপায়? হাতিও তো এ দরজা ভাঙতে পারবে না!"

বিমল বললে, "কুমার, নিয়ে এস তো সেপাইদের কাছ থেকে আমাদের ডাইনামাইটের বাক্স। দেখি এ-দরজার শক্তি কত!"

কুমার সিপাইদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, "ডাইনামাইট! ডাইনামাইট!"

তখনি ডাইনামাইটের বাক্স এল। দরজার তলায় সেই ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ সাজিয়ে একটা পলিতায় আগুন দিয়ে বিমল সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার নিচের দিকে নেমে গেল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। খানিক পরেই একসঙ্গে যেন

অনেকগুলো বজ্র গর্জন ক'রে উঠে সমস্ত পাহাড়টা থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিলে।

বিমল হাত তুলে চিৎকার ক'রে বললে, "পথ সাফ্। সবাই অগ্রসর হও।"

নবম পরিচ্ছেদ

সত্যিকার প্রথম মানুষ

সবাই বেগে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলে, কুণ্ডলীকৃত ধূম্র-পুঞ্জের মধ্যে পাহাড়ের শিখরটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেই পুরু ব্রোঞ্জের দরজার একখানা পাল্লা ভেঙে একপাশে ঝুলছে ও একখানা পাল্লা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে।

দরজার হাত দশেক পরেই দেখা যাচ্ছে একটা দেওয়াল বা পাহাড়ের গা। ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার জন্যে বিমল ও কুমার আরো কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলে। তারপর বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে এগিয়ে গেল।

দরজার পরেই খুব মস্তবড় ইঁদারার মত একটা গহ্বর নিচের দিকে নেমে গিয়েছে এবং তারই গা বয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সংকীর্ণ পাথরের সিঁড়ির ধাপ।

বিমল হুকুম দিলে, "গোটাকয়েক পেট্রোলের লণ্ঠন জ্বালো। নইলে এত অন্ধকারে নিচে নামা যাবে না।"

কুমার কান পেতে শুনে বললে, "নিচে থেকে কি-রকম একটা আওয়াজ আসছে, শুনছ? যেন অনেক দূরে কোথায় মস্ত একটা মেলা বসেছে, হাজার হাজার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।"

সত্যই তাই। নিচে—অনেক দূর থেকে আসছে এমন বিচিত্র ও গম্ভীর সমুদ্রগর্জনের মতন ধ্বনি, যে শুনলে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বিমল সবিস্ময়ে বললে, "নির্জন, নির্জন এই পাহাড়-দ্বীপ, কিন্তু এর

লুকানো গর্ভে, চন্দ্র-সূর্যের চোখের আড়ালে কি নতুন একটা মানুষ-জাতি বাস করে ? পৃথিবীতে কি কোন পাতাল রাজ্য আছে ? তাও কি সম্ভব?"

কুমার বললে, "পাতাল-রাজ্য থাক্ আর না থাক্, কিন্তু আমরা যে হাজার হাজার লোকের গলায় অস্পষ্ট কোলাহল শুনছি, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই !"

বিনয়বাবু বললেন, "হাজার হাজার কণ্ঠ মানে হাজার হাজার শত্রু। তারা নিশ্চয়ই ডাইনামাইটে দরজা ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছে—তাই চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে আসছে আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।"

রামহরি কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, "ও খোকাবাবু! ওরা আমাদের টিপে মেরে ফেলবে না গো, টিপে মেরে ফেলবে না। ওরা খাঁড়া তুলে নরবলি দেবে। আমাদের মুণ্ডুগুলো রেঁধে গপ্ গপ্ ক'রে খেয়ে ফেলবে। জাহাজে চল খোকাবাবু, জাহাজে চল।"

বিমল কোনদিকে কর্ণপাত না ক'রে বললে, "চল কুমার। আগে তো সিঁড়ি দিয়ে দুর্গা ব'লে নেমে পড়ি, তারপর যা থাকে কপালে।"

কুমার সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়ে বললে, "জলে-স্থলে-শূন্যে বহুবার উড়েছে আমাদের বিজয়-পতাকা। বাকি ছিল পাতাল, এইবার হয়তো তার সঙ্গেও পরিচয় হবে ! আজ আমাদের—'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।' ওহো, কি আনন্দ !"

কমল হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

"স্বর্গকথা ঢের শুনেছি,
ঘর তো মোদের মর্ত্যে,
কী আছে ভাই দেখতে হবে
আজ পাতালের গর্তে।"

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, "থামো কমল, থামো। এদের সঙ্গে থেকে তুমিও একটা ক্ষুদ্র দস্যু হয়ে উঠেছ।"

ততক্ষণে কুমার ও বিমলের মূর্তি সিঁড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেখেই রামহরি সব ভয় ভাবনা ভুলে গেল। উদ্বিগ্ন স্বরে ব'লে উঠল,

"অ্যাঁ, খোকাবাবু নেমে গেছে? আর কি আমরা জাহাজে যেতে পারি —তাহলে খোকাবাবুকে দেখবে কে?"—ব'লেই সেও সিঁড়ির দিকে ছুটল তীরবেগে।

বিনয়বাবু ফিরে সেপাইদের আসবার জন্যে ইঙ্গিত ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

পাহাড়ের গা কেটে এই সিঁড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপের মাপ উচ্চতায় একহাত, চওড়ায় আধহাত ও লম্বায় কিছু কম, দেড় হাত। এ সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি দুজন লোক নামতে গেলে কষ্ট হয়। বিশেষ সিঁড়ির রেলিং নেই—একদিকে একটা ঘুটঘুটে কালো গর্ত জীবন্ত শিকার ধরবার জন্যে যেন হাঁ করে আছে—একটিবার পা ফস্কালেই কোথায় কত নিচে গিয়ে পড়তে হবে তা কেউ জানে না।

বিনয়বাবু বললেন, "সকলে একে একে দেওয়াল ঘেঁষে নামো। এ হচ্ছে একেবারে সেকেলে সিঁড়ি। একে সিঁড়ি না বলে পাথরের মই বলাই উচিত।"

ততক্ষণে কুমার ও বিমল গুনে গুনে পঞ্চাশটা ধাপ পার হয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে, অসম্ভব বিস্ময়ে তাদের মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল কেমনধারা। এ-রকম কোন দৃশ্য দেখবার জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না—পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য এ-যুগে আর কেউ কখনো দেখেনি।

চতুর্দিকে মাইল-কয়েকব্যাপী একটা উনুনের মতন জায়গা কেউ কল্পনা করতে পারেন? এম্‌নি একটা উনুনেরই মতন জায়গার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিমল ও কুমার হতভম্বের মতন চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাতে লাগল।

উপর-দিকটা ডোমের খিলানের মতন ক্রমেই সরু হয়ে উঠে গেছে—কিন্তু পুরো ডোম নয়, কারণ তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ফাঁক। সেই গোলাকার ফাঁকটার বেড় অন্তত কয়েক হাজার ফুটের কম নয়। তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের নীলিমার অনেকখানি এবং তার

ভিতর দিয়ে ঝ'রে পড়ছে এই অত্যাশ্চর্য উনুনের বিপুল জঠরে সমুজ্জ্বল সূর্য-কিরণ-প্রপাত।

পাহাড়ের গা থেকে একটা পনেরো-বিশ ফুট চওড়া জায়গা 'ব্র্যাকেটে'র মতন বেরিয়ে পড়েছে, বিমল ও কুমার তারই উপরে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সেই স্বাভাবিক 'ব্র্যাকেটটা' অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং যে-সিঁড়ি দিয়ে তারা নেমেছে সোপানের সার এই-খানেই শেষ হয়ে যায় নি, 'ব্র্যাকেট'টা ভেদ ক'রে নেমে গিয়েছে সামনে আরো নিচের দিকে।

বিমল বললে, "কুমার! অদ্ভুত কাণ্ড! এই দ্বীপের মতন পাহাড়টা ফাঁপা—শিখরটাও কেবল ফাঁপা নয়, ছ্যাঁদা। তাই 'স্কাইলাইটে'র কাজ করছে! এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছো—পাহাড়ের পেটের ভিতরে মাইলের পর মাইল ধ'রে গুহা-দেশ।"

কুমার বললে, "নিচে জনতার গোলমাল আর চারিদিকে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ক্রমেই বেড়ে উঠছে! উপরের মস্ত ছ্যাঁদা দিয়ে প্রখর আলো আসছে—কিন্তু আলো-ধারার বাইরে দূরে ছায়ার ভিতরে নিচে ঝাপসা ঝাপসা নানা আকারের কি ওগুলো দেখা যাচ্ছে বল দেখি?"—বলতে বলতে সে দুই-এক পা এগুবার পরেই হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন প্রকাণ্ড একটা মূর্তি যেন শূন্য থেকেই আবির্ভূত হয়ে একেবারে তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কুমার কিছু বোঝবার আগেই তাকে ঠিক একটি ছোট্ট খোকার মত দু-হাতে অতি সহজে তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছাড় মারবার উপক্রম করলে।

কিন্তু বিমলের সতর্ক দুই বাহু চোখের পলক পড়বার আগেই প্রস্তুত হয়ে শূন্যে উঠল, সে একলাফে তার কাছে গিয়ে প'ড়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মূর্তিটার মাথায় করলে প্রচণ্ড এক আঘাত।

সে-আঘাতে সাধারণ কোন মানুষের মাথার খুলি ফেটে নিশ্চয়ই চৌচির হয়ে যেত, কিন্তু মূর্তিটা চিৎকার ক'রে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে একবার কেবল টলে পড়ল, তারপরেই টাল্ সামলে নিয়ে বেগে

বিমলকে তেড়ে এল !

বিমল আবার তার মাথা টিপ্ করে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করতে গেল।

কিন্তু সেই মূর্তিটার গায়ের জোর ও তৎপরতা যে বিমলের চেয়েও বেশি, তৎক্ষণাৎ তার প্রমাণ মিলল !

সে চট্ ক'রে একপাশে স'রে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটানে বন্দুকটা বিমলের হাত থেকে কেড়ে নিলে ! আজ পর্যন্ত কোন মানুষই কেবল গায়ের জোরে অসম্ভব বলবান বিমলের হাত থেকে এমন সহজে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে নি।

পর মুহূর্তে বিমলের হাল কী যে হ'ত বলা যায় না, কিন্তু ততক্ষণে তাদের দলের আরো কেউ কেউ সেখানে এসে পড়েছে এবং গর্জন ক'রে উঠেছে রামহরির হাতের বন্দুক।

বিকট আর্তনাদ ক'রে মূর্তিটা শূন্যে বিদ্যুৎ-বেগে দুই বাহু ছড়িয়ে সেইখানে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর নড়ল না !

কুমার তখন মাটির উপরে দুই হাতে ভর্ দিয়ে ব'সে অত্যন্ত হাঁপাচ্ছে !

বিমল আগে তার কাছে দৌড়ে গিয়ে ব্যস্তস্বরে সুধোলে, "ভাই, তোমার কি খুব লেগেছে ?"

কুমার মাথা নেড়ে বললে, "লেগেছে সামান্য, কিন্তু চম্‌কে গেছি বেজায় ! ও যেন আকাশ ফুঁড়ে আমার মাথায় লাফিয়ে পড়ল !"

বিমল মুখ তুলে দেখে বললে, আকাশ ফুঁড়ে নয় বন্ধু ! ঐ দেখ, সিঁড়ির এপাশেই একটা গুহা রয়েছে ! ওটা নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়ে ছিল !"

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কিন্তু কী ভয়ানক ওর চেহারা আর কী ভয়ানক ওর গায়ের জোর ! ওকে মানুষের মত দেখতে, কিন্তু ও কি মানুষ ?"

বিমল বললে, "এখনো ওকে ভালো ক'রে দেখবার সময় পাই নি। এস, এইবারে ওর চেহারা পরীক্ষা করা যাক্ !"

তারা যখন সেই ভূপতিত মৃত শত্রুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন বিনয়বাবু হাঁটু গেড়ে মূর্তিটার পাশে ব'সে দুই হাতে তার মাথাটি ধ'রে

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

মূর্তিটা লম্বায় ছয়ফুটের কম হবে না—দেখতেও সে সাধারণ মানুষের মতন, আবার মানুষের মতন নয়-ও! কারণ তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় ও অধিকতর পেশীবদ্ধ। তার গায়ের রং ফর্সাও নয়, কালোও নয় এবং সর্বাঙ্গে বড় বড় চুল! তার মুখ 'মঙ্গোলিয়ান' না হ'লেও, খানিকটা সেই রকম ব'লেই মনে হয়, আবার তার মধ্যে আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান' মুখেরও আদল পাওয়া যায়। সারা মুখ্-খানায় পশুত্বের বিশ্রী ভাব মাখানো। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় দীর্ঘ কেশ, গায়ে উল্কী এবং পরনে কেবল একটি চামড়ার জাঙ্গিয়া।

বিমল বললে, "কুমার, এ নিশ্চয়ই মানুষ, তবু একে মানুষের স্বগোত্র ব'লে তো মনে হচ্ছে না! এর দেহ আর মানুষের দেহের মাঝখানে কোথায় যেন একটা বড় ফাঁক আছে।"

বিনয়বাবু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ এ মানুষ! পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ!"

বিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ? তার অর্থ?"

—"তার অর্থ? 'অ্যানথ্রপলজি' জানা থাকলে আমার কথার অর্থ বুঝতে তোমার কোনই কষ্ট হ'ত না! প্রথম সত্যিকার মানুষের নাম কি জানো? 'ক্রো-ম্যাগ্নন্'! আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে আন্দাজ বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষেরা ইউরোপে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আমাদের সামনে ম'রে পড়ে আছে, সেই জাতেরই একটি মানুষ। আমি একে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা করেছি, আমার মনে আর কোন সন্দেহই নেই।"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনার কথা যতই শুনছি ততই আমার বিস্ময় বেড়ে উঠছে। আমরা তো আপনার মতন পণ্ডিত কি বৈজ্ঞানিক নই, আমাদের আর একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।"

বিনয়বাবু বললেন, "আচ্ছা, তাই বলছি। আগে ইউরোপে সত্যি-

কার মানুষ আসবার আগে শেষ যে জাতের মানুষ বাস করত তার নাম হচ্ছে 'নিয়ান্‌ডের্টাল' মানুষ—তাদের চেহারা বান্দরের মত না হ'লেও তাদের দেখলে গরিলার মূর্তি মনে পড়ে। তাদের স্বভাব ছিল বনমানুষের মত, চলাফেরার ভঙ্গিও ছিল বনমানুষের মত, সেই ভীষণ বন্য হিংস্র প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমাদের কিছুই মেলে না। তাদের সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। ইউরোপে তারা রাজত্ব করেছিল দুই লক্ষ বৎসর ধ'রে। তারপর ইউরোপে সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব হয়—ক্রো-ম্যাগ্নন্‌ মানুষ হচ্ছে সত্যকার মানুষদের একটি জাত। ক্রো-ম্যাগ্নন্‌ মানুষদের গড়ন ছিল মোটামুটি আমাদেরই মত। তারা সব উন্নত, তাই নিয়ান্‌-ডের্টাল মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা না ক'রে ইউরোপ থেকে তারা তাদের বিতাড়িত বা লুপ্ত করে। মনুষ্যোচিত অনেক গুণই যে তাদের ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তারা জামা-কাপড় পরত, ঘোড়া পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়তে জানত, মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে গোর দিত, বঁড়শী গেঁথে মাছ ধরত, ছুরি, সূঁচ, প্রদীপ, বর্শা, তীর-ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করত। ক্রমশ তারা যে খুব সভ্য হয়ে উঠেছিল এমন অনুমানও করা যায়। কারণ ফ্রান্স ও স্পেনের একাধিক গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে তারা অসংখ্য জীবজন্তুর যে-সব ছবি এঁকেছিল, তা এখনো বর্তমান আছে। এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকররাও তাদের চেয়ে ভালো ছবি আঁকতে পারেন না—সে-সব ছবির লাইন যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জোরালো। তাদের মূর্তি-শিল্পের—অর্থাৎ ভাস্কর্যেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যাদের আর্ট এমন উন্নত তাদের স্বভাবও যে 'নিয়ান্‌ডের্টাল' যুগের তুলনায় অনেকটা উন্নত ছিল এমন কল্পনা করলে দোষ হবে না। পরে উত্তর এশিয়া থেকে আর্যজাতির কোন দল যায় ভারতে, কোন দল যায় পারস্যে এবং কোন দল যাত্রা করে ইউরোপে। আর্যরা ভারতের অনার্যদের দাক্ষিণাত্যের দিকে তাড়িয়ে দেন। ইউরোপীয় আর্যজাতির দ্বারা ক্রো-ম্যাগ্নন্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় অনার্য বা আদিম জাতিরাও বিতাড়িত হয়। হয়তো নানাস্থানে ভারতের মত ইউরোপেও আর্যের সঙ্গে অনার্যের মিলন হয়েছিল। ভারতের

অনার্যরা যে অসভ্য ছিল না, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাই তার প্রমাণ। সুতরাং ইউরোপের আদিম অধিবাসী এই ক্রো-ম্যাগ্নন্‌রাও খুব সম্ভব অসভ্য ছিল না, তাই তারা ওখানকার আর্যদের সঙ্গে হয়তো অল্পবিস্তর মিশে যেতে পেরেছিল। মোটকথা, ইউরোপে ক্রো-ম্যাগ্নন্ লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষ আজও এখনো দেখা যায়—যদিও সেখানে 'ক্রো-ম্যাগ্নন্' মানুষের জাত লুপ্ত হয়েছে। বিমল, আমি এই বিপদজনক দেশে এসে প'ড়ে পদে পদে ভয় পাচ্ছি বটে, কিন্তু আজ এখানে এসে যে অভাবিত আবিষ্কার করলুম, তার মহিমায় আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা সার্থক হয়ে উঠল। খাঁটি ক্রো-ম্যাগ্নন্ জাতের মানুষ আজও যে পৃথিবীতে আছে, এ খবর নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে আমাদের নাম অমর হবে।"

বিমল, কুমার ও কমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত চোখ মেলে সেই সুপ্রাচীন জাতের আধুনিক বংশধরের আড়ষ্ট মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনার খাঁটি ক্রো-ম্যাগ্নন্‌রা কত বড় সভ্য ছিল জানি না, কিন্তু সে-জাতের একটি মাত্র নমুনা দেখেই আমার পিলে চম্‌কে যাচ্ছে। উঃ, মানুষ হ'লেও এ বোধহয় গরিলার সঙ্গে কুস্তি লড়তে পারত! এ জাতের সঙ্গে ভবিষ্যতে দূর থেকেই কারবার করতে হবে।"

কুমার বললে, "এদিকে আমরা যে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। জনতার কোলাহল ভয়ানক বেড়ে উঠছে, ব্যাপার কি দেখা দরকার।"

কমল সেই সুদীর্ঘ 'ব্র্যাকেট' বা বারান্দার মত জায়গাটার ধারে গিয়ে নিচের দিকে উঁকি মেরে দেখলে। পরমুহূর্তেই অভিভূত স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, "আশ্চর্য, আশ্চর্য! এ কি ব্যাপার!"

বিমল ও কুমার তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের দৃশ্য দেখে তাদেরও চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

হারা মহাদেশ

এবারে তাদের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত ও বিশাল দৃশ্যপটের মতন পরিপূর্ণ মহিমায় যা জেগে উঠল, আগেকার বিস্ময়ের চেয়েও তা কল্পনাতীত। সে দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে গেলে পৃথিবীর কোন ভাষাতেই কুলোবে না।

উপর থেকে সমস্ত দৃশ্যটাকে মনে হচ্ছে ঠিক একখানা 'রিলিফ ম্যাপে'র মত। শিখরের সেই বিরাট ফাঁকের ভিতর দিয়ে তখন দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল। ফাঁকের মধ্যাগত উজ্জ্বল রৌদ্র নিচের দৃশ্যের উপরে গিয়ে যেখানে বায়োস্কোপের মেসিনের মত একটা প্রকাণ্ড আলোকমণ্ডল সৃষ্টি করেছে সেখানে সর্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশাল এক সরোবর। তাকে সাগরের একটা ছোটোখাটো সংস্করণও বলা চলে— কারণ সেই চতুষ্কোণ সরোবরের এপার থেকে ওপারের মাপ হয়তো মাইল দেড়েকের কম হবে না।

সরোবরটিকে দেখলেই মনে প্রশ্ন জাগে, এমন অদ্ভুত স্থানে কি ক'রে এই অসম্ভব জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে? এর মধ্যে শিল্পী মানুষের দক্ষ হাত যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে জল সরবরাহ হয় কোন্ উপায়ে? তার তলদেশে কি কোন গুপ্ত উৎস আছে? না উন্মুক্ত শিখর-পথ দিয়ে বৃষ্টির যে ধারা ঝরে, তাকেই ধ'রে রাখবার জন্যে এইখানে সরোবর খনন করা হয়েছে? এই সরোবরই বোধহয় এখানকার সমস্ত জলাভাব নিবারণ করে। কারণ তার চারিদিক থেকে চারটি বেশ চওড়া খাল আলোকমণ্ডল পার হয়ে আলো-আঁধারির ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তরে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক খালটি যে কত মাইল লম্বা, তা ধারণা করবার উপায় নেই।

খালের মাঝে মাঝে রয়েছে স্বর্ণবর্ণ সেতু! সোনার সাঁকো! শুনতে আজগুবি ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু এ অতি সত্য কথা। তবে রং দেখে মনে হয়, এ যেন খাদ-মেশানো সোনার মত! হয়তো এদেশে লোহা মেলে না, কিংবা সোনার চেয়ে লোহাই এখানে বেশি দুর্লভ। হয়তো এখানে এত অতিরিক্ত পরিমাণে সোনা পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের লোহার দরে বিক্রি হয়। আগে আমেরিকাতেও অনেক দামী ধাতুরও কোন দাম ছিল না। ইউরোপের লোকেরা সেই লোভে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। এখনো অনেক অসভ্য জাতি হীরার চেয়ে কাঁচকে বেশি দামী মনে করে।

সরোবরের চারিধারে প্রথমে রয়েছে শস্যক্ষেতের পর শস্যক্ষেত। কিছু কিছু বনজঙ্গলও আছে, তবে বেশি নয়। সূর্যের আলো না পেলে ফসল ফলে না, উন্মুক্ত শিখরের তলায় যেখানে রোদ আনাগোনা করে সেইখানেই ক্ষেতে ফসল উৎপাদন করা হয়। দূরের যে-সব জায়গায় রোদ পৌঁছায় না, সেখানে রোদের অভাবে দেখা গেল গাছপালা বা শ্যামলতার চিহ্ন নেই বললেই হয়।

আলোকমণ্ডলের বাইরে, শস্যক্ষেতের পর খুব স্পষ্টভাবে চোখে কিছু পড়ে না বটে, কিন্তু এটুকু দেখা যায় যে, বাড়ির পর বাড়ির সারি কোথায় কত দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চ'লে গিয়েছে। কোন বাড়ি দোতলা, কোন বাড়ি তেতলা বা চারতলা! তাদের গড়নও অদ্ভুত— পৃথিবীর কোন দেশেরই স্থাপত্যের সঙ্গে একটুও মেলে না।

অনেক সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাজপথ—প্রত্যেকটিই দূর থেকে সরলভাবে সরোবরের ধারে এসে পড়েছে। প্রত্যেক রাজপথে বিষম জনতা। দলে দলে লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ও ছুটাছুটি করছে! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা! প্রত্যেক পুরুষের হাতে বর্শা ও ঢাল এবং পৃষ্ঠে সংলগ্ন ধনুক! বর্শা ও ধনুকের দণ্ড চক্‌চক্ করছে, সোনায় তৈরি বা স্বর্ণমণ্ডিত ব'লে! মেয়েদের

পরনে ঘাঘ্‌রা ও জামা, কিন্তু পুরুষদের পরনে কেবল জাঙ্গিয়া, গা আদুড়। স্ত্রী ও পুরুষ—সকলেরই দেহ আশ্চর্যরূপে বলিষ্ঠ, বৃহৎ ও মাংসপেশী-বহুল। তাদের সকলেরই দীর্ঘতা প্রায় ছয় ফুট! সংখ্যায় তারা হয় তো আট-দশ হাজারের কম হবে না, বরং বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। কারণ সূর্যকরে সমুজ্জ্বল সরোবরের তীরবর্তী স্থান, তারপর আলো আঁধারির লীলাক্ষেত্র—এ-সব জায়গায় আর তিলধারণের ঠাঁই নেই, তারপর রয়েছে যে অন্ধকারময় সুদূর প্রদেশ, সেখানেও ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মশাল।

সরোবরের পূর্বে ও পশ্চিমে কেবলমাত্র দুইখানি প্রকাণ্ড অট্টালিকা রয়েছে। দুইখানি অট্টালিকার উপরেই রয়েছে দুটি বিশাল ও অপূর্ব গম্বুজ। দেখলেই বোঝা যায় একটি তার সোনার ও আর একটি রূপোর। প্রত্যেক অট্টালিকার উচ্চতা একশো ফুটের কম হবে না। খুব সম্ভব এর একটি রাজপ্রাসাদ এবং আর একটি দেবমন্দির। কারণ প্রথমোক্ত অট্টালিকার সুমুখের প্রাঙ্গণে দলবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুই হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা এবং শেষোক্ত অট্টালিকার চারিদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে শত শত মুণ্ডিত-মস্তক ব্যক্তি—হয়তো তারা পুরোহিত। এবং তাদের আশেপাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে দলে দলে হৃষ্টপুষ্ট গরু। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই রাজবাড়ি থেকে ঠাকুর-বাড়ি পর্যন্ত, সেই প্রায় দেড়মাইলব্যাপী সরোবরের উপরে স্থাপন করা হয়েছে অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র এক সেতু। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মহাকাব্যেও এমন সেতুর কাহিনী বর্ণনা করা হয় নি। স্বর্ণময় সেতু এবং তার রৌপ্যময় রেলিং। সমস্ত সেতুর উপর দিয়ে রবির কিরণ যেন ঝক্-মকিয়ে পিছ্‌লে পড়ছে—তাকালেও চোখ ঝলসে যায়। এই একটিমাত্র সাঁকো তৈরি করতে যত সোনা ও যত রূপো লেগেছে, তার বিনিময়ে অনায়াসে মস্ত এক রাজ্য কেনা যায়।

অবাক হয়ে এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে বিমলের মনে হ'ল, সে যেন মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোন অলৌকিক স্বপ্নলোকে গিয়ে পড়েছে—

সেখানে সমস্তই অভাবিত অভিনব, সেখানে কিছুই বাস্তব নয়, সেখানে প্রত্যেক ধূলিকণাও পৃথিবীর কোটিপতির কাছে লোভনীয়!

কুমার আচ্ছন্ন স্বরে ব'লে উঠল, "রূপকথায় এক দেশের কথা শুনেছি যেখানে সোনার গাছে ফোটে হীরারফুল। আমরা কি সেই দেশেই এসে পড়েছি?"

রামহরি কিছুমাত্র বিস্মিত হবার সময় পায় নি, সে যতই অসম্ভব ব্যাপার দেখছে ততই বেশি ভীত হ'য়ে উঠছে। সে তুই চোখ পাকিয়ে বললে, "এ সব হচ্ছে মায়া—ডাইনি-মায়া, ময়নামতীর ভেল্‌কী! রূপ-কথা যে-দেশের কথা বলে, সেখানে বুঝি খালি সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে? সেখানে যে-সব ভূত-পেত্নী, শাঁকচুন্নী, কন্ধকাটা, রাক্ষস-খোক্ষসও থাকে, তাদের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

কুমার মৃত্নু হেসে বললে, "তাদের কথা ভুলে যাই নি, রামহরি! এখনি তো তাদের একজনের পাল্লায় পড়েছিলুম, তুমিই তো আমাদের বাঁচালে।"

—"আবার তাদের পাল্লায় পড়লে শিবের বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচতে চাও তো এখনো পালিয়ে চল।"

—"তোমার এই শিবের বাবাটি কে রামহরি? নিশ্চয়ই তিনি বড় যে-সে ব্যক্তি নন, আর তাঁকে শিবের চেয়েও ভক্তি করা উচিত। তাঁর নাম কি? যদি তাঁর নাম বলতে পারো, তাহ'লে এখনি এই সোনার দেশ ছেড়ে আমরা তোমার সঙ্গে লোহার জাহাজে চ'ড়ে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হব।"

—"এ ঠাট্টার কথা নয় গো বাপু। শাস্তরে বলেছে, সমুদ্দরের তলায় আছে রাক্ষসদের স্বর্ণ-লঙ্কা। আমরা নিশ্চয় সেইখানে এসে পড়েছি। শ্রীরামচন্দর না হয় রাবণ আর কুম্ভকর্ণকেই বধ করেছেন। ধরলুম রাবণের বেটা মেঘনাদও পটল তুলেছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের বেটাকে তো কেউ আর বধ করতে পারে নি। বাপের মতন হয়তো তার ছ-মাস ধরে ঘুমনোর বদ্-অভ্যাস নেই, সে যদি এখন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে 'রে রে' শব্দে তেড়ে

আসে— তা'হলে আর কি আমাদের রক্ষে থাকবে ?"

কমল বললে, "দেখুন বিমলবাবু। এখানে মানুষ আছে, চতুষ্পদ জীবও আছে, ঐ সরোবরের জলে হয়তো জলচরও আছে, কিন্তু কোথাও একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছ কমল। আমি এতক্ষণ ওটা লক্ষ্য করি নি। এটা পুরোদস্তুর পাতাল-রাজ্যই বটে। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো ? সকলেরই মতে, এই দ্বীপটা এতদিন সমুদ্রের তলায় ডুবে ছিল, আজ হঠাৎ ভেসে উঠেছে, তাই নাবিকদের কোন 'চার্টে'ই এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দ্বীপের উপরকার পাথরের মূর্তিগুলোয় আর 'ব্রোঞ্জে'র দরজার গায়ে সামুদ্রিক শেওলা দেখে সেই কথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি, এই দ্বীপ-পাহাড়ের গর্ভটা হচ্ছে বিরাট একটা গুহার মত,—এমন-কি এর সবচেয়ে উঁচু-শিখরটাও ফাঁপা, তার ভিতর দিয়ে অবাধে আলো আর বাতাস আসে। দ্বীপটা যখন সমুদ্রের তলায় ছিল, তখন ব্রোঞ্জের দরজা ভেদ ক'রে সমুদ্রের জল না-হয় ভিতরে ঢুকতে পারত না। কিন্তু শিখরের অত-বড় ফাঁকটা তো কোনরকমেই বন্ধ করা সম্ভব নয়, ওখানে সমুদ্রকে বাধা দেওয়া হ'ত কোন্ উপায়ে ?"

খানিকক্ষণ উপরের ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে থেকে কুমার বললে, "তোমার প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে—সম্ভবত কেবল পাহাড়ের শিখরের অংশটুকু বরাবরই জলের উপরে জেগে থাকত। এটা নিয়মিত জাহাজ চলাচলের পথ নয় বলে কোন 'চার্টে'ই সামান্য একটা জলমগ্ন পাহাড়ের শিখরের উল্লেখ নেই।

বিমল বললে, "বোধ হয় তোমার অনুমানই সত্য।"

বিনয়বাবু এতক্ষণ একটিও কথা উচ্চারণ করেন নি। তিনি স্তব্ধভাবে কখনো নিচের সেই অতুলনীয় দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং কখনো বা মাথা হেঁট ক'রে অর্ধনিমীলিত নেত্রে কি যেন চিন্তা করছেন, —ঐ দৃশ্য ও নিজের চিন্তা ছাড়া পৃথিবীর আর সব কথাই তিনি যেন এখন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছেন।

হঠাৎ কুমার তাঁকে ডেকে বললে, "বিনয়বাবু, আপনি একটাও কথা বলছেন না কেন?"

বিনয়বাবু চম্‌কে ব'লে উঠলেন, "অ্যাঁ, কি বলছ? হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।"

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, "কোন্ বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে না?"

বিনয়বাবু বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঠিক যেন নৃত্য করতে করতেই বললেন, "লস্ট্ আটলান্টিস্! লস্ট্ আটলান্টিস!"

বিমল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, "রামহরি, বিনয়বাবুকে ধর! ওঁর কি ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

বিনয়বাবু আরো চেঁচিয়ে বললে, "ওহো, লস্ট্ আটলান্টিস্! লস্ট্ আট্‌লান্টিস্! ফাউণ্ড অ্যাট্‌লাস্ট!"

কুমার সভয়ে বললে, "কি সর্বনাশ! বিনয়বাবু কি শেষটা সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন?"

বিমল তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর তুই হাত চেপে ধ'রে বললে, "লস্ট্ আটলান্টিস্ কি বিনয়বাবু?"

—"লস্ট্ আটলান্টিস্! বিমল, তোমাদের যদি সামান্য কিছু ইতিহাসও পড়া থাকত, আমাকে তা'হলে পাগল মনে করতে পারতে না! জানো নির্বোধ ছোকরার দল, আমরা আজ এক অমূল্য আবিষ্কারের পরে আবার আর এক অসম্ভব আবিষ্কার করেছি? ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষ আর লস্ট্ আটলান্টিস্!"

বিমল বললে, "কি মুশকিল, লস্ট্ আটলান্টিস্ পদার্থটা কি, আগে সেইটেই বলুন না!"

"—লস্ট্ আটলান্টিস্ মানে 'আটলান্টিস্' নামে একটা হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ! যখন সভ্য ভারতবর্ষ ছিল না, সভ্য মিশর ছিল না, বাবিলন ছিল না, গ্রীস-রোম ছিল না, আটলান্টিস্ উঠেছিল তখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে! আজ সেই আটলান্টিস্ হারিয়ে গিয়েছে, আর পণ্ডিতেরা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছেন! সেই মহাদেশেরই নাম থেকে নাম পেয়েছে

আটলান্টিক মহাসাগর। ওহো কী আনন্দ! আমরা আজ সেই কতকালের হারানো মহাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছি—আমরা তাকে আবার খুঁজে পেয়েছি! আমরা যখন এখান থেকে স্বদেশে ফিরে যাব, তখন সারা পৃথিবীর পণ্ডিতেরা আমাদের মাথায় তুলে নৃত্য করবেন!"

বিমল বললে, "সেই আনন্দে আপনি কি এখন থেকেই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন? কিন্তু বিনয়বাবু, এই দ্বীপের উপরটা মাইল পাঁচ ছয়ের বেশি নয়, আর ভিতরটা না-হয় ধরলুম আরো-কিছু বড়! একেই কি আপনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার মতন একটা মহাদেশ বলতে চান?"

বিনয়বাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "বিমল, তুমি হ'চ্ছ একটা মস্ত-বড় আস্ত হস্তী-মূর্খ! কেবল গোঁয়ার্তুমি করতেই শিখেছ, তোমাকে বোঝানো আমার সাধ্যের বাইরে।"

কুমার মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে দেখতে দেখতে উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "বিমল প্রস্তুত হও! লস্ট্ আটলান্টিস্ চুলোয় যাক্। ওদের সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে।"

সেই পাথরের বারান্দার ধারে গিয়ে বিমল দেখল, সংকীর্ণ সিঁড়ির ধাপগুলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় দেড়-শো ফুট নিচে নেমে গিয়েছে—সেই ধাপের সার অবলম্বন ক'রে নিচে নামবার কথা মনে হ'লেও মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু সেই সিঁড়ি বয়েই একে একে লোকের পর লোক উপরে উঠে আসছে এবং সোপান-শ্রেণীর তলাতেও হাজার লোক তাদের পিছনে পিছনে আসবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। শত্রুদের সম্মিলিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায়!

বিমল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বেশ শান্ত ভাবেই বললে, "কুমার, আমরা এখানে নির্ভয়েই থাকতে পারি। ওরা নিশ্চয়ই বন্দুককে চেনে না। ওরা জানে না, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমরা যদি গোটা-চারেক বন্দুক ছুঁড়তে থাকি, তাহলে ওদের পাঁচ লক্ষ লোককেও অনায়াসে বাধা দিতে পারি।"

পাতাল-রাজ্যের সৈনিকরা তখন সিঁড়ির দুই-তৃতীয়াংশ পার হয়ে এসেছে—তাদের কেউ করছে সোনার বর্শা আস্ফালন, কেউ ছুঁড়ছে ধনুক থেকে তীর।

বিমল বললে, "কিন্তু ওরা যদি কোন গতিকে একবার উপরে উঠতে পারে, তাহলে আমাদের আর বাঁচোয়া নেই। তা'হলে কালকেই ওদের দেবতার পায়ের তলায় আমাদের কাটা-মুণ্ডুগুলো ভাঁটার মত গড়াগড়ি যাবে। সুতরাং ওদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা না দিয়ে উপায় নেই।···সেপাই।"

সেপাইরা বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিনয়বাবু ব্যস্তভাবে দৌড়ে গিয়ে বললেন, "বিমল, বিমল, তুমি ওদের উপরে গুলি ছুঁড়বে? বল কি। ওরা যে অদ্ভুত এক প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা!"

বিমল রুক্ষ স্বরে বললে, "রাখুন মশাই আপনার প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা! আপনি কি বলতে চান, ওরা নির্বিবাদে এখানে এসে আমাদের এই আধুনিক মানবজাতির নমুনাগুলিকে দুনিয়া থেকে লুপ্ত ক'রে দিক্? মাপ্ করবেন, এতটা উদার হ'তে পারব না। আটজন নাবিককে ওরা কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে, আপনি কি তা শোনেন নি—না—তাদের ছিন্নমুণ্ড দেখেন নি?"

বিনয়বাবু ম্লানমুখে নিরুত্তর হ'লেন।

বিমল বললে, "সেপাই! তোমরা পাঁচজন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াও। পাঁচজনেই একবার ক'রে বন্দুক ছোঁড়ো। তারপরেও যদি ওরা উপরে উঠতে চায়, তাহ'লে আবার পাঁচজন বন্দুক ছুঁড়বে!"

সেপাইরা যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

আগেই বলেছি, সেই সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি দুজন উঠতে বা নামতে কষ্ট হয়। শত্রুরাও একসারে একজন ক'রে উপরে উঠে আসছিল। তখন প্রায় একশো-জনেরও বেশি লোক সেই অতি-সংকীর্ণ সুদীর্ঘ সোপানকে অবলম্বন করেছে। বিমলদের ভয় দেখাবার জন্যে তারা কেবল হৈ-হৈ শব্দ নয়—অনেক রকম ভীষণ মুখভঙ্গি করতেও ছাড়ছে না।

বিমল দুঃখিতভাবে মৃদু হেসে বললে, "বোকারা জানে না, মূর্তিমান যমের দলকে ওরা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। আটজন নিরস্ত্র নাবিককে বধ ক'রে ওদের বুক ফুলে গেছে।...নাঃ, আর উঠতে দেওয়া নয়। সেপাই, 'ফায়ার'!"

একসঙ্গে পাঁচটা বন্দুক ভীষণ শব্দে ধমক দিয়ে উঠল।

পর-মুহূর্তেই যা ঘটল, তা ভয়াবহ! সব-উপরের তিনজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিচের লোকগুলোর উপরে ছিট্‌কে পড়ল এবং তার পরেই দেখা গেল এক অসহনীয় ভীষণ দৃশ্য। হাজার হাজার কণ্ঠের সুদীর্ঘ ভীত আর্তনাদের মধ্যে, সেই অতি-উচ্চ অতি-সংকীর্ণ সোপানশ্রেণী থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ-জন লোক উপরের পড়ন্ত দেহগুলোর ধাক্কা সামলাতে না পেরে সিঁড়ির বাইরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল এবং তারা যখন অনেক নিচের মাটিতে গিয়ে পৌঁছলো, তখন তাদের দেহগুলো পরিণত হ'ল ভয়াবহ রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে। উপরের লোকদের অবস্থা দেখে নিচের সিঁড়ির

লোকেরা কোনরকমে দেওয়াল ধ'রে বা বেগে নেমে প'ড়ে এ-যাত্রা আত্ম-রক্ষা করলে।

বিনয়বাবু মাটিতে ব'সে প'ড়ে দুই কানে হাত-চাপা দিয়ে কাতর স্বরে বললে, "আর সইতে পারি না—আর আমি সইতে পারি না। বিমল, থামো, থামো!"

বিমল অটলভাবে বললে, "এখনো নিচের ভিড় কমে নি, এখনো অনেকে আস্ফালন করছে, এখনো সুবিধে পেলে ওরা উপরে ওঠবার চেষ্টা করতে পারে। ওদের চোখ আর একটু ফুটিয়ে দেওয়া যাক্, নরবলি দেওয়ার মজাটা ওরা টের পাক্।...শোনো সেপাইরা, তোমরা সবাই মিলে এবার নিচের ঐ ভিড়ের উপরে একবার গুলিবৃষ্টি কর তো।"

গ'র্জে উঠল এবার একসঙ্গে চব্বিশটা বন্দুক সেই প্রকাণ্ড গুহা-জগৎকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে। নিম্নে সমবেত ভিড়ের ভিতরে পাঁচ-ছয়জন লোক তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার কণ্ঠের ভয়-বিস্ময়পূর্ণ তীব্র ও উচ্চ আর্তস্বরে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মিনিট-পাঁচেক পরে দেখা গেল সেই বিপুল জনতা যেন কোন মায়াবীর মন্ত্রগুণে কোথায় অদৃশ্য!

বিমল বললে, "ব্যাস্। বন্দুক যে কি চীজ্, এইবারে ওরা বুঝে নিয়েছে।—সিঁড়ির উপরে বোধ হয় কেউ আর পা ফেলতে ভরসা করবে না।"

বিনয়বাবু যন্ত্রণা-ভরা স্বরে বললেন, "এ তো যুদ্ধ নয়, এ যে হত্যা! আমরা সবাই হত্যাকারী।"

বিমল বললে, "কি করব বিনয়বাবু, আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম!"

আরক্ত মুখে তীব্র কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "হুঁ, আত্মরক্ষাই বটে! চমৎকার আত্মরক্ষা! আমরা হচ্ছি লোভী দস্যু। ওরা কি আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে? আমরাই ত পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছি ওদের সোনার দেশ লুণ্ঠন করতে—একটা প্রাচীন জাতিকে ধ্বংস করতে। ছি, ছি, ঘৃণায় অনুতাপে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে! ধিক

আমাদের!

তখন বিমলের খেয়াল হ'ল—সত্যই তো, পরের দেশ আক্রমণ করেছে এসে তারা তো নিজেরাই। সুতরাং তাদের বিদেশী শত্রু ব'লে বাধা দেবার বা বধ করবার অধিকার যে এই পাতালবাসীদের আছে, সে-বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই! তখন সে লজ্জিতভাবে বললে, "বিনয়-বাবু, আমি মাপ চাইছি। লস্ট্ আটলান্টিস্ সম্বন্ধে আপনি কি জানেন বলুন। যদি বুঝি ওরা সত্যই কোন প্রাচীন সভ্য জাতির শেষ বংশধর, তাহ'লে ওদের বিরুদ্ধে আমি আর একটিমাত্র আঙুলও তুলব না, এখনি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজে গিয়ে উঠব।"

—"প্রতিজ্ঞা করছ?"

—"প্রতিজ্ঞা করছি।"

তখন শিখরের মুখ থেকে সূর্যালোক ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিচে থেকে অদৃশ্য হয়েছে পাতাল-রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের চিত্রমালা। বাইরে শূন্যে আলোকোজ্জ্বল নীলিমাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গুহার ভিতরে ঘনিয়ে এসেছে নিশীথের প্রথম অন্ধকার। সে-অন্ধকারের ভিতরে পাতালপুরীর কোন ভীত হস্ত আজ একটিমাত্র প্রদীপও জ্বাললে না এবং সর্বত্রই থম্‌থম্ করতে লাগল একটা অস্বাভাবিক বুক-চাপা নিস্তব্ধতা।

কুমার বললে, "সেপাইরা। আজকের রাতটা আমাদের এইখানেই কাটাতে হবে। লণ্ঠনগুলো সব জ্বেলে রাখো, আর সিঁড়ির উপর-ধাপে পালা ক'রে চারজন লোক ব'সে সকাল পর্যন্ত পাহারা দাও। খুব হুঁশিয়ার থেকো, নইলে সবাইকে মরতে হবে।"

বিমল বিনয়বাবুর সামনে ব'সে পড়ে বললে, "এখন বলুন আপনার লস্ট্ আটলান্টিসের গল্প।"

বিনয়বাবু বললেন, "শোনো! কিন্তু জেনো, এটা গল্প নয়, একেবারে নিছক ইতিহাস। বড় বড় পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত যা আবিষ্কার বা প্রমাণ করেছেন, আমি সেই কথাই তোমাদের কাছে বলতে চাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

লস্ট্ আটলান্টিসের ইতিহাস

ধর, এগারো বা বারো বা তের হাজার বছর আগেকার কথা। যা বলব তা এত পুরানো কালের কথা যে, দু-এক হাজার বছরের এদিক-ওদিক হ'লেও বড়-কিছু এসে যায় না। ঐ-সময়েই আটলান্টিস্ সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারও কত কাল আগে যে এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে-কথা আর কেউ বলতে পারবে না।

যে-সব পুরানো জাতি সভ্য ছিল ব'লে আজ পুরাণে বা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, সেই মিশরী, ভারতীয়, চৈনিক, বাবিলনীয়, পার্সী ও গ্রীক জাতির নাম তখন কেউ জানত না, অনেক জাতির জন্ম পর্যন্ত হয় নি।

ক্রো-ম্যাগ্নন্ প্রভৃতি সত্যিকার আদি মানুষজাতেরা যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছে, তখন পৃথিবীর চেহারা ছিল একেবারে অন্যরকম। আধুনিক খুব ভালো ছাত্ররাও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর ম্যাপ দেখলে কেলাসের 'লাস্ট্-বয়ের' মতন বোকা ব'নে যাবে।

তখন রেলগাড়ি থাকলে একবারও জল না ছুঁয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ডাঙা দিয়ে আনাগোনা করা যেতে পারত। এমন-কি মাঝে মাঝে দু-একটা প্রণালী পার হবার জন্যে দু-একবার মাত্র ছোট ছোট নৌকায় চ'ড়ে ভারতবাসীরা ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে পদব্রজেই অনায়াসে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হ'তে পারত। তখন সিংহল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি এবং আমরা—অর্থাৎ বাঙালীরা আজ যেখানে বাস করছি সেই বাংলাদেশের উপর দিয়ে বইত অগাধ সমুদ্রের জলতরঙ্গ। বাঙালী জাতেরও জন্ম হয় নি।

ইউরোপে তখন ভূমধ্যসাগর ছিল না, তার বদলে ছিল দুটি ভূমধ্যবর্তী

হ্রদ। ইতালী ছিল আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ আফ্রিকা ও ইউরোপ ছিল পরস্পরের অঙ্গ—একই মহাদেশ। এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর ফ্রান্স ছিল অভিন্ন।

আটলান্টিস্ সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল আফ্রিকা ও আমেরিকার মাঝখানে। এক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোর মতে, এশিয়া, এশিয়া-মাইনর ও লিবিয়াকে এক করলে যত বড় হয় এই দ্বীপটি আকারে তত বড়ই ছিল। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে কিছু ছোট।

আটলান্টিসের উল্লেখ আধুনিক কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। তার কারণ, যেখান থেকে আধুনিক ইতিহাসের আসল মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই মিশর ও গ্রীস যখন সভ্য তখনও আটলান্টিসের অস্তিত্ব ছিল না। মিশর ও গ্রীস সভ্য হবার কয়েক হাজার বছর আগেই পৃথিবী থেকে আটলান্টিস্ হয়েছে অদৃশ্য। কিন্তু তখন আটলান্টিসের বহু বাসিন্দা স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই লোকের মুখে মুখে ও জনপ্রবাদে আটলান্টিসের অনেক কাহিনীই তখন সারা-পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। আজ আমরা তার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছি বটে, কিন্তু প্রাচীন মিশর ও গ্রীসের লোকেরা এই লুপ্ত আটলান্টিসের অনেক খবরই জানত।

গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোর বিখ্যাত বর্ণনা থেকে জানা যায়, আটলান্টিস্ দ্বীপ ছিল অসংখ্য লোকের বাসভূমি। তার নগরে ছিল শত শত অট্টালিকা, বিরাট স্নানাগার, বৃহৎ মন্দির, অপূর্ব উদ্যান, আশ্চর্য সব খাল ও বিচিত্র সব সেতু প্রভৃতি। একটি খাল ছিল তিন শো ফুট চওড়া, একশো ফুট গভীর ও ষাট মাইল লম্বা। তার তীরে তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর এবং তার ভিতর দিয়ে আনাগোনা করত বড় বড় জাহাজ। একশো ফুট চওড়া সাঁকোরও অভাব ছিল না।

মন্দির ছিল শত শত ফুট উঁচু এবং সেই অনুপাতেই চওড়া। মন্দিরের চুড়ো ছিল সুবর্ণময় এবং বাহিরের দেয়ালগুলো রৌপ্যময়। মন্দিরের ভিতরের অংশও সোনা, রূপা ও হাতির দাঁতে মোড়া ছিল। তাদের মধ্যে

ছিল খাঁটি সোনায় গড়া মূর্তির ছড়াছড়ি!

শহরের পথে পথে দেখা যেত গরম জলের উৎস এবং ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা। রাজপরিবার, সাধারণ পুরুষ, নারী এমন কি অশ্ব প্রভৃতি পালিত পশুদেরও জন্যে ছিল আলাদা আলাদা স্নানাগার! নানা জায়গায় বড় বড় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আটলান্টিসের মধ্যে পবিত্র জীবরূপে গণ্য হ'ত ষণ্ডরা। এবং আটলান্টিস্‌কে রক্ষা করবার জন্যে নিয়মিত মাহিনা দিয়ে পালন করা হত যাট হাজার সৈন্যকে।

প্লেটো বলেন, কিন্তু আটলান্টিসের অধিবাসীরা নাকি ঐশ্বর্যের ও শক্তির গর্বে অত্যাচারী, অবিচারী ও মহাপাপী হয়ে উঠেছিল—শেষটা আর ধর্মের শাসন মানত না। সেইজন্যে দেবতারাও তাদের উপরে বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে দেবতার ক্রোধে আচম্বিতে সমুদ্র সংহার-মূর্তি ধরে এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যেই সমগ্র আটলান্টিস্‌কে গ্রাস করে ফেললে।

এটা হচ্ছে রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হবার নয় হাজার বছর আগেকার ঘটনা।

প্লেটোর বর্ণনা যুগে যুগে বহু লোককে কৌতূহলী করে তুলেছিল বটে, কিন্তু আগে সকলেই ভাবতেন, তাঁর আটলান্টিস্ হচ্ছে কাল্পনিক দেশ।

মিশর, বাবিলন, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশের পুরানো সভ্যতা আজ অতীতের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের অগুন্তি চিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে। আটলান্টিসের অস্তিত্বের চিহ্ন কোথায়? এই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের যুক্তি। কিন্তু ওঁরা ভুলেও একবার ভাবেন না যে, ও-সব দেশ আটলান্টিসের মত মহাসাগরের কবলগত হয় নি। কত যুগ-যুগান্তের আগে সে সভ্যতা অতল জলে ডুবে পড়েছে, আজ তার চিহ্ন পাওয়া যাবে কেমন করে?

কিন্তু এখানকার অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ, প্লেটোর আটলান্টিস্‌কে আর অলস কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন না। তাঁরা বহু পরিশ্রম

ও অনুসন্ধানের ফলে আটলান্টিসের অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন, এখানে সে-সমস্ত কথা বলবার সময় হবে না। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যদি তোমাদের আগ্রহ থাকে, তা'হলে অন্তত Lewis Spence সাহেবের The History of Atlantis নামে বই-খানা পড়ে দেখো।

একালের পণ্ডিতদের মত, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কাছে আট-লান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কেনারী, অজোর্স ও মেডিরা প্রভৃতি যে-সব দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়, ওগুলি হচ্ছে জলমগ্ন আটলান্টিসেরই সর্বোচ্চ অংশবিশেষ।

ফ্রান্সের Pierre Terminer (Director of Science of the Geographical Chart of France) সাহেব বলেন, পূর্বোক্ত দ্বীপ-গুলির কাছে আটলান্টিক মহাসাগর এখনো অশান্ত হয়ে আছে। ওখানে যে-কোন সময়ে পৃথিবীর আর সব দেশের অগোচরে ভীষণ জলপ্লাবন বা খণ্ডপ্রলয় হবার সম্ভাবনা এখনো আছে। সুতরাং আটলান্টিস্ ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে প্লেটো যা যা বলেছেন তা অসম্ভব মনে করা চলে না।

তোমাদের কাছে আমি আগেই বলেছি যে ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইউরোপে গিয়ে হাজির হয়েছিল, আর্যদের বহু সহস্র বৎসর আগে। এ-বিষয়ে সব পণ্ডিতই একমত।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, বারংবার খণ্ডপ্রলয় বা সামুদ্রিক বন্যায় আটলান্টিস্ যখন ক্রমে ক্রমে পাতাল-প্রবেশ করছিল, তখন সেখানকার অসংখ্য বাসিন্দা আত্মরক্ষা করবার জন্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ও আমেরিকায় পালিয়ে যায়। ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মতন জায়গায় কেমন ক'রে এসে আবির্ভূত হয়েছিল, এ-সম্বন্ধে সদুত্তর পাওয়া যায় না। ওদের উৎপত্তির ইতিহাস আগে ছিল রহস্যময়। কিন্তু এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, তারা আটলান্টিসেরই পলাতক সন্তান। কারণ আটলান্টিস্ দ্বীপ ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারই প্রতিবেশীর মত।

Donelly Brasseur be Bourbourg ও Augustas La

plongeon সাহেবরা বলেন—"অতীত যুগে আটলান্টিস্ তার সন্তান-গণকে সারা পৃথিবীর সর্বত্রই পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাদের অনেকেই আজ আমেরিকায় 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামে বিচরণ করছে। তারা প্রাচীন মিশরে গিয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। তারা উত্তর এশিয়ায় গিয়ে তুরাণী ও মঙ্গোলিয়ান নামে পরিচিত হয়েছে।" (Some Notes on the Lost Atlantis : Papyras : March, 1921.)

বিমল, কুমার, কমল! তোমরা সকলেই দেখছ, আজ আমরা যেখানে এসে হাজির হয়েছি, প্লেটো আর অন্যান্য পণ্ডিতদের বর্ণনার সঙ্গে এর কতটা মিল আছে? অদ্ভুত খাল, সেতু, প্রাসাদ, মন্দির, সোনা-রূপার ছড়াছড়ি! এমন-কি পবিত্র ষণ্ড ও ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষদেরও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি! হারা আটলান্টিস্ যে এইখানকার সমুদ্রের ভিতরেই লুকিয়ে আছে, পণ্ডিতরা আগে থাকতেই তা আমাদের ব'লে রেখেছেন। এখনো কি তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সমগ্র আটলান্টিসের সামান্য অংশই আমরা দেখতে পেয়েছি। আসল দেশটা যখন ডুবে যায়, তখন এই আশ্চর্য আর অসাধারণ গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়ে কয়েক শত লোক প্রাণরক্ষা করেছিল। তাদের বংশধররা আজ হাজার হাজার বৎসর ধ'রে এই ক্ষুদ্র পাতাল-রাজ্যের মধ্যে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে, আর প্রাচীন অবিকৃত সভ্যতার প্রদীপ-শিখাটি এতদিন ধ'রে কোন রকমে জ্বালিয়ে রেখেছে। দ্বীপের উপরে যে-সব বিভীষণ, অতিকায় প্রস্তর-মূর্তি দেখেছ, তাদের বয়স হয়তো পনেরো-বিশ হাজার বৎসর। তারা সেই স্মরণাতীত কাল আগেকার অত্যাচারী নিষ্ঠুর আর এখানকার তুলনায় অর্ধসভ্য মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে—তাদের মৌখিক ভাবের সঙ্গে তাই আধুনিক মানুষের মার্জিত মুখের ছবি মেলে না।

আটলান্টিসের যে-সব সন্তান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রস্থান করেছে, বিভিন্ন যুগের মানুষ আর বিভিন্ন সভ্যতার সংশ্রবে এসে তারা এখন নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে তাই আজ আর তাদের চেনা যায়

না। কিন্তু এই পাতাল-রাজ্যের বাসিন্দারা সেই প্রাচীন সভ্যতারই খাঁটি নিদর্শন অবিকল ভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই বললেও চলে। কেবল মাঝে মাঝে—হয়তো যুগ-যুগান্তর পরে—সমুদ্রের জল স'রে গেলে তারা ব্রোঞ্জের দরজা খুলে দ্বীপের উপরে এসে বাইরের জগৎকে বহুকাল পরে ফিরে পাওয়া বন্ধুর মত এক-একবার চোখ মেলে প্রাণ ভ'রে দেখে নেয়। এমন ভাবে কোন-একটা জাতি যে হাজার হাজার বৎসর ধ'রে বাঁচতে পারে, সেটা ধারণাই করা যায় না। কিন্তু এই ধারণাতীত ব্যাপারটাও সম্ভবপর হয়েছে। চোখের সামনে যাকে দেখছি তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই!

আমরা ভাগ্যবান, তাই এমন বিচিত্র দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পেলুম—পাতালবাসী অতীতকে পেলুম জীবন্ত রূপে বর্তমানের কোলে! এখানকার মানুষদের উপর আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত—কারণ এদেরই সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত-সভ্যতার অগ্রদূত। এরা আমাদের কোন অপকার করে নি। তবে এমন-একটা দুর্লভ প্রাচীন জাতির উপর আমরাই বা অত্যাচার করব কেন?

জানি, আমাদের হাতে যে অস্ত্র আছে তার সাহায্যে আমরা এখনি এই বেচারাদের সবংশে ধ্বংস করতে পারি—এখানকার ধনদৌলত লুটে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় রাজা-মহারাজারও চোখে তাক লাগিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা'হলে আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকবে? আরসিতে আমরা নিজেদের কাছেই কি আর নিজেদের কালো মুখ দেখাতে পারব?

বিমল! আমাদের উচিত, কাল সকালেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া। দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, আমাদের এমন অসাধারণ আবিষ্কারের খবরও পৃথিবীতে প্রচার করতে পারব না। কারণ তাহলে এই অসহায় সোনার দেশ লুণ্ঠন করবার লোভে পৃথিবীর চারিদিক থেকে দলে দলে দস্যু ছুটে আসবে।

বিনয়বাবু চুপ করবার পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা কইলে না।

তখন শিখরের ফাঁকে ফুটে উঠেছে রাতের কালো রং মাখানো

আকাশের গায়ে তারকাদের আলোর আল্পনা। শিখরের মুখের কাছে অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু ভিতরের চারিদিকেই অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে সুকঠিন হয়ে উঠেছে!

কমল একবার উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, নিস্তব্ধ পাতাল-পুরীর এদিকটাও অন্ধকারের ঘেরাটোপে ঢাকা, কেবল দূরে—বহুদূরে মাঝে মাঝে নিবিড় তিমির-পট ফুটো ক'রে এক-একটা মিটমিটে আলোকশিখা দেখা দিচ্ছে। জীবনের কলঝঙ্কার এখানে যেন একান্ত ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। কেউ কোথাও ক্ষীণ স্বরে কাঁদবার প্রয়াসও করছে না!

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনার কথাই ঠিক। এই প্রাচীন জাতির উপরে অত্যাচার করা মহাপাপ, আমরা যে ধারণাতীত অপূর্ব দৃশ্য দেখবার আর নূতন জ্ঞানলাভ করবার সৌভাগ্য পেলুম, সেইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার। আমরা দস্যু নই—কাল সকালেই এখান থেকে বিদায় নেব।"

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এখানকার ভিতরের যা-কিছু জানবার, জেনে নি। কিন্তু এ ইচ্ছা বোধ হয় আর সফল হওয়া অসম্ভব, এরা আর আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।"

পরদিন প্রভাতে উঠে বিমল দেখলে, তখনও পাতালপুরীর রাজপথে জনমানবের দেখা নেই। সরোবরের দুইধারে সেই সোনার ও রূপার গম্বুজ-ওয়ালা দুখানা অট্টালিকার প্রত্যেক জানলা-দরজা বন্ধ, কোথাও একজন সৈনিক পর্যন্ত বাইরে এসে দাঁড়ায় নি।

যে অট্টালিকাকে তারা রাজবাড়ি বলে সন্দেহ করছে, তার চারি-পাশে প্রায় চল্লিশ-ফুট উঁচু দৃঢ় পাথরের প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরটা এমন চওড়া যে তার উপর দিয়ে পাশাপাশি দুইজন লোক অনায়াসেই হেঁটে চ'লে যেতে পারে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে এক-একখানা ঘর—বোধহয় সৈনিকদের থাকবার জন্যে। দুটো প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, তার ভিতর দিয়ে

হাওদাসুদ্ধ হাতিও ঢুকতে পারে। সিংহদ্বারের পাল্লাও পুরু ব্রোঞ্জে তৈরি।

কুমার বললে, "এই রাজবাড়িকে কেল্লা বললেও ভুল হয় না। যেখানে বাইরের শত্রুর ভয় নেই, সেখানে রাজবাড়িকে এমনভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে কেন ?"

বিমল বললে, "মানুষ তো কোথাও নিরীহ জীবন যাপন করতে পারে না। বাইরের শত্রু নেই বটে, কিন্তু জাতি-বিরোধ প্রজা-বিদ্রোহ তো থাকতে পারে ? রাজা তখন আশ্রয় নেন এই পাঁচিলের পিছনে।"

আচম্বিতে উপরে গুহার বাহির থেকে কারা একসঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

বিমল চম্‌কে মুখ তুলেই শুনলে, কে চেঁচিয়ে ইংরাজীতে বলছে, "আরো আরো, বাঙালী-বাবুরা যে দরজা ভেঙে আমাদের জন্যে সাফ্ ক'রেই রেখে গেছে।"

প্রথমটা সকলেই ভেবেছিল যে, পাতালবাসীরা হয়তো অন্য কোন পথ দিয়ে গুহার উপরে উঠে আবার তাদের আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু ওদের স্পষ্ট ও আধুনিক ইংরেজী ভাষা শুনে বেশ বোঝা গেল, ওরা এই পাতালের বাসিন্দা নয়। তবে কি এখানকার খবর বাইরের লোকও জানে?

উপর-অংশের সিঁড়িটার চারিদিকে দেয়ালের আবরণ ছিল ব'লে কারুকে দেখা গেল না, কিন্তু কারা যে খট্ খট্ জুতোর শব্দ ক'রে গুহার স্তব্ধতা ভেঙে নিচে নামছে এটা বেশ স্পষ্টই শোনা গেল।

কে এরা। নিচে নামে কেন ?

আর একজন কে চেঁচিয়ে বললে, "গোমেজ, তোমার আলোটা একটু তুলে ধরো। এখানে পা ফস্‌কালে সোজা নরকে গিয়ে হাজির হব।"

গোমেজ······গোমেজ ? এবং তার দলবল ? এ কী অসম্ভব ব্যাপার।— বিমল হতভম্বের মত কুমারের মুখের পানে মুখ ফেরালে।

গোমেজ তো এখন 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড'-এর ডিটেক্‌টিভদের পাল্লায়, কিংবা লণ্ডনের জেলখানায়। সে কোন্ যাদুমন্ত্রে পুলিশ, কারাগার ও আটলান্টিক মহাসাগরকে ফাঁকি দিয়ে এই শৈলদ্বীপে এসে হাজির হয়েছে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খণ্ডপ্রলয়

জুতো-পরা ভারি ভারি পায়ের আওয়াজ ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছে।

হঠাৎ কুমারের চোখ প'ড়ল সিঁড়ির পাশের গুহাটার দিকে—কাল যেখান থেকে শত্রু বেরিয়ে তাকে আক্রমণ ক'রেছিল। সে তাড়াতাড়ি বললে, "বিমল, মিথ্যে আর রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে লাভ নেই। এস, আমরা ঐ গুহাটার ভিতরে ঢুকে পড়ি। বোধ হচ্ছে ওখানে আমাদের সবাইকার জায়গা হবে।"

বিমল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সেপাইদের সেই গুহার ভিতরে ঢুকবার জন্যে ইঙ্গিত করলে। আধ-মিনিটের মধ্যেই জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেল। এমন কি, চালাক বাঘা পর্যন্ত সে ইঙ্গিত বুঝতে একটুও দেরি করলে না।

গুহার মুখে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে বিমল ও কুমার শুনতে পেলে পায়ের শব্দগুলো একে একে বারান্দায় এসে নামছে।

তারপরে চমৎকৃত কণ্ঠে একজন বললে, "হে ভগবান্! এ কী দেখছি!"—এটা হচ্ছে গোমেজের গলা।

আর একজন বললে, "আশ্চর্য, আশ্চর্য। পৃথিবীতে এমন ঠাঁই থাকতে পারে!"

আর একজন বললে, "মাথার উপরে আলোর ঝর্না। পাহাড়ের মাঝখানে অনন্ত গুহা। তার মধ্যে বিশাল স্বপ্ন-শহর। সোনার গম্বুজ—রূপোর গম্বুজ—সোনা-রূপোর সাঁকো!"

গোমেজ বললে, কোথাও জনপ্রাণী নেই, কারুর সাড়াও নেই। আমরা কি রূপকথার সেই Sleeping Beauty-র দেশে এসে পড়লুম? এখানেও

কি কোন রাজকন্যা এক শতাব্দীর ঘুমে অচেতন হয়ে আমাদের জন্যে সোনার খাটে শুয়ে আছে ?"

আর একজন বললে, "এখন তোমার কবিত্ব রাখো গোমেজ ! এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা আমার ভালো লাগছে না।"

কে একজন হঠাৎ সচকিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "কী ভয়ানক ! কী এটা ? ভূত, না মানুষ, না জন্তু ?...অ্যাঁ ! এ যে দেখছি ম'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে ! বুকে বুলেটের দাগ !"

গোমেজ বললে, "এ সেই বাঙালী-বাবুদের কাজ ! কিন্তু তারা গেল কোথায়, আমি যে তাদের জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাই।"

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ ! নিচেও কত মরা লোক প'ড়ে রয়েছে !"

গোমেজ বললে, "দেখছি এখানে ছোটোখাটো একটা লড়াই হয়ে গেছে। কিন্তু বাবুদের তো কোনই পাত্তা নেই ! আমাকে ফাঁকি দিয়ে তারা আগেই পটল তুলে ফেললে নাকি ? না, বন্দুকের বিক্রম দেখিয়ে এখানকার লোকদের তারা বশ ক'রে ফেলেছে ?"

অন্য একজন বললে, "চল আমরা নিচে নেমে যাই। এ দেশ আমরা দখল করবই। যদি কেউ বাধা দেয় তাকে যমালয়ে পাঠাব। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে !"

সকলেই একসঙ্গে হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে ব'লে চেঁচিয়ে উঠল—তারপরেই আবার নিচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

বিমল উঁকি মেরে দেখে নিলে, তাদের দলেও চব্বিশ-পঁচিশ জন লোক আছে এবং সকলেরই হাতে বন্দুক।

পায়ের শব্দগুলো যখন মিলিয়ে গেল বিমল তখন আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আর আমি ওদের কেয়ার করি না। ওরা যখন ঐ সরু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে, তখন ওদের তো আমাদের হাতের মুঠোর ভেতরেই পেয়েছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কাল আমরা সমুদ্রে এদেরই জাহাজ দেখেছিলুম।"

কুমার বললে, "হুঁ"। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গোমেজ বিলাতী পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পেরেছে।"

বিমল বললে, "আরো একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। গোমেজ অসাধারণ কাজের লোক। এর মধ্যেই সে নতুন দল বেঁধে জাহাজ জোগাড় ক'রে প্রায় আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে হাজির হয়েছে। গোমেজের বাহাদুরি আছে।"

কমল বললে, "বোধহয় ওদের জাহাজখানা আমাদের চেয়ে দ্রুতগামী।"

—"সম্ভব। কিন্তু তাহ'লেও গোমেজের বাহাদুরি কম নয়। এখন চল, বেরিয়ে দেখা যাক্, নিচে আবার কি কাণ্ড বাধে। ওদের আর ভয় করবার দরকার নেই—সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ওরা নিজেদেরই মৃত্যু-ফাঁদে পা দিয়েছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু বিমল, আর এখানে হানাহানি ক'রে আমাদের লাভ কি? এই ফাঁকে মানে মানে আমরা স'রে পড়ি না কেন?"

বিমল তিরস্কার-ভরা কণ্ঠে বললে, "সে কি বিনয়বাবু! এই দস্যুদের কবলে সমস্ত দেশটাকে সমর্পণ ক'রে? গোমেজ কি-জন্যে এখানে এসেছে জানেন না? লুঠ করতে, হত্যা করতে, অত্যাচার করতে! আমরা বাধা দেব না,—বলেন কি!"

বিনয়বাবু ব'লে উঠলেন, "ঠিক বলেছ। আমার মনে ছিল না। হ্যাঁ, ওদের থেকে এই দেশকে রক্ষা করা চাই-ই!"

সবাই ছুটে বাইরে এল। বারান্দার ধারে গিয়ে হেঁটে হয়ে দেখলে, গোমেজ তার দলবল নিয়ে সরোবরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু তখনও পাতালপুরী তেমনি নিস্তব্ধ, কোথায় একটা প্রাণীরও দেখা নেই। শিখরের মুখে সূর্যের কিরণোৎসবের ঘটা যতই বেড়ে উঠছে, ততই বেশি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাতালপুরের দৃশ্যবৈচিত্র্য।

গোমেজ সদলবলে আগে আগে রাজ-প্রাসাদের দিকে গেল। কিন্তু সমস্ত প্রাসাদ-প্রাচীর প্রদক্ষিণ ক'রেও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পেলে না। তারা তখন একটা বাগানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'ল সেই স্বর্ণ-

রৌপ্যময় আশ্চর্য সেতুর দিকে।

আচম্বিতে কোথায় তীব্র সুরে একটা ভেরীর শব্দ শোনা গেল এবং পর-মুহূর্তেই ঠিক যেন ভোজবাজির মহিমায় গোমেজ প্রভৃতির চারিপাশে শত শত বিপুলদেহ সৈনিকের মূর্তি হল আবির্ভূত। সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র পাতালরাজ্য আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল! কাছে, দূরে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে যেদিকে চোখ ফেরানো যায়, লক্ষ্যে পড়ে কেবল জনতার পর জনতার প্রবাহ—কেবল বিদ্যুৎ-গতির লীলা—কেবল অগ্নিবৎ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ষার নৃত্য। আর মেঘগর্জনের মতন সে কী গম্ভীর অথচ বিকট চিৎকার!

বিমল প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে উল্লাস-ভরে ব'লে উঠল, "ধন্য ক্রো-ম্যাগ্নন্ মানুষরা, ধন্য! কুমার, এরা কতটা চালাক, বুঝতে পারছ? এরা বন্দুকের ধর্ম ঠিক ধ'রে ফেলেছে! এরা এরি-মধ্যে বুঝে নিয়েছে যে, দূর থেকে বন্দুকধারীদের আক্রমণ করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। তাই এরা আমাদের ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আনাচে-কানাচে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল। ওরা ভয়ে কোথায় পালিয়েছে ভেবে আমরা যদি নিচে নামতুম, তা'হলে আমাদেরও ঠিক এই দশাই হ'ত। বাহবা বুদ্ধি!"

কুমার উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "দেখ বিমল, দেখ! গোমেজের আট-দশ জন সঙ্গী একেবারে পপাত ধরণীতলে। গোমেজরা গুলিবৃষ্টি ক'রে একদিকে পথ ক'রে নিলে। ঐ দেখ, গোমেজরা সোনার সেতুর উপরে গিয়ে উঠল। ওদের দলে এখন মোটে এগারো জন লোক আছে।"

সেতুর ভিতরে খানিকদূরে বেগে ছুটে গিয়ে গোমেজ ও তার সঙ্গীরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে দুই দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল এবং তারপর দুই দিকেই শিলাবৃষ্টির মত গুলিবৃষ্টি করতে লাগল।

মুশকিলে পড়ল তখন পাতালবাসীরা। সেই বৃহৎ জনতা স্বল্প-পরিসর সেতুর ভিতর দিয়ে যথেচ্ছ ভাবে আর এগুতে পারলে না, যারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে তাদেরও অনেকেই হত বা আহত হয়ে সাঁকোর উপরে পড়ে গেল,—বাকি সবাই কেউ ছুটে পালিয়ে এল এবং কেউ বা পড়ল জলে লাফিয়ে।

গোমেজের দল তখন বাইরের জনতার উপরে তুচোখো গুলি চালাতে শুরু করলে,—অধিকাংশ গুলিই ব্যর্থ হল না, লোকের পর লোক মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল এবং আহতদের আর্তনাদে কান পাতা দায় হয়ে উঠল।

কমল বললে, "পাতালবাসীরা আবার পালিয়ে যাচ্ছে—পাতাল-বাসীরা আবার পালিয়ে যাচ্ছে।"

কুমার বললে, "এখন আমাদের কর্তব্য কি?"

বিমল কি বলবার উপক্রম করলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুবার আগেই সকলকার পায়ের তলায় পাথরের বারান্দা তুলে উঠল।

প্রত্যেকেই সবিস্ময়ে নিচের দিকে তাকালে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অদ্ভুত দোল।

তারপরেই সকলে সভয়ে শুনলে, সেই সীমাশূন্য গুহার গর্ত থেকে, সেই মুখ-খোলা শিখরের বাহির থেকে, অনন্ত আকাশ থেকে, সুদূর সমুদ্র থেকে কী এক গম্ভীর ভয়ঙ্কর অনির্বচনীয় শব্দতরঙ্গের পর শব্দতরঙ্গ ছুটে—আর ছুটে—আর ছুটে আসছে! সেই ভৈরব অপার্থিব বিশ্বব্যাপী হুহুঙ্কারের মধ্যে—জলধি-কোলাহলের মধ্যে—ক্ষীণ তটিনীর কলনাদের মত—কোথায় ডুবে গেল বন্দুকের চিৎকার, আহতদের কান্না, জনতার ভয়ার্ত রব! ঘন ঘন তুলছে পাহাড়, ঘন ঘন তুলছে বিমলদের পায়ের তলায় বারান্দা, ঘন ঘন তুলছে সমগ্র পাতালপুরী এবং উপর থেকে ঝরো-ঝরো ঝরছে ছোট-বড় শিলাখণ্ড।

ভয়ে সাদা মুখে বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প! এ-অঞ্চলের সব দ্বীপ আগ্নেয় দ্বীপ—ভূমিকম্প হচ্ছে। পালাও—পালাও।"

সকলে পাগলের মত সিঁড়ির দিকে ছুটল—পাহাড়ের দোলায় সকলেরই পা তখন টল্‌মলিয়ে টলছে। তারপর সেই সংকীর্ণ সিঁড়ি ব'য়ে হুড়োমুড়ি ক'রে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো দেওয়াল ধ'রে কখনো হোঁচট খেয়ে এবং কখনো বা পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গিয়ে তারা যে কেমন ক'রে উপরে উঠে গুহার বাহিরে গিয়ে দাঁড়াল, এ-জীবনে সে-

রহস্য কেউ বুঝতে পারবে না !

বাইরে বেরিয়ে দেখে, সমুদ্রেরও রুদ্রমূর্তি ! তার লক্ষ লক্ষ জলবাহু ঊর্ধ্বে তুলে বারংবার লম্ফের পর লম্ফ ত্যাগ ক'রে জগৎব্যাপী একটা দুর্দান্ত বিভীষিকার মত সে যেন উপরের বিপুল শূন্যতাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে, তার গর্জনে গর্জনে তালে-বেতালে বাজছে যেন বিশ্বের সমস্ত বজ্রের সম্মিলিত কণ্ঠ এবং ফেনায় ফেনায় তার ফুটন্ত টগ্‌বগে জলের নীল রং আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পাহাড় সেখানেও তার জড়তাকে ভুলে জীবন্ত এক অতিকায় দানবের মত ক্রমাগত মাথানাড়া দিচ্ছে !

বিনয়বাবু চিৎকার করলেন, "সমুদ্রের জল বেড়ে উঠছে, শীঘ্র পাহাড় থেকে নেমে পড় !"

ঠিক যেন একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রায় বাহ্যজ্ঞানহারার মতন তারা যখন কোনক্রমে জাহাজে এসে উঠল, দ্বীপের উপরে ভূমি-

কম্প তখন থেমে গেছে বটে, কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে মহাসাগরের তাথৈ-তাথৈ নৃত্য।

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দেখুন বিনয়বাবু, দেখুন! সমুদ্রের জল দ্বীপের প্রায় শিখরের কাছে উঠেছে!"

বিনয়বাবু বললেন, "কত যুগে কতবার ঐ দ্বীপের সঙ্গে সমুদ্র যে এমনি ভয়ানক খেলা খেলেছে, তা কে জানে!"

কুমার বললে, "গোমেজের জাহাজ এখনো এখানে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু গোমেজ তার দলবল নিয়ে আর ফিরে আসবে না!"

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল আকাশ-ফাটানো একটা হাহাকার। যেন হাজার হাজার ভয়ার্ত কণ্ঠ একসঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল তীব্র নিরাশায়।

কমল চম্‌কে বললে, "ও আবার কাদের কান্না?"

কুমার বললে, "শব্দটা যেন ঐ দ্বীপের দিক থেকেই আসছে!"

বিনয়বাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে দ্বীপের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, "বিমল, বিমল! সে ব্রোঞ্জের দরজা! সে দরজা আমরা ভেঙে ফেলেছি—তাই এতদিনের পরে যুগযুগান্তরের নিষ্ফল চেষ্টার পর—সমুদ্র প্রবেশ করেছে ওই পথে!"

বিমল অতিকষ্টে কেবল বললে, "সর্বনাশ!"

—"বিমল, লস্ট্ আটলান্টিসের শেষচিহ্নও এবারে হারিয়ে গেল। ঐ শোনো পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার শেষ আর্তনাদ! আমরা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করলুম—আমরা মহাপাপী!"

কুমার বাষ্পরুদ্ধস্বরে বললে, "না বিনয়বাবু। আমরা না ভাঙলেও গোমেজ গিয়ে আজ ঐ দরজা ভাঙত। আমরা নিমিত্ত মাত্র। আটলান্টিস্ আবার হারিয়ে গেল মহাকালের অভিশাপে।"

বিনয়বাবু দুই হাতে প্রাণপণে জাহাজের রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল—"লস্ট্ আটলান্টিস্। লস্ট্ আটলান্টিস্!"

●

আলো দিয়ে গেল যাঁরা

সূর্যদেবী, পর্মলদেবী

ঐতিহাসিক বলছেন : ইসলাম ধর্মের উদয় হচ্ছে ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার।

৬২২ খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদ সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় প্রাণ রক্ষার জন্যে পালিয়ে যান মক্কা থেকে মেদিনায়।

তারই কিছু-বেশি এক শতাব্দীকাল পরেই দেখা গেল, হজরত মহম্মদের অনুবর্তীরা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন, তার বিস্তার আটলান্টিক সাগর থেকে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল ও দক্ষিণ ফ্রান্সের কতকাংশ; আফ্রিকার সমুদ্র-তীরবর্তী উত্তর অংশ, মিশর, আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও ট্রান্স্অক্সিয়ানা।

তারপরও হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী ও অনুবর্তিগণ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদেরও এক সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বারংবার আক্রমণ করতে ছাড়েন নি—এক কন্স্তান্তিনোপল নগরকেই তাঁরা অবরোধ করেছিলেন উপরি উপরি তিনবার।

কিন্তু ৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় থিয়োডোসিয়াসের এবং ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ দি হ্যামারের কাছে যদি তাঁরা শোচনীয়রূপে পরাজিত না হতেন, তাহলে আজ হয়তো ইউরোপীয়দের হাতে হাতে থাকত বাইবেলের পরিবর্তে কোরান!

ঐ দুই স্মরণীয় পরাজয়ের কিছু আগেই ইসলাম ধর্মের বিপুল বন্যা এসে উপস্থিত হয়েছিল পশ্চিম আর্যাবর্তের সীমান্ত পর্যন্ত।

তখন খলিফা ওয়ালিদের সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন হাজাজ। এই পূর্বাঞ্চলের সীমান্তের পরেই আরম্ভ হয়েছে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ এবং সেখানে রাজত্ব করতেন ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা দাহীর।

ভারতবর্ষ তখন মুসলমান আরব-সন্তানদের নাম শুনেছিল অবশ্যই,

কিন্তু আরবদের মনে যে ভারত আক্রমণের বাসনা জেগেছে, এমন কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তার বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র, মন্দির-মঠ ও তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং হাজার রকম সু আর কু সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে আর্য ভারত-বর্ষ তখন নিশ্চিন্ত হয়ে দেখত কেবল অতীত গৌরবের স্বপ্ন!

সারা ভারতবর্ষ ছোট ছোট রাজ্যের দ্বারা বিভক্ত। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের মত সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেন, ভারতে তখন এমন প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন না কেউ। ওরই মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বলবান রাজা, বৈচিত্র্য সন্ধানের জন্যে তাঁরা করতেন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদ!

বীরত্বের অভাব তাঁদের ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল একতার। সকলে মিলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কোন বহিঃশত্রুকে বাধা দেবার ক্ষমতা বা বিচার-বুদ্ধি তাঁদের ছিল না। বহিঃশত্রুর আবির্ভাব হ'লে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে কেবল আপন আপন রাজ্য সামলাবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

এই ভাবেই দিন যাচ্ছিল। হয়তো আরো কিছু কাল কেটে যেত এইভাবেই।

আরবদের দৃষ্টি তখন ইউরোপের দিকে আকৃষ্ট, একতার অভাবে অন্তঃসারশূন্য হলেও ভারতবর্ষ তখন পর্যন্ত ছিল তাদের চোখের আড়ালে।

কিন্তু ভগবান বোধহয় চাইলেন নির্বোধ ভারতকে কঠিন দণ্ড দিতে। দৈবের লীলায় ঘটল এমন এক অভাবিত ঘটনা, আর্যাবর্ত করলে আরবের দৃষ্টি আকর্ষণ।

সুদূর সিংহলে ছিল কয়েকজন আরব সওদাগর। তাদের মৃত্যুর পর তাদের কন্যারা হ'ল অনাথা। সিংহলের রাজা দয়াপরবশ হয়ে সেই অনাথা মেয়েগুলিকে জলপথে খলিফার পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হাজাজের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁর এই দয়ার ফলেই হ'ল ভারতবর্ষের সর্বনাশের সূত্রপাত!

সব সময়েই ভালোর ফলে ভালো হয় না।

জলপথে খলিফার রাজ্যে যেতে গেলে পথিমধ্যে পড়ে সিন্ধুদেশের সাগরতট। সেইখানে একদল বোম্বেটে খলিফার উদ্দেশে প্রেরিত জাহাজগুলিকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন ক'রে অদৃশ্য হয়।

সেই সংবাদ শুনে শাসনকর্তা হাজাজ রাজা দাহীরকে এক পত্র পাঠিয়ে জানালেন, অবিলম্বে দুষ্ট বোম্বেটেদের দমন এবং তাঁর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

রাজা দাহীর উত্তর দিলেন, "বোম্বেটেরা আমার অধীন নয়। তাদের দমন করবার শক্তি আমার নেই।"

হাজাজ এই উত্তর সন্তোষজনক ব'লে মনে করলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে খলিফার কাছ থেকে হুকুম আনিয়ে সেনাপতি উবেদুল্লাকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করতে।

সিন্ধুদেশের প্রধান বন্দর দেবুলের নিকটে হ'ল আরবের সঙ্গে ভারতের সর্বপ্রথম শক্তি-পরীক্ষা। হিন্দুরা হ'ল জয়ী। আরব সৈন্যদের কতক মারা পড়ল, কতক পালিয়ে বাঁচল। সেনাপতি উবেদুল্লাও দেহরক্ষা করলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

হাজাজ আরো বেশি সৈন্যের সঙ্গে আবার সেনাপতি বুদেলকে পাঠালেন দাহীরের বিরুদ্ধে।

ফল অন্য রকম হ'ল না। এবারেও ভারতের ত্রিশূলের আঘাতে বিশ্বজয়ী আরবের অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল এবং নিহত হলেন সেনাপতি বুদেল।

রাগে ও দুঃখে হাজাজ পাগলের মত হয়ে উঠলেন—খলিফার কাছে মান বুঝি আর থাকে না! তিনি বিপুল আয়োজন করতে লাগলেন তৃতীয় অভিযানের জন্যে।

এবারে সেনাপতি হলেন হাজাজের ভাইয়ের ছেলে ও জামাই ইমাদ্-উদ্-দীন মহম্মদ। তাঁর অধীনে ছিল খলিফার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদল—উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহী। সেই বিপুল বাহিনী নিয়ে মহম্মদ দেবুল দুর্গ

অবরোধ করলেন (৭১১ খ্রীস্টাব্দ)। দুর্গের ভিতর ছিল মাত্র চার হাজার রাজপুত সৈন্য। তারা বেশিদিন দলে ভারি আরবদের বাধা দিতে পারলে না। দুর্গের পতন হ'ল।

দেবুলের বাসিন্দাদের বলা হ'ল, হয় মুসলমান হও, নয় মরো। হিন্দুরা ধর্ম ছাড়তে রাজি হ'ল না। তখন নারী ও শিশুদের বন্দী ক'রে প্রত্যেক পুরুষকে নিক্ষেপ করা হ'ল তরবারির মুখে।

দেবুলের পতনের জন্যে দাহীর কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন, "দেবুল তো নগণ্য জায়গা, আসল যুদ্ধ হবে এইবারে আমার সঙ্গে।" তিনিও তোড়জোড় আরম্ভ করলেন।

দাহীর ভুল বুঝেছিলেন। কোথায় বিশ্বজয়ী সম্রাট্ ওয়ালিদ—সাম্রাজ্য যাঁর তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত, আর কোথায় দাহীর—ভারতে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা। ধনবলে ও লোকবলে দুজনের মধ্যে তুলনাই চলে না! তবু যে দুই-দুইবার তিনি আরব অভিযানকে ব্যর্থ করতে পেরেছিলেন, এইখানেই দাহীরের বাহাদুরী।

ঠিক সেই সময়ে ভারতে দাহীরের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী রাজা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী চালুক্য, পল্লভ ও রাষ্ট্রকূট নৃপতিরা যদি তখন দাহীরকে সাহায্য করতে আসতেন, তা'হলে আরবদের ভারতে প্রবেশ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়তো অঙ্কুরেই হ'ত বিলুপ্ত।

কিন্তু আপন আপন প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে তখন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে নিযুক্ত, ভারত-সীমান্তে কালবৈশাখীর উদয় দেখবার সময় তাঁদের হয় নি।

বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রকূট নৃপতিরা এমন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন যে, পরে আরব শাসনকর্তারা পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বন্ধন অটুট রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করতেন না।

দাহীরের সঙ্গে আরবদের সঙ্ঘর্ষের মাত্র চৌষট্টি বৎসর আগে উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হর্ষবর্ধন দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ বাহু যতদিন অস্ত্রধারণে সক্ষম ছিল, ততদিন কোন বিদেশী শত্রু ভারতে

প্রবেশ করতে সাহসী হয় নি।

মহম্মদ সদলবলে অগ্রসর হ'তে লাগলেন, এবং জয়ী হলেন একাধিক ছোট ছোট যুদ্ধেও। কিন্তু তখনও রাজা দাহীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি।

দাহীর বামনাবাদ থেকে রাওয়ারে এসে হাজির হলেন—সঙ্গে তাঁর পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

আরবরাও সেইখানে এসে হাজির। দুই পক্ষই প্রস্তুত, কিন্তু সহসা কোন পক্ষই আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল না।

এইভাবে গেল কয়েকদিন। দুই পক্ষই পরস্পরের গতিবিধি লক্ষ্য করে, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-একটা হাঙ্গামা হয়—ব্যাস্, এই পর্যন্ত!

শেষটা দাহীর আর স্থির থাকতে পারলেন না। ৭১২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে রণহস্তীর উপর আরোহণ ক'রে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "সৈন্যগণ, আরবদের আক্রমণ কর!"

আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ।

কেউ হটতে রাজী নয়—দুই পক্ষেরই সমান জিদ! কার শক্তি বেশি, তাও বোঝা অসম্ভব! ঝন্ ঝন্ বাজতে লাগল তরবারি, শন্ শন্ ছুটতে লাগল শূল ও বাণ, ঝক্-মক্ জ্বলতে লাগল হাজার হাজার বিদ্যুৎ-শিখা! বর্মে-বর্মে ঠোকাঠুকির শব্দ, যোদ্ধাদের ভৈরব-গর্জন, মত্ত হস্তীদের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বদের হ্রেষারব, আহতদের চিৎকার—পৃথিবীর কান যেন ফেটে যায়!

যুদ্ধের পরিণাম যখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, হঠাৎ ঘটল এক অঘটন।

আরব তীরন্দাজরা জ্বলন্ত তূলা-জড়ানো তীর নিক্ষেপ করছিল। আচম্বিতে সেই রকম একটা তীর এসে লাগল দাহীরের হাতির গায়ে। তীরের শাণিত ফলার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনের বিষম স্পর্শ পেয়ে হাতি দাহীরকে নিয়ে পাগলের মত পাশের নদীর ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতা ও রাজার সেই দশা দেখে হিন্দু সৈন্যরা যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত, চিত্রার্পিতের মত।

নদীর মাঝখানে গিয়ে মাহুত অনেক কষ্টে হাতিকে শান্ত করলে। দাহীর আবার তীরে এসে উঠলেন। আবার আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা যায়, দাহীর আরবদের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে বিপুল বিক্রমে যখন শত্রুর পর শত্রু সংহার করছিলেন, তখন হঠাৎ এক তীরের আঘাতে আহত হয়ে হস্তি-পৃষ্ঠ থেকে ঠিকরে প'ড়ে গেলেন মাটির উপরে।

কিন্তু তবু তিনি নিরস্ত হলেন না, সেই আহত অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার তিনি ঘোড়ার উপর চড়তে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে একজন আরব সৈনিক ছুটে এসে তরবারি চালিয়ে তাঁকে কেটে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সাঙ্গ। নায়কের মৃত্যুতে হতাশ হয়ে হিন্দু সৈন্যরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলে। আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আরবদের জয়নাদে।

বারংবার এই একই দৃশ্যের অভিনয় হয়েছে ভারতবর্ষে। প্রধান নায়কের পতন হ'লে এদেশী সৈন্যরা আর রণক্ষেত্রে দাঁড়াতে চায় না। কিন্তু ইউরোপের বহু রণক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, প্রধান নায়কের মৃত্যুর পরেও তাঁর স্থান গ্রহণ ক'রে দ্বিতীয় নায়ক সৈন্যদের চালনা ক'রে নিয়ে গেছেন জয়ের পথে।

দাহীর তো রণক্ষেত্রে বরণ ক'রে নিলেন বীরের মৃত্যু এবং ভারতের মাটিতে সেইদিনই প্রথম কায়েমি হয়ে উড়তে লাগল অর্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা, কিন্তু তারপর?

তারপর সিন্ধুদেশের রাজধানীতে যখন সেই খবর গিয়ে পৌঁছলো, দাহীরের প্রধানা রাণী রাণীবাই তাঁর সখীদের সঙ্গে আত্মহত্যা ক'রে শত্রুদের কবল থেকে করলেন উদ্ধারলাভ।

তারপর? চরম যুদ্ধের পরেও হিন্দুরা মরিয়া হয়ে বামনাবাদে গিয়ে আর একবার ফিরে দাঁড়ালে। কিন্তু তারা আর ফেরাতে পারলে না ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের স্রোত। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবলি দিলে ছাব্বিশ হাজার হিন্দু। আরবরা দখল করলে বামনাবাদ। তারপর আর মাথা তুলতে

পারেনি সিন্ধুদেশবাসী হিন্দুরা। মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের অধ্যায় সম্পূর্ণ হ'ল।

তারপর? বামনাবাদে ছিলেন রাজা দাহীরের দুই কুমারী কন্যা—সূর্য দেবী ও পর্মল (পরিমল) দেবী। তাঁদের রূপ দেখে চমৎকৃত হ'লেন বিজয়ী মহম্মদ। তিনি তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন খলিফার হারেমের শোভা-বৃদ্ধির জন্যে।

তারপর? হ্যাঁ, তারপরেও আরো কিছু বাকি আছে। অপূর্ব এই পরিশিষ্ট! এ হচ্ছে এক ঐতিহাসিক রূপকথা!

সূর্য দেবী, পর্মল দেবী! যেন স্বর্গীয় পারিজাতের দুটি হাল্‌কা পাপড়ি! রূপকাহিনীর রাজকন্যারা যেন মূর্তিগ্রহণ করেছে তাঁদের মোহনীয় তনুলতার মধ্যে!

পবিত্র আর্যাবর্তের দুই রাজকুমারী, বন্দিনী হয়ে তাঁরা চলেছেন কোন্ অজানা সুদূরে, বিধর্মী আরব খলিফার ভয়াবহ হারেমে! এমন সম্ভাবনা তখনকার দিনে কল্পনা করাও অসম্ভব!

তাঁরা কাঁদছেন, কাঁদছেন আর কাঁদছেন; এবং কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝে তাঁরা গম্ভীর ও মূর্তির মত স্থির হয়ে যাচ্ছেন; এবং তারপর মাঝে মাঝে গঙ্গাজলে-ধোয়া নির্মল ফুলের মত অশ্রু-ভেজা মুখ দুখানি তুলে পরস্পরের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা বলছেন—যেন কি পরামর্শ করছেন! কিন্তু চুপি চুপি কথা বলবার দরকার ছিল না। ভারতের ভাষা বোঝে না আরবরা।

সূর্য দেবী, পর্মল দেবী। খলিফার হারেমে হাজির হ'লেন তাঁরা যথাসময়ে।

দুই ভারতীয় রাজকুমারীর রূপের ছটা দেখে খলিফা ওয়ালিদের চক্ষু স্থির! শুষ্ক, দগ্ধ মরুর সন্তানের সুমুখে ভারতের স্নিগ্ধ সরস শ্যামল শ্রী মূর্তিমতী। চক্ষু স্থির হবার কথাই তো!

জ্যেষ্ঠ রাজকুমারীর কাছে এগিয়ে গিয়ে খলিফা বললেন, "আমি তোমাকে বিবাহ করব।"

সূর্য দেবী দুই হাত জোড় ক'রে বললেন, "মহিমময় সম্রাট্, আমাদের কারুর সঙ্গেই তো আপনার বিবাহ হ'তে পারে না!"

খলিফা সবিস্ময়ে বললেন, "কেন?"

সূর্য দেবী বললেন, "সম্রাটের সেনাপতি মহম্মদ আগেই আমাদের গ্রহণ করেছেন!"

খলিফা ভ্রূ সঙ্কুচিত ক'রে বললেন, "তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।"

সূর্য দেবী বললেন, "সেনাপতি মহম্মদ গোপনে আমাদের বিবাহ করেছেন। আমরা সম্রাটের যোগ্য নই।"

খলিফা ওয়ালিদ বজ্র-কণ্ঠে গর্জন ক'রে বললেন, "কী! আমার ভৃত্য মহম্মদের এত-বড় স্পর্ধা! উত্তম, আমি এখনি তার পাপের শাস্তি বিধান করব!"

খলিফা ওয়ালিদ তখনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে এক আদেশপত্র রচনা করলেন স্বহস্তে। তার মর্ম হচ্ছে এই: মহাপাপী মহম্মদ যেখানেই থাক্, আমার এই আদেশপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাকে বন্দী করা হয়। তারপর কাঁচা গোচর্মের মধ্যে তাকে পুরে, চাম্ড়া সেলাই করে আমার কাছে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়—এই আমার হুকুম।

খলিফা জানতেন, কাঁচা চাম্ড়ার মধ্যে মহম্মদের দেহ সুদূর ভারত থেকে তাঁর রাজধানীতে আসতে লাগবে অনেক দিন। এর মধ্যে কাঁচা চাম্ড়া যাবে শুকিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে এবং তা মহম্মদের দেহের চারিপাশে চেপে বসে করবে তার প্রাণসংহার! এ-রকম শাস্তি দেবার পদ্ধতি বোধ-হয় আরবদের দেশে বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

রাজধানীতে যথাসময়েই এল চাম্ড়ার থলির মধ্যে মহম্মদের মৃতদেহ।

খলিফা সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে সূর্য দেবীকে সগর্বে বললেন, "দেখ, আমার ভৃত্যরা কি ভাবে আমার হুকুম তামিল করে!"

সূর্য দেবী বললেন, "সম্রাট্, হুকুম দেওয়া খুবই সহজ! কিন্তু তার আগে সম্রাটের উচিত ছিল না, আমার অভিযোগ সত্য কিনা সে-সম্বন্ধে

খবর নেওয়া ?"

খলিফা বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি বলতে চাও ?"

—"আমি মিথ্যাকথা বলেছি।"

—"মিথ্যাকথা বলেছ ?"

—"হ্যাঁ সম্রাট্, হ্যাঁ ! মহম্মদ আমাদের বিবাহ করেননি।"

—"মহম্মদ তোমাদের বিবাহ করেনি।"

—"না।"

—"এমন মিথ্যাকথা বলার কারণ ?"

সূর্য দেবীর দুই চোখে ফুট্‌লো আগুনের ফিনকি। তীব্র স্বরে বললেন, "কারণ নেই সম্রাট ? আপনি কি এরি মধ্যে ভুলে গিয়েছেন যে, মহম্মদ আমাদের জন্মভূমি কেড়ে নিয়েছে, আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে ? তাই আমরা নিলুম প্রতিশোধ।"

খলিফা ওয়ালিদ চিৎকার ক'রে বললেন, "শয়তানী। তোদের জন্যে আমি আমার বিশ্বস্ত বিজয়ী সেনাপতিকে হারালুম। মৃত্যুদণ্ড ! তোদের উপরেও আমি মৃত্যুদণ্ড দিলুম ! এমন ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে তোদের হত্যা

করা হবে যা তোরা কল্পনাও করতে পারবি না।"

সূর্য দেবী কি উত্তর দিয়েছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সূর্য দেবী ও পর্মল দেবী ছিলেন সেকালকার আর্যাবর্তের কন্যা। তখনকার হিন্দু মেয়েরা যে কেমন হাসিমুখে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারত, ইতিহাসে আছে তার অগুনতি প্রমাণ।

সুতরাং আমরা এটুকু অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে, খলিফার কথার উত্তরে সূর্য দেবী হয়তো বলেছিলেন, "কী ভয় দেখাও সম্রাট? বিধর্মীর কবলে পড়লে ভারতের মেয়ে মৃত্যুকে দেখে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত! জন্মভূমির শত্রুকে আমরা ইহলোক থেকে বিদায় করেছি—আমরা পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি! আর আমাদের বাঁচবার ইচ্ছা নেই—যা খুশি করতে পারো!"

এই গল্পটি বলেছেন মুসলমান ঐতিহাসিকরাই এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও এই গল্পটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতি-হাসিকরা কাহিনীটিকে সত্য ব'লে মানতে রাজি নন!

গল্পটি রূপকথা কিনা জানি না, কিন্তু সিন্ধু-বিজয়ের অল্পদিন পরেই মহম্মদকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই।

মারাঠার লিওনিডাস্

চার শো আশী খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ। পারস্য করেছে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা। পারস্যের বিপুল বাহিনীকে বাধা দেবার জন্য স্পার্টার রাজা লিওনিডাস্ এক হাজার মাত্র সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন।

সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট থার্মপিলি। সংখ্যায় অসংখ্য হলেও পারস্যের সৈন্যরা একসঙ্গে দল বেঁধে সেই সংকীর্ণ গিরিপথের ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে না। নগণ্য গ্রীক সৈন্য নিয়ে লিওনিডাস্ অগণ্য শত্রু-সৈন্যকে

বাধা দিলেন বহুক্ষণ ধ'রে। কিন্তু অসম্ভব হ'ল না সম্ভবপর। অবশেষে লিওনিডাস্‌কেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হ'ল সদলবলে।

ইউরোপের লোকেরা এই ঘটনা আজ পর্যন্ত ভোলেনি। লিও-নিডাসের জন্যে সারা ইউরোপ গর্ব অনুভব করে। সায়েবরা ইউরোপের বাইরে যেখানে যেখানে গিয়েছে, সেইখানেই শুনিয়েছে লিওনিডাসের গল্প। তোমরাও নিশ্চয় ইস্কুলের কেতাবে এই গল্প পাঠ করেছ। লিও-নিডাস্‌ যে স্মরণীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষেও যে লিওনিডাসের সঙ্গে তুলনীয় বীরের অভাব নেই, তোমাদের কয়জনে সে খবর রাখে?

ষোলো শো ষাট খ্রীস্টাব্দ। বিজাপুরের অধিপতি আলি আদিল শা করেছেন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। শিবাজী তখনও ছত্রপতি হন নি। বিজাপুরের অধিপতি তখনও তাঁকে মনে করেন সামান্য এক বিদ্রোহী জায়গীরদারের মত; কিন্তু বিজাপুরের সেনাপতি আফ্‌জল খাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রের দিকে দিকে। দলে দলে মারাঠী এসে সমবেত হয়েছে তাঁর পতাকার তলায়। তাদের সাহায্যে বার বার শত্রুদের পরাস্ত ক'রে ইতিমধ্যেই তিনি গ'ড়ে তুলেছেন একটি নাতিবৃহৎ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য।

পান্‌হালা হচ্ছে দুর্গের নাম। তাঁর অবস্থান কোলাপুরে। শিবাজী নিজের কতক সৈন্য নিয়ে বাস করছিলেন সেইখানেই।

শিবাজীর কয়েকখানি পুরাতন প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু সেগুলি যে শিবাজীর জীবনকালে তাঁকে চোখে দেখে আঁকা হয়েছিল, এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। খুব সম্ভব, জীবন্ত শিবাজীকে স্বচক্ষে দেখলেও শিল্পীরা এ ছবিগুলি এঁকেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে, নিজেদের স্মৃতির উপরে নির্ভর ক'রে। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, চিত্রাঙ্কিত মূর্তির সঙ্গে আসল শিবাজীর মোটামুটি সাদৃশ্য আছে।

তবে পুরাতন চিঠিপত্রে শিবাজীর চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়

শিবাজীর বয়স যখন আটত্রিশ কি উনচল্লিশ, তখন Escaliot নামে এক ইংরেজ সুরাট শহরে তাঁকে দেখে লিখেছিলেনঃ "শিবাজীর দেহ মাঝারি আকারের এবং সুগঠিত। তাঁর মুখ হাসি হাসি, দৃষ্টি চঞ্চল ও মর্মভেদী। তাঁর রং অন্যান্য মারাঠীদের চেয়ে সাদা।"

প্রায় ঐ সময়েই Thevenot নামে এক ফরাসী ভ্রমণকারীও শিবাজীকে স্বচক্ষে দেখে বলেছেনঃ "রাজা মাথায় উঁচু নন। তাঁর গায়ের রং কটা। চঞ্চল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় সজীবতার প্রাচুর্য।"

ইংরেজ দূত Henry Oxinden শিবাজীকে ওজন হ'তে দেখেছিলেন। ওজনে তাঁর দেহ ছিল কিছু-বেশি তুই মণ।

পান্হালাগড়ে শিবাজীকে আক্রমণ করতে এলেন বিজাপুরের সেনানী ফজ্‌ল খাঁ ও তাঁর প্রধান পার্শ্বচর সিদ্দি হালাল্। সঙ্গে তাঁদের পনেরো হাজার সৈন্য।

যে আফ্‌জল খাঁকে শিবাজী হত্যা করেছিলেন, এই ফজ্‌ল খাঁ হচ্ছেন তাঁরই পুত্র। তিনি যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন, এটুকু সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর হাতে পড়লে শিবাজীর আর রক্ষা নেই!

শিবাজীর সৈন্যসংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজারের বেশি ছিল না বটে, কিন্তু পান্হালার মত মস্তবড় ও সুরক্ষিত কেল্লার আশ্রয়ে থেকে তিনি আত্মরক্ষার সুযোগ পেলেন যথেষ্ট। উপরন্তু মাঝে মাঝে তাঁর সৈন্যরা হঠাৎ কেল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে' এমনভাবে শত্রুসংহার করতে লাগল যে, বিজাপুরীর দল রীতিমত ভয় পেয়ে নিরাপদ ব্যবধানে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অবশ্য এটা বলা বাহুল্য, পিছিয়ে গিয়েও তারা চারিদিক থেকেই দুর্গকে বেষ্টন ক'রে রইল।

তারপর ফজ্‌ল খাঁ অবলম্বন করলেন এক নতুন কৌশল।

পান্হালার কাছেই ছিল মারাঠীদের পানগড় নামে আর একটা কেল্লা। সেটি পান্হালার মত সুরক্ষিত না হ'লেও তার অবস্থিতি ছিল এমনধারা যে, পানগড় হারালে পান্হালার মারাঠীদের খোরাকের অভাবে

আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না।

সুচতুর ফজ্‌ল খাঁ প্রথমে পানগড়ের নিকটস্থ একটা ছোট পাহাড় দখল করলেন। তারপর পাহাড়ের টঙে কয়েকটা কামান টেনে তুলে একেবারে পানগড়ের ভিতর গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

পানগড়ের ভিতর ছিল অল্প মারাঠী সৈন্য। তাদের অবস্থা হ'ল শোচনীয়। দুর্গ-রক্ষক শিবাজীর কাছে খবর পাঠালেন, "শীঘ্র সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করুন, নইলে আমরা শত্রুদের আর ঠেকাতে পারব না।"

শিবাজী পড়লেন মহা সমস্যায়। তাঁর সঙ্গেও এত বেশি সৈন্য নেই যে, পানগড়কে সাহায্য করতে পারেন। অথচ লোকাভাবে পানগড়ের পতন হ'লে আহার অভাবে তাঁকেও করতে হয় আত্মসমর্পণ।

বেশি ভাবনারও সময় নেই। তাড়াতাড়ি না করলে পালাবার পথও বন্ধ হবে। শিবাজী হুকুম দিলেন, "শোনো সবাই! কতক সৈন্য পান্‌-হালাতেই থাক্। তারা যতক্ষণ পারে দুর্গ রক্ষা করুক। আজকের রাত্রি অন্ধকার। এই সুযোগে আমি বাকি সৈন্য নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে অন্য কোথাও চ'লে যাই।"

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। সে রাত্রে চাঁদ ওঠেনি, অন্ধকারে মানুষের চোখ অন্ধ। মারাঠীরা বাঘের মত বিজাপুরীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে শত্রুরা প্রস্তুত ছিল না, তারা দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গেল।

সেই ফাঁকে শিবাজী অদৃশ্য হলেন সদলবলে। তিনি সোজা ধরলেন তাঁর আর এক কেল্লা বিশালগড়ে যাবার পথ। সেখান থেকে বিশাল-গড়ের দূরত্ব সাতাশ মাইল।

কিন্তু শিবাজীর অন্তর্ধানের কথা বেশিক্ষণ চাপা রইল না।

ফজল খাঁ গর্জন ক'রে বললেন, "কোথায় পালাবে আমার পিতৃ-হন্তা? সিদ্দি হালাল্, ডাক দাও আমার সৈন্যদের। এই পাহাড়ে ইঁদুরকে গর্তে ঢোকবার আগেই বন্দী করা চাই! জল্‌দি চল—জল্‌দি চল!"

কালিমার ঘেরাটোপে ঢাকা রাত, মর্মর-আর্তনাদে ভরা গহন বন, অসমোচ্চ দুর্গম পাহাড়ে পথ।

কিন্তু মারাঠীদের অভিযোগ নেই। তাদের দেশের রাজা, প্রাণের রাজা শিবাজীর নির্দেশে তারা চলেছে মৌনমুখে, সারে সারে।

কালো রাতের কোলে ফুটল আলোমাখা প্রভাতের নয়ন। সকলে এসে পড়েছে গজপুরে। এখনো আটমাইল দূরে বিশালগড়।

সেইখানেই প্রথম জানা গেল, বিজাপুরীরাও সারা রাত ধ'রে ছুটে আসছে মারাঠীদের পিছনে পিছনে। সংখ্যায় তারা অনেক বেশি।

সকলেই সচকিত! এখন উপায়? মুষ্টিমেয় মারাঠী সৈন্য নিয়ে শত্রুদের বাধা দেওয়া অসম্ভব। অথচ তাদের বাধা দিতে না পারলে এখানেই শিবাজীর সমস্ত আশা-ভরসার অবসান!

সেখানে পথ গিয়ে পড়েছে এক অতি-সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতরে।

সেইদিকে তাকিয়েই শিবাজীর চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ডাকলেন, "বাজী প্রভু!"

একজন মারাঠী যোদ্ধা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

—"বাজী প্রভু, ঐ সরু গিরি-পথটা দেখছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজা!"

—"ঐ পথটার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে একশো জন লোক বাধা দিতে পারে হয়তো পাঁচ হাজার লোককে। কেমন, তাই নয় কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজা!"

—"বিজাপুরীরা আসছে আমাকে বধ করতে। আমি তোমার অধীনে কয়েকজন লোক রেখে বিশালগড়ে যাত্রা করতে চাই বাকি সবাইকে নিয়ে। যতক্ষণ না আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই, ততক্ষণ তুমি ঐ গিরিবর্ত্ম রক্ষা করতে পারবে কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজা!"

—"বিশালগড়ে পৌঁছেই আমি তোপধ্বনি ক'রে জানিয়ে দেব আমরা নিরাপদ। তারপরে তোমার কর্তব্য শেষ হবে।"

—"উত্তম !"

বাজী প্রভু তাঁর অনুচরদের নিয়ে গিরিবর্ত্ম জুড়ে দাঁড়ালেন। সকলেরই মুখে-চোখে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব যে, দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না, জীবনটাকে তারা বিক্রি করবে খুব চড়া মূল্যেই !

বিজাপুরীদের দেখা গেল। তারা ছুটে আসছে কাতারে কাতারে। যেন বাঁধভাঙা বন্যা !

কিন্তু গিরিবর্ত্মের সামনে এসেই তাদের অগ্রগতি হ'ল রুদ্ধ। এই সরু পথের ভিতরে পাশাপাশি কয়েকজনের বেশি লোকের প্রবেশ করবার উপায় নেই।

ফজল খাঁ ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার ক'রে বললেন, "অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ গোটাকয়েক কাফেরকে কেটে কুচি কুচি ক'রে ফ্যালো।"

যে কয়জন বিজাপুরী বর্ত্মের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, তাদের কেউ আর ফিরল না। মারাঠী বন্দুকধারী, ধনুকধারী, বর্শাধারী ও তরবারিধারী বীরদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল তাদের ক্ষতবিক্ষত জীবনহীন দেহগুলো।

ফজল খাঁ আবার গর্জে উঠলেন, "কুছ্ পরোয়া নেহি। আক্রমণ কর। যেমন ক'রে পারো পথ সাফ কর।"

পিঁপড়েদের মত লম্বা সার বেঁধে বিজাপুরীরা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ ক'রে, কিন্তু খানিক পরে আর অগ্রসর হ'তে পারে না, তাদের দেহ হয় 'পপাত ধরণীতলে !'

বর্ত্মের মধ্যে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগল বিজাপুরীদের দেহের স্তূপ। মারাঠীরাও যে মরছিল না, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু দু-একজন মারাঠী মরে তো বিজাপুরী মরে দশ-পনেরো জন।

মারাঠীরা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। বহু শত্রু বধ ক'রে দু-একজন ক'রে মরতে মরতেও মারাঠীরা দলে হয়ে পড়ল আরো হাল্‌কা ; কিন্তু তবু যুদ্ধ চলে, তবু বিজাপুরীরা অগ্রসর হ'তে পারে না, যদিও তাদের বাহিনী তখনও বিপুল।

সর্বাগ্রে পথ জুড়ে অচল শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন বাজী প্রভু —তাঁর উর্ধ্বোত্থিত কৃপাণ রক্তাক্ত, তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। মধ্যাহ্ন সূর্যের

কিরণে সেই শাণিত কৃপাণ জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে সরল বিদ্যুৎশিখার মত, তার প্রতাপে আজ নিবে গিয়েছে কত শত্রুর জীবনদীপ, সে হিসাব কেউ রাখে নি।

বাজী প্রভু ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রচালনা করছেন আর দৃপ্ত কণ্ঠে বলছেন, "বাধা দাও, বধ কর! এখনো তোপধ্বনি হয় নি—এখনো মারাঠার রাজা নিরাপদ নন।"

ইতিহাস বলে, সূর্যোদয়ের পরে সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাকাল ধ'রে চলেছিল এই অভাবিত যুদ্ধ এবং গিরিবর্ত্ম পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সাত শত মৃতদেহে!

বিজাপুরীরা ফিরে যায় এবং এগিয়ে আসে বারে বারে।

ফজল খাঁ থেকে থেকে ব'লে ওঠেন, "পিতৃহন্তার মুণ্ড চাই—পিতৃহন্তার মুণ্ড চাই!"

আঘাতের পর আঘাতে বাজী প্রভুর আহত দেহ ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসে। সাগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে তিনি গোণেন মুহূর্তের পর মুহূর্ত। কিন্তু তবু শোনা যায় না তোপধ্বনি। ওগো রাজা, তুমি কি ভুলে গেলে আমাদের কথা? আর যে পারি না। কোথায় তোমার কামানের ভাষা।

বিজাপুরীরা আবার এগিয়ে আসছে। খালের ভিতরে ঢুকছে যেন সমুদ্রের প্লাবন।

শোনা গেল ফজল খাঁর হুকুম: "গুলিবৃষ্টি কর—গুলিবৃষ্টি কর! কাফেররা আর বেশিক্ষণ আমাদের বাধা দিতে পারবে না।"

বাজী প্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "বাধা দাও। বধ কর। দেহে যতক্ষণ এক ফোঁটা রক্ত থাকবে—বাধা দাও, বাধা দাও, মারাঠার বীর সন্তান।"

গিরিবর্ত্মের মধ্যে বেগে ছুটে এল উত্তপ্ত গুলির ঝড়। তার পিছনে ধেয়ে আসছে শত্রু-সৈন্যের অফুরন্ত শ্রেণী।

আবার আহত হয়ে রক্ত-পিছল পাহাড়ের উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন বাজী প্রভু। সেইখানে শুয়ে শুয়েই তিনি ক্ষীণ অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "মারাঠার বীরগণ। জীবন শেষ হ'ল, কিন্তু আমার কর্তব্য শেষ হ'ল না। আমি চললুম, কিন্তু তোমরা রইলে। যতক্ষণ না তোপ শোনা যায়, বাধা দাও—বাধা দাও!"

তাঁর শেষ-নিঃশ্বাস যখন পড়ে পড়ে আচম্বিতে বিশালগড় থেকে ভেসে এল গুড়ুম ক'রে শিবাজীর তোপের আওয়াজ।

বাজী প্রভু বাক্যহীন হ'লেও তখনও সচেতন। তাঁর দুই চোখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল এবং মুখে ফুটল স্বর্গের আনন্দ।

বাজী প্রভুর স্মৃতিই অমর হয়ে নেই, তাঁর অবিনশ্বর আত্মাও বিরাজ করছে এই মহাভারতের স্বাধীন জনতার মধ্যে।

ভারতের একমাত্র সুলতানা

যেখানে থাকে বজ্র-আগুন সেখানেই ফোটে চন্দ্রের চন্দন-ধারা। তাইতো আকাশ এমন বিচিত্র, এত সুন্দর!

পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে এক-একজন মানুষ দেখা যায় যার মনের ভিতরে থাকে ফুলের কোমলতা আর বজ্রের কাঠিন্য। ভগবান তাদের জীবনের রাজপথে পাঠিয়ে দেন অসাধারণ হবার জন্যেই।

ইতিহাসে এমনি অসাধারণ কয়েকজন পুরুষের নাম পড়ি। না, কেবল পুরুষ নয়, এমন অসাধারণ কয়েকজন নারীও পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত ও অমর হয়ে আছেন।

আজ এমনি এক বিচিত্র নারীর কথাই বলব। বাংলাদেশে তাঁকে 'রিজিয়া' ব'লে ডাকে, কিন্তু আসলে তাঁকে আমরা ডাকতে পারি 'রাজিয়া' নামে। বাংলাভাষায় 'রিজিয়া' ব'লে একখানি নাটক আছে, তার আগাগোড়াই কাল্পনিক প্রলাপে পরিপূর্ণ। সত্যিকার রাজিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেও চলে।

যে-সব দাস-রাজা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব'লে বিখ্যাত হয়েছেন সুলতান ইল্‌তুৎমিস। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা ভুল ক'রে তাঁকে ডেকেছেন 'আল্‌তমাস' নামে।

রাজিয়া ছিলেন ইল্‌তুৎমিসেরই কন্যা। পৃথিবীর সব দেশেই রাজকন্যা বললে মনে জাগে এক সুন্দরীর ছবি। সুতরাং আশা করা যায়—রাজিয়াও ছিলেন সুন্দরী; এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় ও চরিত্রের নানা গুণে তিনি যে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, এরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী জীবনে; এবং কুসুমকোমলা নারীরূপে জন্মালেও রাজিয়ার চরিত্রে ছিল যে পুরুষোচিত দৃঢ়তা, এর প্রমাণ পাই আমরা তাঁর পিতার মুখেই।

১২৩৬ খ্রীস্টাব্দ। সুলতান ইল্‌তুৎমিস শুয়েছেন মৃত্যু-শয্যায়।

সুলতানের নানা মহিষীর কয়েকটি সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে সিংহাসনে বসবার যোগ্যপাত্র ছিলেন কেবল জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র—বঙ্গদেশের

শাসনকর্তা মামুদ। কিন্তু তিনি অকালেই মারা পড়েছেন। তাই মন্ত্রী ও সভাসদ্‌দের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

তাঁরা বললেন, "সুলতান, আপনার অবর্তমানে সিংহাসনে বসবে কে?"

ইল্‌তুৎমিস বললেন, "আমার মেয়ে রাজিয়া"

বিপুল বিস্ময়ে সকলে স্তম্ভিত। কোন্ মুসলমান রাজ্যে কে কবে শুনেছে রাজ-সিংহাসনে বসেছে পুত্রের বদলে কন্যা?

মন্ত্রীরা বললেন, "সুলতান, রাজিয়া যে পুরুষ নন!"

ইল্‌তুৎমিস বললেন, "তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝবে, আমার সব ছেলের চেয়ে রাজিয়ার মধ্যেই আছে বেশি পুরুষত্ব।" এই বলেই তিনি অন্যদিকে পাশ ফিরে শুলেন। তাঁর মৃত্যু হ'ল।

যা কখনো হয় নি, তা হয় কেমন ক'রে? মন্ত্রীদের সেই পুরাতন যুক্তি?

ইল্‌তুৎমিসের শেষ-ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। আমীর-ওমরাওরা সুলতানের এক ছেলেকেই দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধিকারী ব'লে স্থির করলেন। তাঁর নাম ফিরুজ। তিনি রাজিয়ার সৎমা, শা তুর্কানের পুত্র।

শা তুর্কান প্রথমে ছিলেন রাজবাড়ীর দাসী, তারপর সুলতানের সুনজরে প'ড়ে হন রাণী। অন্য অন্য রাণীরা ছিলেন বড়ঘরের মেয়ে, তাঁরা কোনদিনই শা তুর্কানকে রাণীর মর্যাদা দিতে পারেন নি। শা তুর্কান এতকাল ধ'রে সেই অপমান পুষে রেখেছিলেন মনে মনে।

ফিরুজের রাজা হবার কোন যোগ্যতাই ছিল না। মুকুট প'রে তিনি দিন-রাত মেতে রইলেন বাজে আমোদ-প্রমোদে। রাজকার্যের ভার গ্রহণ করলেন তাঁর মা। হাতে ক্ষমতা পেয়ে তাঁর প্রথম কাজ হ'ল, অন্যান্য সতীনদের বধ করা। যাঁরা বেঁচে রইলেন, তাঁদের উপরেও অত্যাচার অপমানের সীমা রইল না। সুলতানের অন্য এক রাণীর এক শিশু-পুত্রেরও দুই চক্ষু উপ্‌ড়ে নেওয়া হ'ল।

ব্যাপার দেখে সকলেই বিরক্ত। রাজ্যে দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়ালো বিদ্রোহীরা। নানা প্রদেশের শাসনকর্তা প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হ'লেন। সৈন্য-সামন্ত

নিয়ে ফিরুজ গেলেন তাঁদের দমন করতে, কিন্তু পারলেন না।

এদিকে শা তুর্কানের বিষদৃষ্টি পড়েছে তখন রাজিয়ার উপরে। সুলতানের এই বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মেয়েটিকে রাজ্যসুদ্ধ সবাই ভালবাসে, এতটা শা তুর্কানের সইল না। তিনি রাজিয়াকে পৃথিবী থেকে সরাবার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত।

শুনেই দিল্লীর প্রজারা ক্ষেপে উঠল। বিদ্রোহীদের দলে অনেক আমীর-ওমরাও পর্যন্ত যোগ দিলেন। দুষ্টা শা তুর্কান হ'লেন বন্দিনী; এবং ফিরুজ পালালেন রাজধানী ছেড়ে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। বিদ্রোহীদের তরবারিতে তাঁর মুণ্ড গেল উড়ে। ফিরুজের ছয় মাস আর সাত দিনের রাজত্ব ভোগ শেষ হ'ল। সে যেন আবু হোসেনের বাদশাগিরি!

প্রজারা একবাক্যে বললে, "আমাদের রাণী হবেন রাজিয়া।"

মন্ত্রী ও আমীর-ওমরাওরা প্রজাদের কথা ঠেলতে পারলেন না। সেই প্রথম ও শেষবারের জন্য দিল্লীর রাজতক্তের একমাত্র অধিকারিণী হ'লেন একজন নারী। এ এক কল্পনাতীত ব্যাপার। সুলতানা রাজিয়া। (১২৩৬ খ্রীস্টাব্দ)।

কিন্তু সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিপদের মেঘ তখনো পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

মিত্রপক্ষ—অর্থাৎ মুলতান, হান্সী, লাহোর ও বুদায়ুনের বিদ্রোহী শাসনকর্তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিরুজের মন্ত্রী জুনাইদি তখন দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন—তাঁরা সবাই চান সুলতানা রাজিয়ার মুকুট কেড়ে নিতে। বিদ্রোহীরা দিল্লী অবরোধ করলে।

রাজিয়া বুঝলেন তিনি দুর্বল ও বিদ্রোহীরা প্রবল। সম্মুখ-যুদ্ধে নামলে তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। তখন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে তিনি দিল্লী থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ছাউনি ফেললেন যমুনার তীরে।

আমরা বলি—'নারী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'। সুলতানা রাজিয়া দেখালেন তারই এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তবে প্রলয়টা হ'ল এখানে কেবল বিদ্রোহী-দেরই পক্ষে!

তিনি গোপনে মুলতানের দুইজন প্রবল বিদ্রোহী নেতাকে আহ্বান ক'রে মিষ্ট কথায় ও নানা লোভ দেখিয়ে তাঁদের পক্ষে আনলেন। তার-

পর তারা যখন তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে বিদ্রোহীদের দলে গিয়ে হাজির হ'ল, সুচতুরা সুলতানা রাজিয়া তখন সেই চক্রান্তের কাহিনী অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের কাছে প্রকাশ ক'রে দিলেন।

বিদ্রোহীদের দলে প'ড়ে গেল মহা হৈ-চৈ! সবাই ভীত, সবাই তটস্থ! কেউ কারুকে বিশ্বাস করতে পারে না—প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভাবে শত্রু ব'লে। তাদের দল গেল ভেঙে। এক-একজন নেতা আপন আপন দল নিয়ে স'রে পড়বার চেষ্টা করেন—আর রাজিয়ার সৈন্যরা প্রধান দল ছাড়া সেই-সব নেতাকে করে আক্রমণ ও বন্দী। এইভাবে বিদ্রোহীদের অনেকে মারা পড়ল। বাকি সবাই পালিয়ে গেল। জয় হ'ল রাজিয়ার তীক্ষ্নবুদ্ধির! সমগ্র হিন্দুস্থান হ'ল তাঁর অধিকারভুক্ত। এমন কি, সুদূর বঙ্গদেশ ও সিন্ধুদেশও তাঁর বশীভূত না হয়ে পারলে না। বিনাযুদ্ধেই কেল্লা ফতে!

সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক। সুলতানা রাজিয়া তখন আমাদের পৌরাণিক চিত্রাঙ্গদার মতন নবমূর্তি ধারণ করলেন।

অর্থাৎ তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নারীর পোশাক, ত্যাগ করলেন নারীর ভাবভঙ্গী, ভুলে গেলেন মুসলমানী পর্দা-প্রথা। সিংহাসনে বসেন পুরুষের সাজে, রণক্ষেত্রে যান সশস্ত্র যোদ্ধার বেশে। এই তেজীয়ান নারীর চিত্তের মধ্যে যথার্থ পুরুষত্বের আশ্চর্য বিকাশ দেখে, গোঁড়া মুসলমানরাও নীরব হয়ে রইলেন,—কোনরকম আপত্তি প্রকাশ করলেন না।

কিন্তু গোলমাল শুরু হ'ল আর এক কারণে।

বুদ্ধিমতী রাজিয়া মানুষ চিনতেন। যোগ্যতা দেখে তিনি আফ্রিকা থেকে আগত জালালুদ্দীন ইয়াকুত নামক এক ব্যক্তিকে নিজের গার্হস্থ্য বিভাগের একটি উচ্চপদ প্রদান করলেন।

রাজসভায় তখন তুর্কী আমীর-ওমরাওদের বিশেষ প্রভাব,—আফ্রিকার লোকদের তাঁরা সুনজরে দেখতেন না, ঘৃণা করতেন। ইয়াকুত-কে সুলতানার অনুগ্রহভাজন হ'তে দেখে তাঁরা হাড়ে হাড়ে জ্ব'লে উঠলেন; এবং নারীর প্রভুত্ব যাঁদের পক্ষে একেবারেই অসহনীয়, দেশে তখনো এমন সব লোকেরও অভাব ছিল না। তাঁরাও রাজিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

আয়াজ ছিলেন একজন প্রধান চক্রী—রাজিয়ারই অনুগ্রহে তিনি হয়েছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। রাজিয়া প্রথমেই সসৈন্যে তাঁকে আক্রমণ ও পরাজিত করলেন। আয়াজ প্রাণ বাঁচালেন পালিয়ে।

কিন্তু অন্যান্য চক্রীদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। ইক্‌তিরুয়াদ্দীন আল্‌তুনিয়া ভাতিন্দার শাসনকর্তা, ক্ষমতাশালী ও যোদ্ধা ব'লে তাঁর অল্প প্রতিপত্তি ছিল না। চক্রীদের প্ররোচনায় ভুলে তিনিও বিদ্রোহী হলেন।

রাজিয়া আলতুনিয়াকে দমন করবার জন্যে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর ফৌজের মধ্যে কেবল বিশ্বাসী ইয়াকুতই ছিলেন না, তুর্কী

চক্রান্তকারীদের দলও ছিল রীতিমত ভারী।

বীর নারী রাজিয়া ভাতিন্দায় পৌঁছে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তুর্কী চক্রীরা মুখোস খুলে ফেললেন।

শত্রুর সৃষ্টি হয় যখন ঘরে-বাইরে তখন তাদের আর ঠেকানো যায় না। বিশ্বাসঘাতক তুর্কী আমীর-ওমরাওরা প্রথমেই ইয়াকুতকে হত্যা করলেন, তারপর বন্দী করলেন সুলতানা রাজিয়াকে। তারপর আল্‌-তুনিয়াকে ডেকে বন্দিনী সুলতানাকে তাঁরই হাতে সঁপে দিলেন।

রাজিয়ার এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, তাঁর নাম মুইজুদ্দীন বারাম। চক্রীদের অনুগ্রহে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করলেন তিনিই (১২৪০ খ্রীস্টাব্দ)।

চক্রীদের মনের বাসনা পূর্ণ। দিল্লীর সিংহাসন থেকে নারীর প্রভুত্ব বিলুপ্ত রাজিয়া শত্রুর হস্তে বন্দিনী।

কিন্তু কারাগারের অন্ধকারে ব'সে রাজিয়া এখন কি করছেন? নিশ্চয়ই চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন না। তিনি সিংহাসনে ব'সে সাম্রাজ্যচালনা ও অশ্বপৃষ্ঠে বসে অস্ত্রচালনা করেছেন, তাঁর চোখে অশ্রু সাজে না।

সিংহাসনে ব'সেই একদিন তিনি বিনা যুদ্ধেই প্রবল শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। আজ আবার তিনি কৌশলে শত্রুজয় ক'রে নিজের গত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন।

রাজিয়া আহ্বান করলেন আল্‌তুনিয়াকে।

বিস্মিত আল্‌তুনিয়া কারাগারে এসে দাঁড়ালেন।

রাজিয়া সহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "বীরবর, আরো কতদিন আমি তোমার কারাগারে আতিথ্য স্বীকার করব? আমাকে বন্দিনী ক'রে রেখে তোমার কি লাভ?"

আল্‌তুনিয়া তিক্ত স্বরে বললেন, "লাভ? কোনই লাভ নেই! বোকার মতন আমি হয়েছি চক্রীদের হাতের খেলার পুতুল। তারা সবাই নিজের নিজের কাজ গুছিয়েছে—কেউ করেছে তোমার বোনকে বিয়ে, কেউ হয়েছে মন্ত্রী। আর আমাকে ক'রে রেখেছে কেবল তোমার ভার-

বাহী গর্দভ।"

রাজিয়া বললেন, "এ ভার ত্যাগ করতে পারবে?"

—"তাতেই বা আমার কি লাভ?"

—"লাভ?...জানো বীর, একদিন যে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে, আবার সে সেই সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে।"

—"কেমন ক'রে?"

—তুমি যোদ্ধা, তোমার নিজের সৈন্য আছে। ইচ্ছা করলে তুমি আরো অনেক নতুন সৈন্য সংগ্রহ করতে পারো। তারপর তোমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা ক'রে আবার আমি দিল্লী অধিকার করব।"

আল্‌তুনিয়া খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, "সুলতানা, ধরো, যুদ্ধে আমরাই জয়ী হলুম। কিন্তু সিংহাসনে আবার ব'সে তুমি কি আর আমার কথা মনে রাখবে?"

—"বীর, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?"

—"হচ্ছে। রাজনীতি বড়ই কুটিল।"

—"কি করলে তোমার সন্দেহ দূর হবে?"

—"সুলতানা, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

রাজিয়া নতনেত্রে বললেন, "বেশ, আমি রাজি।"

শত্রু হলেন স্বামী।

সুলতানা রাজিয়া আবার শত্রুজয় করলেন।

কিন্তু তারপর আর বেশি কিছু বলবার নেই। এবার ভাগ্যদেবী দাঁড়ালেন তাঁর বিপক্ষে।

স্বামীর সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আবার তিনি দিল্লীর পথ ধরলেন, পথিমধ্যে দেখা হ'ল তাঁর ভাই বারামের সঙ্গে—দিল্লীর যিনি নতুন সুলতান।

যুদ্ধ হ'ল। ভাই দিলেন বোনকে হারিয়ে।

তার পরদিনই স্ব-পক্ষীয় ঘাতকের হস্তে সুলতানা রাজিয়া ও তাঁর

স্বামী আল্‌তুনিয়া ইহলোক ত্যাগ করলেন।

দিল্লী এবং পৃথিবীর আর কোন মুসলমান সাম্রাজ্যে আর কোন নারী মাথায় সম্রাজ্ঞীর মুকুট পরবার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি।

ব্যাঘ্রভূমির বঙ্গবীর

ললিতাদিত্য তখন কাশ্মীরের রাজা। তিনি সিংহাসন অধিকার ক'রে ছিলেন ৭৩৩ থেকে ৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

তিনি ছিলেন শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী। তিব্বতীদের, ভুটিয়াদের ও সিন্ধু-তীরবর্তী তুর্কীদের দমন ক'রে তিনি নাম কিনেছিলেন। ভারতের দেশে দেশেও উড়েছিল তাঁর জয়পতাকা। কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড-মন্দির তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও বিদ্যমান আছে ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

সেই সময়ে কনোজ বা কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন আর এক পরাক্রান্ত রাজা, নাম তাঁর যশোবর্মা। তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মগধ ও বঙ্গদেশের রাজারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। মগধের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। কিন্তু বঙ্গ বা গৌড়ের সিংহাসন ছিল কোন্ রাজার অধি-কারে, ঐতিহাসিকরা আজও তাঁর নাম খুঁজে পাননি। তবে তিনি ছিলেন নাকি অসংখ্য হস্তীর অধিকারী।

চিরকালই এক রাজার উন্নতি আর এক রাজা দেখতে পারেন না। পৃথিবীতে এই নিয়েই যত অশান্তি, যত যুদ্ধবিগ্রহ। রাজা যশোবর্মার যশ ললিতাদিত্য সহ্য করতে পারলেন না। সসৈন্যে তিনি করলেন যশোবর্মাকে আক্রমণ। যশোবর্মা হলেন পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত।

তখন বঙ্গেশ্বর কতকগুলি হস্তী উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন ললিতাদিত্যের কাছে। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। যশোবর্মার দ্বারা বিজিত বঙ্গেশ্বর শত্রুর পতনে খুশি হয়েই হয়তো ললিতাদিত্যের কাছে

উপহার পাঠিয়ে মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। কিংবা এও হ'তে পারে, ললিতাদিত্য পাছে বঙ্গদেশও আক্রমণ করেন, সেই ভয়েই তিনি তাঁকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

তারপর বঙ্গেশ্বরের কাছে কাশ্মীর থেকে এল আমন্ত্রণ, তাঁকে ললিতাদিত্যের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।

তখন অষ্টম শতাব্দী চলছে। সে সময়ে বাঙলা থেকে কাশ্মীরে যাওয়া বড় যে-সে কথা ছিল না। তারপর এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং ললিতাদিত্যের মনের কথা কেউ জানে না। বঙ্গেশ্বর যথেষ্ট ভীত হলেন বটে, কিন্তু উপায় কি? দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্যের আমন্ত্রণ ও আদেশ একই কথা।

সুদীর্ঘ, দুর্গম পথ পার হয়ে কয়েক মাস পরে বঙ্গেশ্বর কাশ্মীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কাশ্মীরে ললিতাদিত্য একটি নতুন নগর স্থাপন ক'রে তার নাম রেখেছিলেন, "পরিহাসপুর", এখন তাকে "পরসপোর" ব'লে ডাকা হয়। সেখানে ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "পরিহাসকেশব" নামে দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির।

অবশেষে পরিহাসপুরে হ'ল দুই রাজার সাক্ষাৎকার।

বঙ্গেশ্বরের মুখ বিষণ্ণ, তখনও তাঁর মনের ভয় ভাঙেনি।

আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি ক'রে ললিতাদিত্য বললেন, "রাজন্, আশ্বস্ত হন। আপনি আমার অতিথি। এই আমি ভগবান পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না।"

বঙ্গেশ্বর হয়তো আশ্বস্ত হলেন।

তার পরের ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝা যায় না। বঙ্গেশ্বর যখন ত্রিগামী নামে একটি স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, ললিতাদিত্য তাঁকে হত্যা ক'রে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে এক অসহায় অতিথিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার কারণ কি? ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব। এমন অহেতুকী বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী

পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও আর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

যথাসময়ে এই দারুণ দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল বাঙলাদেশে।

সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন, রাজপ্রাসাদে হাহাকার।

কিন্তু নারীর মত হায়-হায় ক'রে কেঁদে নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করল না বঙ্গেশ্বরের প্রিয় পরিচারকবৃন্দ। বাঘের মুলুক বাঙলাদেশে কোনদিনই দৃপ্তমনের অভাব হয়নি। একালে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ফিরিঙ্গী বণিকরা বাঙ্গালী কাপুরুষ ব'লে মিথ্যা অপবাদ রটাবার চেষ্টা করেছে। আসলে তারাও বাঙালীদের ভয় করত মনে মনে।

পরিচারকদের সর্দার ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল, "প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই!"

কেউ প্রশ্ন করল, "কেমন ক'রে প্রতিশোধ নেবে?"

—"আমরা কাশ্মীরে যাত্রা করব।"

—"কোথায় কাশ্মীর, আর কোথায় বাঙলা !"

—"দরকার হ'লে আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে ছাড়ব না। হাত গুটিয়ে ব'সে থেকে এ অপমান মাথা পেতে সহ্য করব? ভাই সব, আমরা কি বাঙালী নই?"

—"আমরা হচ্ছি মুষ্টিমেয় বিদেশী, সেই সুদূর অজানা দেশে অসংখ্য শত্রুর সামনে গিয়ে আমরা কি দাঁড়াতে পারব? এ অসাধ্যসাধন কি সম্ভবপর?"

—"আমাদের অন্নদাতা প্রভু বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত। যে তাঁর অন্ন গ্রহণ করেছে, সেই-ই আজ একাই হবে একশজন—সেই-ই আজ করতে পারবে অসাধ্যসাধন। আজ কোন কথা নয়—কাশ্মীরে চল, কাশ্মীরে চল!"

পরিচারকের দল সমস্বরে গর্জন ক'রে উঠল, "কাশ্মীরে চল, কাশ্মীরে চল!"

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত। সূর্য উঠে, চাঁদ উঠে, উদয়ের পরে অস্ত, মাসের পরে হয় মাসকাবার। নদ, নদী, প্রান্তর, দুর্গম কান্তার, দুরারোহ গিরিদরী। ক্রোশের পর ক্রোশ—তবু যেন পথের শেষ নাই। ঋতুর পর ঋতু চ'লে যায়—কখনো অগ্নিবাণ হেনে, কখনো তুষার-বৃষ্টি ক'রে—তবু পথিকরা শ্রান্ত নয়, তারা চলছে, চলছে, চলছে। একটু শিথিল হয়নি তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে পথের শেষ। এই ত কাশ্মীরের সীমান্ত।

কাশ্মীরী রক্ষী সবিস্ময়ে দেখল, অদ্ভুত পোশাক-পরা একদল বিদেশীকে। শুধোল, "কে তোমরা?"

—"আমরা গৌড়বাসী।"

—"এদেশে এসেছ কেন?"

—"তীর্থ করতে।"

—"কোথায় যাবে?"

—"কাশ্মীরে সারদা দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে।" রক্ষী পথ ছেড়ে

দিল।

সর্দার পরিচারক বলল, "আমরা পরিহাসপুরেও গিয়ে পরিহাস-কেশবের মন্দির দেখব। সেখানে যাবার পথ কোন্ দিকে?"

রক্ষী পথ বাতলে দিল।

—"মহারাজ ললিতাদিত্য এখন কোথায়?"

—"রাজ্যের বাইরে।"

মনে-মনে হতাশ হয়েও সর্দার মুখে কোন ভাবই প্রকাশ করল না।

তারা প্রবেশ করল পরিহাসপুরে।

সর্দার গম্ভীর স্বরে বলল, "সবাই ছদ্মবেশ খুলে ফেল। অস্ত্র ধর!"

—"তারপর আমরা কি করব?"

—"পরিহাসকেশবকে আক্রমণ করব।"

—"পরিহাসকেশব যে দেবতা!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকের উপাস্য দেবতা! পরিহাসকেশবকেই মধ্যস্থ রেখে ললিতাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, বঙ্গেশ্বরের গায়ে সে হাত দেবে না। তারপর সে যখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে উদ্যত হয়, পরিহাসকেশব কি তাকে নিরস্ত করতে পেরেছিলেন? ললিতাদিত্য রাজ্যের বাইরে, এত দূরে এসে আমরা কি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব? তার বদলে চাই আমরা পরিহাসকেশবকেই। যে-দেবতাকে উপাসনা ক'রে মানুষ এমন হীন, এমন বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, আমরা সকলে মিলে আজ চূর্ণবিচূর্ণ করব সেই পঙ্গু, অপদার্থ দেবতাকে! ভাই সব! অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর!"

পরিহাসকেশবের মন্দিরের পূজারীরা সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলেন, একদল ভৈরব মূর্তি শূন্যে তরবারি নাচাতে নাচাতে ও বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে বেগে ছুটে আসছে—"চূর্ণ কর, চূর্ণ কর, চূর্ণ কর পরিহাসকেশব!"

প্রমাদ গুণে পুরোহিতরা মন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ ক'রে দিলেন

বাঙালীরা তখন পর্যন্ত জানত না, কোন্‌টি পরিহাসকেশবের মন্দির

সামনে পেলে তারা আর একটি জমকালো মন্দির, তার ভিতরে

ছিল রামস্বামীর রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ। তাকেই পরিহাসকেশবের মূর্তি মনে ক'রে তারা হৈ হৈ ক'রে তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ শার্দূলের মত। যারা বাধা দিতে এল, তারা হ'ল হত কি আহত। তার-পর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধুলোয় লুটোতে লাগল রূপোয় গড়া মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। রাজধানী থেকে খবর পেয়ে ছুটে এল কাতারে কাতারে কাশ্মীরী সৈনিক।

সর্দার পরিচারক নির্ভীক কণ্ঠে বলল, "আমরা বাঙলার বীর। কারুর দয়া চাইব না, কারুকে দয়া করব না! আমরা অস্ত্র নিয়ে শত্রুসংহার করতে করতে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করব! ভাই সব, মার আর মর!" নগণ্য বাঙালীর দল, অগণ্য শত্রু-সৈন্য। এক এক বাঙালী চেষ্টা করল একশ জনের মত হ'তে, মরিয়া হয়ে সবাই লড়তে লাগল—বধ করল বহু শত্রুকে। তারপর শত্রুরক্তে প্লাবিত মৃত্তিকার উপর লুটিয়ে প'ড়ে একে একে করল শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ। কেউ পালিয়েও গেল না, কেউ প্রাণেও বাঁচল না।

প্রায় চার শতাব্দী পরেও কহ্লন দেখেছিলেন রামস্বামীর বিগ্রহহীন মন্দির এবং তখনও সারা কাশ্মীরে কথিত হ'ত বঙ্গবীরদের অপূর্ব বীরত্ব।

উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য

বন্দিনী রাজশ্রী! থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজশ্রী,—সৌন্দর্যে অনুপমা, বিদ্যায় মূর্তিমতী সরস্বতী, স্বামী ছিলেন তাঁর রাজা গ্রহবর্মণ। কিন্তু নিষ্ঠুর মালবরাজের হাতে আজ তাঁর স্বামী নিহত এবং তিনিও হয়েছেন বন্দিনী, তাঁর দুই কমল-চরণে কনক-নূপুরের পরিবর্তে বেজে উঠছে আজ লোহার শৃঙ্খল!

এই দুঃখের খবর নিয়ে দূত এল ছুটে থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের রাজসভায়।

ভগ্নী রাজশ্রীকে কেবল রাজা রাজ্যবর্ধনই ভালোবাসতেন না, রাজ-কন্যা ছিলেন রাজ্যের সমস্ত প্রজার প্রাণের পুতলী। তখনি প্রস্তুত হ'ল দশ হাজার অশ্বারোহী। তাদের পুরোভাগে রাজ্যবর্ধন ছুটলেন বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।

কিছুদিন যায়। থানেশ্বরের সমস্ত প্রজা যখন তাদের রাজা ও রাজ-কন্যার প্রত্যাগমনের আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করছে, আবার এল তখন এক চরম দুঃখের খবর!

রাজা রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন বটে, কিন্তু নিজেই নিহত হয়েছেন মালবরাজের বন্ধু ও বাংলার রাজা শশাঙ্কের হস্তে। এবং রাজকন্যা রাজশ্রী নিজের মান ও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে গিয়েছেন সুদূর বিন্ধ্য পাহাড়ের বিজন বনে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরো শত বৎসর আগে ভারতবর্ষে যখন এই বিচিত্র নাটকের অভিনয় চলছিল, তখন এদেশে মুসলমান দিগ্বি-জয়ীরা দেখা দেন নি; বিখ্যাত দিল্লী নগরের প্রতিষ্ঠা হয় নি; এমন কি আজ সূর্য-চন্দ্র-বংশধর খাঁটি ক্ষত্রিয় ব'লে যাঁরা মিথ্যা গর্ব করেন, সেই রাজপুতদের নাম পর্যন্ত কেউ শোনে নি।*

ভারতবর্ষের তখন অত্যন্ত দুর্দশা। কাব্যে বর্ণিত পৌরাণিক কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী তখনও লোকের মুখে মুখে ফিরছে, কিন্তু মহাভারত তখন অসভ্য হূনদের কবলে হয়ে প'ড়েছিল শক্তিহীন ও স্বাধীনতা-হারা! দক্ষিণ-ভারত তখনও তার নিজস্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল বটে, কিন্তু সত্যিকার আর্যাবর্ত বলতে বোঝাতো তখন বিন্ধ্য-গিরিশ্রেণীর উপর-অংশকে। এ-অংশে তখনও বহু ছোট ছোট হিন্দু-রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল! কিন্তু সে-সব স্থানে এমন কোন মহাবীর ছিলেন না, সমগ্র আর্যা-বর্তে যিনি একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে পারেন!

পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দি, কারণ কেউ তখন ভারতের ইতিহাস লেখে নি। তবে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক যুগে দেখতে পাই, পারসীক ও গ্রীকরা এসে তার বুক মাড়িয়ে চলছে আর এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে। তখন ভারতকে উদ্ধার করেছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত এবং স্থাপন করেছিলেন এমন এক মহাসাম্রাজ্য, যার মাথার মুকুট ছিল হিন্দুকুশের শিখর এবং চরণের নূপুর ছিল মহাসাগরের নীল তরঙ্গদল। তারপর তাঁরই পৌত্র সম্রাট্ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ সভ্যতায়, একতায় ও মানব-ধর্মে

* আসলে দিল্লীর আবির্ভাব হয়েছে ঐতিহাসিক যুগে, এগারো শতাব্দীতে এবং রাজপুতদের পূর্বপুরুষরা ভারতবাসী হ'লেও ভারতীয় ছিলেন না। তাঁরা শক, হূন, প্রভৃতি বিদেশী বিধর্মী বর্বরদের সন্তান, হিন্দুধর্ম গ্রহণ ক'রে তরবারির জোরে আর্য ও ক্ষত্রিয় নাম কিনেছিলেন!—লেখক

উচ্চে উঠেছিল, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্যই তা ধারণায় আনতে পারে নি।

কিন্তু তারপরেই এল আবার এক বিষম অন্ধ যুগ। মৌর্য সিংহাসনের দুর্বল অধিকারীদের হাত থেকে খ'সে পড়ল রাজদণ্ড এবং সেই অবসরে ভারতে প্রবেশ করল বর্বর শক দিগ্বিজয়ীরা। কিন্তু কিছুকাল পরে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের প্রভাবে এসে, শকরাও ভারতবাসীদের মধ্যে গণ্য হ'ল এবং শক-সম্রাট কনিষ্কও গ্রহণ করলেন অশোকের আদর্শ। তারপর রঙ্গমঞ্চ থেকে হ'ল শকদের প্রস্থান এবং নানা জাতের যবন দিগ্বিজয়ীরা নানা দিক থেকে ভারতে ঢুকে আর্যাবর্তকে ক'রে তুললে আর্যদের অযোগ্য। সেই সময়েই হ'ল সমুদ্রগুপ্তের আবির্ভাব—ঐতিহাসিকদের কাছে যিনি ভারতের নেপোলিয়ন নামে বিখ্যাত। ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে জয়ধ্বজা তুলে আবার এক বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে হিন্দু সমুদ্রগুপ্ত অপূর্ব এক স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই স্বর্ণযুগের পরমায়ু হয়েছিল প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী। স্থাপত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে; বিজ্ঞানে ও কাব্য-নাটকে হিন্দুর যা-কিছু গর্বের ও গৌরবের, তার অধিকাংশেরই উত্তরাধিকারী হয়েছি আমরা গুপ্ত-সম্রাটদের প্রসাদে! তারপর আবার হ'ল ভারতের পতন।

ভারত দু'বার পড়েছে, দু'বার উঠেছে। কিন্তু এবার তাকে তুলবে কে? হূনদের আক্রমণে ও অত্যাচারে জর্জরিত ও জীবন্মৃত ভারত এখন তারই পদধ্বনি শোনার আশায় দিন গুনছে।

চল, আবার থানেশ্বরে ফিরে যাই। এ হচ্ছে সেই থানেশ্বর যেখানে উঠেছিল কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা! কিন্তু থানেশ্বরের আজ বড়ই দুর্দিন। তার রাজা নিহত, রাজকন্যা বনবাসিনী, সিংহাসন শূন্য। মৃত রাজা বয়সে এমন নবীন ছিলেন যে, খুব সম্ভব পুত্রের পিতা হ'তে পারেননি। তাঁর এক ছোট ভাই আছেন নাম হর্ষবর্ধন, বয়স ষোলোর ভিতরে। কিন্তু তখনো অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রের দিকে তাঁর প্রাণের টান এত বেশি ছিল যে, এই তরুণ বয়সেই রাজসভা ছেড়ে তিনি এক বৌদ্ধ মঠে আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এমন সময়ে এল দেশের ডাক, মন্ত্রীদের ডাক, প্রজাদের ডাক—ফিরে এস রাজকুমার, ফিরে এস! আমরা তোমাকে চাই, সিংহাসন তোমাকে চায়!

হর্ষবর্ধন কিন্তু সহজে ফিরতে রাজি হ'লেন না, তাঁর মনে অঙ্কুরিত

হয়েছে তখন বৈরাগ্যের বীজ। কিন্তু সকলের উপরোধ শেষ পর্যন্ত তিনি ঠেলতে পারলেন না। কথিত আছে, এই সময়ে তাঁর ধ্যানে আবির্ভূত হ'য়ে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন, "বৎস, তোমার জন্ম রাজধর্ম পালন করবার জন্য। তুমি রাজ্য রক্ষা, রাজ্য বিস্তার কর, আমার আশীর্বাদে তুমি হবে ধরণীতে শ্রেষ্ঠ।"

রাজ্যের ভার নিয়ে হর্ষবর্ধনের প্রথম কর্তব্য হ'ল ভ্রাতৃহত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া ও ভগ্নী রাজশ্রীকে উদ্ধার করা। হত্যাকারী রাজা শশাঙ্ক কি শাস্তি পেয়েছিলেন, ইতিহাস সে-সম্বন্ধে নীরব; তবে তিনি যে নিজের রাজ্য বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, এমন প্রমাণ আছে—এবং কিছুকাল পরে তাঁর রাজ্যও হর্ষবর্ধনের হস্তগত হয়।

কিন্তু রাজশ্রী কোথায়? বোনের খোঁজে হর্ষবর্ধন ঘুরে বেড়াতে

লাগলেন বনে বনে। শেষে বনবাসী অসভ্যদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে অনেক চেষ্টার পর তিনি যখন যথাস্থানে গিয়ে হাজির হ'লেন, সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজশ্রী তখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন চিতায় উঠে আত্মহত্যা করবার জন্যে।

রাজধর্মের এমনি গুণ, শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীকে দু'দিনেই সে ক'রে

তুললে দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয়! প্রথমে হর্ষবর্ধনের অধীনে ছিল পাঁচ হাজার রণহস্তী, বিশ হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক। এই ফৌজ নিয়েই তিনি বিরাট আর্যাবর্তকে একচ্ছত্রাধীন করবার জন্যে বেরিয়ে এলেন অসীম সাহসে! কোথাও ছোট বা বড় হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজা, কোথাও যবন শক হুন রাজা, কোথাও অসভ্য বর্বর রাজা—তাঁর উদ্যত তরবারির তলায় সকলেই মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'ল একে একে! কেউ যুদ্ধ ক'রে হেরে গেল, কেউ প্রাণ দিলে, কেউ পলায়ন করলে, কেউ মানে মানে বশ মানলে। কখনো পাঞ্জাবে, কখনো বিহারে, কখনো বাংলায় এবং কখনো উৎকলে রুদ্রমূর্তিধারী হর্ষবর্ধন ছুটে বেড়াতে লাগলেন, সসৈন্যে, বিদ্রোহীদের রক্তস্রোতে পৃথিবীকে রাঙা ক'রে! প্রায় ছয় বৎসরের মধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব-ভারতের অধিকাংশ রাজ্য হ'ল তাঁর করতলগত—আর্যাবর্তে হ'ল শেষ হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা! তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীও এমন বিপুল হয়ে উঠেছে যে, ইচ্ছা করলেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে আনতে পারেন ষাট হাজার রণহস্তী ও এক লক্ষ অশ্বারোহীকে।

তারপর হর্ষবর্ধন খুলে ফেললেন তাঁর যুদ্ধবেশ এবং সিংহাসনে গিয়ে বসলেন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করবার জন্যে। সে-সময়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাত্রী হলেন বিদুষী রাজকন্যা রাজশ্রী। যথার্থ হিন্দু ভারতবর্ষে বিধবা হলেও যে নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত না এবং কঠিন রাজনীতিতেও যে পুরুষের পাশে ছিল নারীর স্থান, এইটেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দিগ্বিজয়ের পরে সম্রাট হর্ষবর্ধন সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের বড় বড় সব কথাই প্রায় জানা গিয়েছে প্রধানত দুটি কারণে। তাঁরই শাসনকালে বিখ্যাত চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন-সাং ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। একটানা পনেরো বৎসরকাল ভারতে থেকে, তিনি এখানকার রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কীয় সমস্ত বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন। তার উপরে হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণ-রচিত 'হর্ষ-চরিত'ও হচ্ছে ঐতিহাসিকের আর-একটি বড় অবলম্বন।

শেষ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন তাঁর সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃত করতে ক্ষান্ত হননি। মালব, নেপাল, গুজরাট ও সুরাষ্ট্রও হয়েছিল তাঁর হস্তগত, আসাম বা কামরূপের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁর করদ রাজা। কেবল আর্যাবর্তের বাইরে দাক্ষিণাত্যের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল না। ওদিকে

রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে তিনি চালুক্য-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেসিনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে নর্মদা নদীই হয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সীমা।

হিউয়েন্-সাঙ এর কাহিনী থেকে জানা যায়, হর্ষের রাজত্বে অপ-রাধীর সংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু সেকালে ছেলে বাপের বাধ্য না হ'লে, কোন লোক অসাধুতা বা নীতিহীন ব্যবহার করলে, তাদের নাক-কান কেটে নিয়ে শহরের বাইরে বনে-জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে আসা হ'ত এবং অন্য কেহও তাদের আশ্রয় দিত না।

সাধারণ প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করত। ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা লোক ঠকাত না, বিশ্বাসঘাতকতা করত না এবং অঙ্গীকার রক্ষা করত। তাদের ব্যবহারও ছিল বিনীত, মিষ্ট ও ভদ্র। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা ছিলেন খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রজাদের অধিকাংশই খালি পায়ে হাঁটত, অনেকে আবার পায়ে পরত 'স্যাণ্ডাল'।

শহরে ও মফঃস্বলে পথিক, রোগী ও দরিদ্রদের জন্যে বহু ধর্মশালা ছিল। সেখানে আশ্রয় নিলে পথশ্রান্তরা পেত বিশ্রামের সুযোগ, ক্ষুধার্তরা পেত বিনামূল্যে আহার্য, রোগীরা পেত ঔষধ-পথ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য। সাম্রাজ্যের সর্বত্রই ছিল সুশিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

সম্রাট হর্ষ বিশেষরূপে কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে তিনি সূর্য, শিব ও বুদ্ধদেবের উপাসনা করতেন এবং তাঁর প্রত্যেক উপাস্যের জন্যে সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বহু মন্দির বা মঠ স্থাপন করেছিলেন। শেষ-বয়সে বৌদ্ধধর্মের উপরে তাঁর টান এত বেড়ে ওঠে যে, ব্রাহ্মণরা গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কেবল দিগ্বিজয়ী, সম্রাট্, সুশাসক ও ধার্মিক রূপেই হর্ষবর্ধন পৃথিবীর বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি একজন অমর গ্রন্থকাররূপেও সুপরিচিত। তোমরা নিশ্চয়ই "রত্নাবলী", "নাগানন্দ" ও "প্রিয়দর্শিকা"র বিখ্যাত নাট্যকার কবি শ্রীহর্ষের নাম শুনেছ? কবি শ্রীহর্ষ ও সম্রাট হর্ষবর্ধন একই ব্যক্তি। এক কথায় বলতে গেলে, সম্রাট হর্ষবর্ধন কেবল স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তাঁর মত গুণী লোক পৃথিবীর রাজকুলে দুর্লভ।

একবার হত্যাকারীর ছুরি থেকে বেঁচে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অতি-ভক্তি দেখাবার জন্যে তিনি হিন্দু প্রজাদের অনেক দাবিই অগ্রাহ্য করতে লাগলেন।

ফলে হিন্দুরা যে খুশি হ'ল না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

হর্ষের এক মন্ত্রী ছিল, তার নাম অর্জুন বা অরুণাশ্ব। ভারতবর্ষের গৌরবের যুগেও যে এখানে প্রথম শ্রেণীর দুরাত্মার অভাব হয়নি, ঐ অর্জুনই তার প্রমাণ। প্রজাদের বিরক্তির সুযোগ নিয়ে একদিন সে ভারতের হিন্দু-সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিষ্ঠাতা এবং কবি ও কলাবিদ্ সম্রাট হর্ষকে হত্যা করলে (৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে)।

মুকুট দাবী করতে পারে রাজবংশের এমন কেউ নেই, কারণ, সম্রাট হর্ষ পুত্রহীন। পাপী অর্জুন এ সুযোগ ছাড়লে না, নিজেই সিংহাসনের উপরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

কিন্তু এই বিরাট সাম্রাজ্যের কর্ণধার হবার মতন যোগ্যতা ছিল না অর্জুনের। দু'দিন যেতে-না-যেতেই অর্জুনের অত্যাচারে চারিদিকে উঠল মহা হাহাকার, রাজ্য প্রায় অরাজক! সম্রাট হর্ষবর্ধনের তরবারি ধারণ করতে পারে এমন সবল বাহুর অভাব, রাজ-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত। কর্মচারীরা মাহিনা পায় না, শ্রেষ্ঠ সৈন্যরা পলাতক, সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড, অনেক সামন্ত রাজা করলেন বিদ্রোহ ঘোষণা! প্রজারা বুঝলেন— অর্জুন রক্ষক নয়, ভক্ষক! কিন্তু বুঝেও তখন আর অনুতাপ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

সম্রাট হর্ষের অভাবে তাঁর সাম্রাজ্য যে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, একটি অদ্ভুত ব্যাপারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

হর্ষের মৃত্যুর আগেই বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে চীন-সম্রাট ভারতবর্ষে এক দূত প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর নাম ওয়াং-হিউয়েন্-ৎসু। লোভী অর্জুন সেই সব মূল্যবান সামগ্রী হস্তগত করবার জন্যে ওয়াংকে সসৈন্যে আক্রমণ করলেন।

চীন-সম্রাটের প্রেরিত লোকজন হ'ল নিহত, অসহায় ওয়াং কোনগতিকে প্রাণ বাঁচিয়ে নেপালে পালিয়ে গেলেন। নেপাল তখন তিব্বতের অধীনে এবং তিব্বতের রাজা স্রং-সান্ গাম্পো ছিলেন চীন-সম্রাটের জামাই। শ্বশুরের লোকজনের উপরে এই অত্যাচারের কথা শুনে তিনি ক্ষেপে গিয়ে ওয়াং-এর সঙ্গে হাজার-চারেক তিব্বতী ও নেপালী সৈন্য দিয়ে তাদের পাঠালেন অর্জুনকে দমন করবার জন্যে।

হর্ষের সিংহাসনের অধিকারী হ'লেও অর্জুনের শক্তি-সামর্থ্য ছিল না কিছুমাত্র! কাপুরুষ রাজার ভীরু সৈন্যরা দলে খুব ভারী হয়েও সেই

চার হাজার নেপালী ও তিব্বতী সৈন্যদলের সামনেও দাঁড়াতে পারলে না; তিরহুতের কাছে তারা একেবারে হেরে গেল এবং তাদের প্রায় তের-চৌদ্দ হাজার লোক মারা পড়ল।

অর্জুন পালিয়ে গিয়ে আবার নতুন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ফিরে এল। সেবারেও সে জিততে পারলে না। বিজয়ী ওয়াং এক হাজার বন্দীর মাথা কেটে ফেললেন এবং বারো হাজার লোক ও সপরিবারে অর্জুনকে বন্দী ক'রে ফিরে গেলেন সেই সুদূর চীনদেশে।

অর্জুনের পরিণাম কি হ'ল, ইতিহাস তা উল্লেখ করেনি; তবে এইটুকু জানা গিয়েছে যে, সে আর ভারতবর্ষে ফিরতে পারেনি। মাত্র চার হাজার সৈন্য করলে ভারত-সাম্রাজ্য জয়। হর্ষের অভাবে ভারত গেল রসাতলে।

হ্যাঁ, সত্যই রসাতলের অন্ধকারে। তারপর দুই শতাব্দীর মধ্যে লুপ্ত হয়নি সে অন্ধকার এবং তারই গর্ভে শোনা গেছে হূন, গুর্জর ও অন্যান্য মধ্য-এশিয়াবাসী বর্বর যোদ্ধাদের নিষ্ঠুর হুহুঙ্কার এবং আর্ত ভারতবাসীর করুণ ক্রন্দন।

সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরে আবার যখন সূর্যোদয় হ'ল, তখন দেখা গেল, সারা ভারতবর্ষের চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

●